অতুলন অতুলপ্রসাদ

সা হি ত্য লো ক

৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৫৬

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রকাশক : নেপালচন্দ্র ঘোষ

সাহিত্যালোক। ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট। কলকাতা ৬

উৎসর্গ ________________

বর্হিবঙ্গের তথা বাংলার গৌরব মুকুটহীন সম্রাট
অতুলপ্রসাদ সেনের জীবন-ভাষ্য তুলে দিলেম বর্হিবঙ্গেব
বাঙালিদের এবং অতুলপ্রসাদের সঙ্গীত পরিবেশকদের হাতে

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১ অতুলপ্রসাদ সমগ্র
১ রজনীকান্ত সঙ্গীত সমগ্র
১ দ্বিজেন্দ্রলাল সঙ্গীত সমগ্র
১ রমনীয় দ্বিজেন্দ্রলাল
১ বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত
১ বিস্মৃতপ্রায় বাঙালী মহিলা কবি
১ বঙ্গদেশের হৃদয় হতে— ফিরে দেখা
১ সাহিত্য সম্মেলন পরিক্রমা

আশুতোষ কলেজের সম্মুখস্থ ট্রাম লাইনের উপর তেতলার ছোটকোণের ঘরে বাঙলা অনার্স ক্লাস। অধ্যাপক ড. তারাপদ ভট্টাচার্য শরৎচন্দ্রের "দেনা-পাওনা" উপন্যাসের পাঠ দান করছেন। বিমুগ্ধ তন্ময়তায় আমরা গভীরভাবে বিষয়বস্তুর সার আয়ত্তে রাখায় ব্যস্ত। পড়াতে পড়াতে হঠাৎ ডঃ ভট্টাচার্য থেমে গেলেন— একটা স্তব্ধ নীরবতা ক্ষণিকের মধ্যে আচ্ছন্ন করল আমাদের। বেশ বিব্রত হলাম সবাই। এদিক ওদিক তাকিয়ে খুঁজছি কী ব্যাপার! অধ্যাপক ভট্টাচার্যের চোখে-মুখে ভেসে আসা একটা সঙ্গীতের মূর্ছনায় কেমন যেন আত্ম-ভোলা উদাস করা ব্যাকুলতা! কিছুক্ষণ এমনি মায়াঘেরা বোবামনে সবাই যখন একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি— অধ্যাপক ভট্টাচার্য স্মিতহাস্যে বললেন— শুনতে পাচ্ছ একট্যা বেহালার সুর?— আমরা সবাই সজাগ হলাম— একটি প্রাণ টেনে নেওয়া করুণ সুর ট্রাম লাইনের ওপারের সারি সারি দেবদারু গাছের একটা কোণ থেকে ভেসে আসছে। বড় ব্যাকুল করা আবেদন। তড়িৎবেগে আমরা সবাই নিজেদের যেন হারিয়ে ফেললাম—। অধ্যাপক ভট্টাচার্য বললেন, বলতে পার ঐ সুর কি বলছে! আমরা অসহায়। চোখে মুখে উৎকণ্ঠা। তিনি বললেন, অতুলপ্রসাদের নাম শুনেছ? আমরা আরো বিবশ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

অতুলপ্রসাদের একটি গান ভবঘুরে অবাঙালি এক ভিখারী-বাউল বেহালায় সুরারোপ করে বাজান! গানটি হ'ল "সবারে বাস্‌রে ভালো, নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে!"

কলেজের ক্লাস সেরে আমি নিচে গিয়ে দেখলাম, সেই দেবদারু বাগানের এককোণে একটা দেয়াল ঘেষে জীর্ণ নোংরা কিছু কাপড়চোপরে সেই বেহালাবাদক আব তার স্ত্রী বসে আছেন। কাছে গেলাম— জিজ্ঞেস করলাম— আপনি দুপুরে যে গানটি বাজিয়েছিলেন তা' আর একবার বাজাবেন?

অবিন্যস্ত একগাল দাড়ি-গোঁফে স্মিতহাস্যে কাছে পড়ে থাকা বেহালা হাতে তুলে নিলেন— তারপর দরদভরা প্রাণের সবটুকু উজার করে দিয়ে বেহালার ছড়িতে বইয়ে দিলেন সেই আকুল করা আহ্বান— 'সবারে বাস্‌রে ভালো নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।' কেমন যেন হয়ে গেলাম।উঠতি বয়েস, অসংলগ্ন মানসিকতায় রাজনীতি করি— দ্বন্দ্ব, হিংসা আর তর্কজালে জর্জরিত হয়ে আত্ম-অহমিকার বেড়াজালে জড়িয়ে জড়িয়ে সব হারাই—কিন্তু এ কি শুনলাম! এমন সহজ করে অন্তর জুড়ে এর আগে ত এমন কথা শুনিনি। ঐ ধ্বনিতে ঐ সুরে সে কি মায়া! বেশ ক্লান্ত বোধ করলাম— সেদিন পকেটে যা ছিল সবটুকু ওর হাতে দিয়ে দ্রুত বাড়ীর পথে কালিঘাট পার্কে

একটা ধাক্কামারা মনের হিসেব-নিকেষে বসে রইলাম। সেই সুর, আমাকে তখনও তাড়া করে চলেছে।

তারপর অনেকদিন নানা কাজের অনিবার্য সোরগোলে সব হারিয়ে গেল। ক্যানসার হাসপাতালের প্রয়োজনে দেবদারু গাছের বাগান নিশ্চিহ্ন। কিন্তু সেই চিরকালের বাণী-বহ-ব্রতী পথিক-ভিখারী-বাউল, আখতারউদ্দিন সাদার্ন মার্কেটের বিপরীত দিকের রাস্তা সংলগ্ন ফুটপাতে সাময়িক বাসা বেঁধে প্রতিদিন গভীর রাতে ফুটপাত পেরিয়ে বেহালায় সুর ছড়িয়ে এগিয়ে চলে।

একদা লখনউ-এর গোমতীর তীরের ঝুপড়ীবাসী এই আখতার। অতুলপ্রসাদের স্নেহধন্য; তাঁর বহুগানের সুর সেই বেহালায় ধরে রেখে তা সুরায়িত করে চলে পথভোলা এই ভবঘুরে। স্বাধীনতার জন্য ভাইয়ে ভাইয়ে যে রক্ত-হোলির উন্মাদনা ঘটেছে তা আখতারউদ্দিন দেখেছে, দাঁতে দাঁত চেপে নীরবে বেহালায় অন্তরসিক্ত করে কাঙাল হয়ে দেশে দেশে মানুষের কাছে আর্তি জানিয়ে অবশেষে কলকাতায় এসেছে। এখানেই সে বিয়ে করেছে এক বাঙালি মুসলমান মেয়েকে।

এই আখতারউদ্দিনই আমার চেতনালোকে অতুলপ্রসাদ নামক একটি মানুষের কিছু কথা, কিছু বেদনার দীর্ঘশ্বাস আঁচড় কেটে রেখে গেলেন।

তারপর অনেকবর্ষ কেটে গেছে। জীবন ও জীবনচর্চায় অনেক উত্থান-পতন ও বিচিত্র ঘটনার তোলপাড়ে মানসিকতার পট পরিবর্তন দেশ ও মানবচরিত্রে ঘটে গেছে। বুদ্ধি ও চিন্তার স্থানও পরিবর্তিত হয়েছে।

১৯৭২ সালে নিখিলভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের লখনউ অধিবেশনে 'অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থের রচয়িতা মানসী বৌদিকে (মুখোপাধ্যায়) সম্মেলনের 'অমৃত' পুরস্কার প্রদান ও সংবর্ধনা জানান হ'ল। সেই সংবর্ধনা পত্রটি রচনার ভার পড়ল আমারই উপর। সেসময় থেকেই 'অতুলপ্রসাদের' প্রতি আরো আরো গভীরভাবে পর্যালোচনা ও তাঁর জীবন ও গান সম্পর্কে ভাবার, ধ্যান দেবার সুযোগ পেলাম।

অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টার, অতুলপ্রসাদ সঙ্গীতজ্ঞ কিন্তু অতুলপ্রসাদ যে লখনউ-এর তথা বহির্বঙ্গের মুকুটহীন সম্রাট—দীনের রাজা!

অতুলপ্রসাদ এবং তাঁর স্ত্রী হেমকুসুম— বিপরীত দুটি মেরু— একজন জীবন-ঐতিহ্যের প্রেরণায় মানবসেবায়, দেশসেবায় সবার সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য নিয়োজিত হয়ে প্রসারিত; আর জন নিভৃত অন্তরের পুঞ্জিভূত যৌবন ও প্রেমের একান্ত গোপন কন্দরে স্বামী-পুত্রকে নিয়ে আপনলোকে প্রস্ফুটিত হবার প্রত্যাশা— এ দুয়ের বিরোধ প্রায়শঃই মুখোমুখি— সহ অবস্থান নেই। তাই উভয়ের চাওয়া পাওয়ার অনিবার্য সংঘাতজনিত মানসিক যন্ত্রণা। প্রতিদিন উভয়ে উভয়ের জন্য মর্মভেদী আর্তনাদ, জটিলতার নিরবিচ্ছিন্নতার বেদনায় কাতর। এই যন্ত্রণার সাথে সাথে উভয়ে একান্ত

করে অতি নিকট সান্নিধ্যে থাকার ব্যাকুলতা— কিন্তু, ঘরের চাবি উভয়ের কাছে হারিয়ে গেছে। সেই ব্যাকুলতার রসঘন বিরহ ও বিরহানন্দের সুর অতুলপ্রসাদ আপন বিবশতাকে অতিক্রম করিয়ে গানে গানে আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে একটি সাময়িক পত্রিকায় (সম্ভবতঃ দৈনিক লোকসেবক) অতুলপ্রসাদের উপর আমার একটি লেখা প্রকাশিত হ'ল। এর কয়েকদিনের মধ্যে বাঙলাদেশের ঝিনুকদহ পল্লী-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'অতুলপ্রসাদ'-এর বিষয়ে একটি লেখা দেবার অনুরোধ-পত্র এল। তখন অনিবার্যভাবে নিজেকে সংযত সংহত করতে শুরু করলাম। লেখা দেবার সময় উত্তীর্ণ হবার পরও তাগাদাপত্র এ'ল। তখনও আমার লেখার জন্য তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে। হাতের কাছে যা যা ছিল তা তন্ন তন্ন করে লিপিবদ্ধ করে প্রায় ১০০ পাতার একটা লেখা পাঠিয়ে দিলাম। তারপর আর উত্তেজনা নেই— কিন্তু উৎকণ্ঠা প্রতিদিন— লেখাটির কী গতি হ'ল— অমনোনীত হলে ফেরৎ পাঠাবার অনুনয় জানিয়েছিলাম। কিন্তু লেখাটি প্রকাশিত বা অমনোনীত—কিছুই আর জানতে পারলাম না। মুছড়ে পড়লাম। বাঙলাদেশের পরিচিত বাল্যবন্ধুদের কাছে সব জানালাম, কিন্তু তারাও নীরব।

তারপর আর এক অধ্যায়। একজন নামী প্রকাশকের অনবরত তাড়নায় অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে প্রায় ৪৫০ পাতার একটি লেখা— আমার সমস্ত সঞ্চয়, বিবরণ ও তথ্য তিলে তিলে উজার করে লিপিবদ্ধ করে পাণ্ডুলিপি দিলাম। একটা পুলকানন্দ আমার চিত্তের সকল গ্রন্থিতে নেচে নেচে আমাকে মুগ্ধ, আমাকে কৃতার্থ করে তুলছিল অনবরত। ইতোমধ্যে আকাশবাণীর 'প্রবীণদের জন্য' বিভাগে 'অতুলপ্রসাদ' সম্পর্কে আমার বেশ কয়েকটি কথিকাও প্রচার করা হয়েছে।

এরই মধ্যে পণ্ডিচেরীতে শ্রদ্ধেয়া সাহানাদেবীর সঙ্গে দেখা করি— প্রণত হয়ে নূতন কিছু তথ্য জানতে পারি। তারপর আবার নিস্তরঙ্গ অসীম নিস্পৃহতা। প্রকাশককে বার বার অনুরোধ জানাচ্ছি— বইটি প্রকাশের জন্য। কিন্তু যা হবার তাই হ'ল। অবশেষে প্রকাশক জানালেন, পাণ্ডুলিপি খুঁজে পাচ্ছি না। আকাশের শূন্যতা আমাকে ঘিরে ফেলল; চুপসে গেলাম।

এদিকে 'অতুলপ্রসাদ সমগ্র' প্রকাশের পর পুস্তকটির চাহিদা আমাকে কিছুটা আশ্বস্ত করল।

ইতোমধ্যে অতুলপ্রসাদের ২৫টি গান নিয়ে পরিচিত ২ জন গাইয়ের সহযোগিতায় "আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী" শীর্ষক গীতি-আলেখ্য কয়েকটি স্থানে পরিবেশন করি। গীতি-আলেখ্যের গানে অতুলপ্রসাদের বেদনা, বিধ্বস্ত জীবনের প্রতিচ্ছবিতে মুগ্ধ হয়ে অনেক বুদ্ধিজীবী শ্রোতৃমণ্ডলী আমাকে অতুলপ্রসাদের বিষয়ে কিছু লেখার জন্য বলেন।

কাছেই এসে গেল অতুলপ্রসাদের ১২৫তম জন্ম বৎসর। প্রাণটা কেমন যেন মোচড় দিয়ে উঠল। অতুলপ্রসাদের কথা জানাবার জন্য মনটাতে নানা পরিকল্পনা জাগতে লাগল। সাহিত্য-সমালোচক বিদগ্ধ সাহিত্যরসিক বন্ধুবর ডঃ নিতাই বসু বারবার আমাকে উত্তেজিত করতে লাগলেন 'অতুলপ্রসাদ' সম্পর্কে তার গান ও জীবন সম্পর্কে লেখার জন্য, বই প্রকাশের জন্য। তখন তাতে আবার উৎসাহিত হই, কিন্তু 'স্মৃতির' কথা চিন্তা করে এবং তথ্য-সম্পদ হাতের কাছে না থাকায় আবার অবসন্ন হয়ে যাই। আকাশবাণীর প্রিয়জন শ্রীঅজিত বসু; 'অতুল-রজনীকান্ত-দ্বিজেন্দ্রলাল-নজরুল সঙ্গীতের প্রচারক এবং কাকলীর অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় নিশীথ সাধু— ডঃ নিতাই বসু এই তিনজনের তাড়নায় এবং আমার ব্যক্তিগত জীবনের একটি কৃত্যকে স্মরণ করে 'অতুলন অতুলপ্রসাদ' এর জন্য দ্রুত পাণ্ডুলিপি তৈরী করলাম।

অনেক ঘটনা অনিবার্যভাবে স্মৃতি থেকে সরে গেছে, তার জন্য কিছু ত্রুটিও থেকে গেছে—তবুও অগ্রসর হয়েছি এই ভেবে—

যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী;
যে ফেলবে তোরে বানের মুখে
সেই তো তরীর কর্ণধার।

'অতুলন অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থটি রচনায় 'অতুলপ্রসাদ'— মানসী মুখোপাধ্যায়; 'অতুলপ্রসাদ'— সুরেশ চক্রবর্তী; 'অতুলপ্রসাদ'— বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত; তত্ত্বকৌমুদী— অতুলপ্রসাদ সংখ্যা; আনন্দবাজার, যুগান্তর, অমৃতবাজার, বসুমতী পত্রিকা; প্রবাসী-ভারতবর্ষ, মানসী ও মর্মবাণী, উত্তরা-প্রবাসী সম্মেলনী, মাসিক পত্র-পত্রিকা এবং অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতের অসংখ্য প্রচারকবৃন্দ, সকলের কাছ থেকে মধু আহরণ করেছি।

প্রথাগতভাবে অতুলপ্রসাদের আনুপূর্বিক কোন জীবনী এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। গানই অতুলপ্রসাদের আত্মজীবনী। তাই প্রায় শতাধিক গানের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনের সূত্রটি গাঁথার চেষ্টা করেছি।

ঘোষ দস্তিদার পাবলিশিং কনসার্নের কর্ণধার স্নেহাস্পদ শ্রীনবকুমার ঘোষ দস্তিদারের অসীম সাহস ও মানসিক ঔদার্যের ফলেই বইটি প্রকাশিত হ'ল। এ ধরনের বইয়ের বিপনন ব্যবস্থায় দ্রুত কোন ফললাভ হয় না। তা সত্ত্বেও কল্যাণীয় নব কুমারের এই উদ্যম আমাকে অভিভূত করেছে।

সুনীলময় ঘোষ

দ্বিতীয় সংস্করণের বিনম্র নিবেদন

অতুলন অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি প্রকাশের অব্যবহিত পরে পরেই পাঠক ও অতুলপ্রসাদের গানের মরমী চর্চাকারীদের কাছ থেকে উক্ত গ্রন্থটিতে অতুলপ্রসাদের জীবন ও তাঁর সঙ্গীতের ভাষ্য সম্পর্কে নানা উৎসাহ-ব্যঞ্জক পত্র পেয়ে খুবই ভাল লেগেছিল। অতুলপ্রসাদের গান তাঁর প্রতিদিনের জীবন-উৎসারিত আনন্দ বেদনার অনুভূতির ফসল। দীর্ঘদিন তাঁর গানের তেমন প্রচার ছিল না—যতটুকু গাওয়া হোত তাও সীমিত পরিমণ্ডলে সুরের বিচিত্র অনুশীলনে।

জীবন প্রবাহের বিচিত্র গতিপথের অনুভূতির রসে গানের ভাষায় প্রাণ সঞ্চারিত—তা আবার সুরের খবরদারীতে এতদিন একপেশে কিছু গোষ্ঠীয় মজলিসে আবদ্ধ হয়ে অনুভবের স্বাভাবিক গতি রুদ্ধ হয়েছিল। গান গাওয়া হয়েছে কিন্তু গানের অন্তর-সত্তারপ্রাণকে অনুভব করা হয়নি— শ্রোতৃমণ্ডলীকেও ভাবিত করতে পারেনি। 'অতুলন অতুলপ্রসাদ' প্রকাশের পর সর্বস্তরে গানের প্রাণ-তরঙ্গে মানসিক প্রেক্ষাপটের চর্চায় অনুভূতির রস-স্নিগ্ধ ব্যাকুলতা গানের বেঁধে দেওয়া সুরের সঙ্গে ভাবের নব-জন্ম হয়েছে। অতুলপ্রসাদের অন্তর-জীবনের দরজা সবার জন্য খুলে দেওয়া হল। সুর অবশ্যই চাই-- কিন্তু তাকেই একমাত্র ধরে থাকলে অতুলপ্রসাদকে জানা যাবে না—কারণ অতুলপ্রসাদের জীবন ও সঙ্গীত সমার্থক। অতুলপ্রসাদ নিজেই বলেছেন,

...স্বরলিপি হল সুরের ও তালের কাঠামো। নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই যে সুরকে আটকে রাখতে হবে তা' তো নয়। অবশ্য কয়েকটি গান ছাড়া, যেমন আমার জাতীয় সঙ্গীতগুলি। সেগুলি সমবেত কণ্ঠে ভাল শোনায়, তাই সেগুলো নির্দিষ্ট সুরে একভাবে গাইতে হবে যাতে কারো অসুবিধা না হয়। কিন্তু অন্য গানের বেলায়, যেমন খেয়াল, ঠুংরী, গজল ইত্যাদি যেখানে গায়ক একা গাইছেন, সে বন্ধন থাকতে পারে না। শিল্পী গাইবার সময় গানের ভাবধারাটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে যদি তাল বিস্তার করেন, সুরের কোন রকম অঙ্গহানি না করে যদি সুরবিহার করেন, তা'হলে সেটা দোষণীয় নয়। শিল্পীর স্বাধীনতা আমি মানি, তবে যথেচ্ছাচার নয়; আমার গানে কালোয়াতী নয়, উচ্ছ্বাস থাকলেও সংযম থাকবে। শিল্পী যদি পারদর্শী হন, তিনি যদি গলার সূক্ষ্ম কাজ বার করতে পারেন তাতে ক্ষতি নেই, বরং তাতে গানের সৌষ্ঠব আরো বাড়বে। **শুধু স্বরলিপির উপর চোখ বুলিয়ে গাইলে সে গান মেকানিক্যাল, প্রাণশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা।...**

এ নিষয়ে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত সচেতন ভাবে রেণুকা দাশগুপ্তাকে একবার বলেছিলেন, ...আমার গানগুলি আমি চলে যাবার পর যা' তা সুরে গাওয়া হবে ভাবলে আমার অসহ্য মনে হয়।

একসময় অতুলপ্রসাদ হিমাংশু দত্ত মশায়কে তাঁর গানের স্বরলিপি করিয়ে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কখনও গাইয়ের অধিকারকে অস্বীকার করেন নি। প্রতিটি গান, তার ভাষা ও সুর সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত মমত্বপূর্ণ চেতনায় সজাগ ছিলেন। তাঁর গানে যেমন সমবেদনা, আশা, আকুতি, ভালবাসা তার সঙ্গে মিশেছে প্রাণের আবেগ। দুঃখ ও নৈরাশ্য তাঁকে বার বার বিব্রত করেছে কিন্তু তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি—ব্যাথার ব্যথী হয়ে আশার আলোকের সন্ধান করার জন্য সারাটা জীবন তিনি পথিকের মত চলেছেন। সহজ প্রাণখোলা আত্মপ্রকাশের ও আত্মনিবেদনে একান্তভাবে নিজের কথাকে সকলের করে দিয়ে গেছেন অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে।

আজ 'অতুলপ্রাসদ'কে নিয়ে বহু প্রতিষ্ঠানে চর্চা হয় যা ইতোপূর্বে ভাবাই যায়নি। আমি এ বিষয়ে দীর্ঘদিন যে পরিশ্রম করেছি আজ তা স্বার্থক হয়েছে। এখনো আমি ছুটে যাই এখানে-ওখানে, ছোট-বড়ো প্রতিষ্ঠানে "অতুলপ্রসাদের জীবন ও সংগীত" পর্যায়ে ২৫-৩০টি গানের মাধ্যমে অতুলপ্রসাদের জীবনকে সঞ্চারিত করতে। চারিদিকে অতুলপ্রসাদের গানের মধ্য দিয়ে তাঁর জীবনানুভূতির স্পর্শকাতর আনন্দ-বেদনার রসায়িত অনুভবে আমাদের অন্তর-চেতনায় উত্তরণের পথটিকে ধরে দেবার চেষ্টায় 'অতুলন অতুলপ্রসাদ' গ্রন্থটির প্রকাশ।

'অতুলন অতুলপ্রসাদ' দ্বিতীয় সংস্করণের অনেক তথ্য সংযোজন করা হয়েছে যা পাঠক ও গাইয়েদের' কাছে আদরণীয় হবে।

প্রকাশক 'আনন্দ প্রকাশন' পুস্তকটির মুদ্রণে ও পরিবেশনে অত্যন্ত নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন যা আমাকে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সুনীলময় ঘোষ

২৯তম কলকাতা পুস্তক মেলা ২০০৪
৬/৫১, বিজয়গড়
কলকাতা-৭০০ ০৩২

অতুলপ্রসাদ সেন

পত্নী হেমকুসুম দেবী ও পুত্র শ্রীদিলীপকুমার

উনিশ শতকের বঙ্গদেশ। চারিদিকে মানুষের অন্তর ও বাহির নতুন নতুন উদ্যমের, নতুন নতুন সৃষ্টির ব্যাপক জাগরণ, অভাবনীয় প্রাণ-সমৃদ্ধ প্রবাহ 'নবজন্মের' অনিবার্যতাকে গভীরভাবে স্পন্দিত করছিল শিল্পে-সাহিত্যে, ধর্ম-দর্শনে, রাজনীতি ও সমাজচেতনায়। প্রাচীনজ্ঞান ও কাব্যকলার নতুন আবিষ্কার, ব্যক্তিজীবনের নতুন আশা-আনন্দ, জীবন-আদর্শের নতুনবোধ—সব মিলিয়ে জাগরণের বিচিত্রধারা বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষকে পথ দেখাচ্ছিল। বঙ্গদেশের এই জাগরণে সমগ্র ভারতবর্ষ বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে—ধর্ম-সংস্কৃতি-সাহিত্য-রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, এক অর্থে সর্বক্ষেত্রে রূপান্তরের অভিনব সূত্রগুলির দিকে তাকিয়েছিল।

বাঙলার নব-জাগরণের সূত্রপাত হয় অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বসাধক রাজা রামমোহনের কলকাতায় বসবাসকালে। কলকাতায় থাকাকালে রামমোহন বেদান্ত-গ্রন্থের অনুবাদ করেন। বেদান্ত-গ্রন্থের অনুবাদের মধ্য দিয়েই নবজন্মের সূত্রটি ধীরে ধীরে দেশের মানুষের অন্তরলোককে একটা নতুন জাগরণের আলোক-পথে নিয়ে গেল। তিনি নতুন চেতনা, নতুন জীবনবোধ এবং নিকট ও দূরের ভাবনাকে একত্রিত করে অনুভব করার আয়োজনে সামগ্রিকভাবে পুরাতন ভাবনা ও চিন্তার বিভিন্ন ধারাকে চমকে দিলেন—যার ফলশ্রুতিতে শুধু বিধিবিধানই যে সব নয়, তা', জীবনের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপার মাত্র, গভীরভাবে অনুভূত হ'ল।

বহুকালের ব্যবহৃত সংস্কারজাত আচরণের অজ্ঞতা ও উচ্চবর্ণের খেয়াল খুশিতে বিবিধ অত্যাচার ক্রমাগত সাধারণ মানুষের জীবনকে দিশেহারা করেছিল---ন্যায়-অন্যায় বোধের কোন ধ্যান-ধারণা পর্যন্ত ছিল না।

১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা—১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা—১৮২৯ সালে সতীদাহ রহিত হওয়া, ডিরোজিও-ইয়ংবেঙ্গল-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ তথা সমাজ সংস্কারের অসাধারণ প্রগতিশীল মননের স্বচ্ছ-চিন্তা, নৈতিক জীবনের উন্নতির পথপ্রদর্শন ইত্যাদির অপ্রতিহত গতির প্রবাহে বঙ্গদেশ তখন সৃষ্টির ও অন্তর বিকাশের উন্মাদনায় প্রাণচঞ্চল।

রামমোহনের প্রায় ৫০ বৎসর পর ঈশ্বরচন্দ্র। ঈশ্বরচন্দ্রের ২০ বৎসর পর

এলেন কেশবচন্দ্র এবং বঙ্কিমচন্দ্র; ১৮৩৪ সালে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের আবির্ভাব—নীল-বিদ্রোহ—মধুসূদনের অভ্যুদয়—সব মিলিয়ে বাঙালির চিরাচরিত দেশজ সংকীর্ণতা ও অন্ধসংস্কারের মূলে প্রচণ্ডতম আঘাত এবং স্বদেশের ভাল-মন্দের প্রতি বোধের ও গভীর অনুরাগের জাগরণের আস্বাদন ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে নতুন জোয়ার এল।

১৮৬৬ সালে রাজনারায়ণ বসুর **'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা'**র প্রেরণায় নবগোপাল মিত্র জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সহযোগিতায় **১৮৬৭ সালে 'হিন্দুমেলা'র প্রতিষ্ঠা করেন।**

মধুসূদনের প্রতিভার দীপ্তিতে উজ্জ্বল স্বদেশের গৌরব-বোধ, হিন্দুজাতির পুনরুত্থান, মনুষ্যত্ববোধের নতুন মহিমা সব মিলিয়ে তার সংহত রূপ 'হিন্দুমেলা'র মধ্যে শোভিত হল।

এলেন কেশবচন্দ্র সেন ১৮৩৮ সালে। তাঁর ধর্মচেতনার নব নব ভাষ্য বাঙলা তথা ভারতবর্ষের স্থিতি-শক্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিল। 'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর, বাঁচিবে, যাহা কিছু অভাব পাইবে' এই সত্যবোধের বেগ গভীরভাবে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতিদিনেব আচরণে তখন সর্বত্র আলোড়িত।

১৮৫৮ সালে হিমালয় থেকে ফিরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হিমালয়ের নিবিড়তার সাধনায় ভগবৎ-উপলব্ধির ফসল কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজের নিত্য প্রার্থনায় অনুরণিত করলেন। কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ দু'জনেই সমাজকল্যাণধর্মী—ভগবৎ-অনুরাগকে সর্বত্র সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হলেন।

শিল্পী এবং স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অভ্যুদয়—তাঁর চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ দেশের শিক্ষিত সমাজ। দেশ ও জাতির পুনর্গঠন এবং পুনরুজ্জীবন ভাবনায় বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী গভীরভাবে সমাজের চিন্তাশীলদের বিভিন্নদিকে পথ দেখিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন নি। তবে ব্রাহ্মধর্মের আদর্শে প্রভাবিত হয়তো ছিলেন। হিন্দুত্ব না ছেড়ে হিন্দুকে প্রগতির কাজে যুক্ত করলেন তাঁর চেতনা ও লেখনীকে। তাঁর কাছে ধর্ম ও ঈশ্বর-বিশ্বাস অবিভাজ্য।

সাহিত্য ও জাতীয় সঙ্গীত, হিন্দুমেলা, বাঙলার জাতীয় নাট্যশালা, বঙ্গদর্শন—এ সব কিছুর মধ্যে জাতীয় চেতনার যে প্রকাশ-বেদনা বিভিন্নভাবে অনুভূত হচ্ছিল, সেই প্রকাশ-বেদনার সংহত রূপ পেল সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর **প্রতিষ্ঠিত ১৮৭৬ সালে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ভারত-সভার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।** রাজশক্তির অপ্রসন্নতা ও বাধার বিরুদ্ধে শিক্ষিত বাঙালির আত্মপ্রকাশেব যে সংগ্রাম তার প্রত্যক্ষ সাংগঠনিক রাজনৈতিক রূপ এই ভারত-সভা। সুরেন্দ্রনাথ এই 'ভারত-

সভা' গঠনের প্রেরণা কেশবচন্দ্র সেনের অসাম্প্রদায়িক কর্মধারা থেকে পেয়েছিলেন।

১৮৭৫ সালে কেশবচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় দক্ষিণেশ্বরের মহাযোগী রামকৃষ্ণ পরমহংসের—শুধু পরিচয় নয়, গভীর বন্ধুত্বও হয়। রামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক সাধনালব্ধ গভীর জ্ঞান এবং মানব-সংসারের স্বচ্ছ অভিজ্ঞতার সম্পদ গভীরভাবে সেসময়ের শিক্ষিত বাঙালি চিন্তানায়কদের প্রভাবিত করেছিল। তখন সমগ্র বঙ্গদেশে যে বিশ্বমুখী সাধনার আয়োজন চলছিল—রামকৃষ্ণের ভাবনা তাকে গতি দিল এবং সকলের সঙ্গে যুক্ত হ'ল। প্রাচীন সাধনার গতি-প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ অন্য নতুন প্রকৃতির। সেসময় শিক্ষিত হিন্দু সমাজে প্রতিমা-পূজা বিরোধী মনোভাবকে রামকৃষ্ণের সাধনায় নিরাকার পূজা ও সাকার পূজা তুল্যমূল্য বলে শিক্ষিত সমাজ অনুভব করল। **রামকৃষ্ণ জানালেন—ভোগ নয়—ত্যাগই একমাত্র পথ। তিনি মৃন্ময়কে চিন্ময় অনুভবের কথা সাধনার স্তরে নূতন গতি আনলেন। সেই 'যত মত তত পথ' এই সত্য উপলব্ধিতে বাঙলার যুব-সমাজ গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।**

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (বিবেকানন্দ)র জন্ম ১৮৬৩তে। প্রাণ-প্রাচুর্যে সর্বদিকে নরেন্দ্রনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের উদ্যোগী সভ্য। **এই নরেন্দ্রনাথই পরবর্তী সময়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে তাঁর অসাধারণ ভগবৎ-নির্ভরতায় তাঁকে 'অবতার বরিষ্ঠ' বলে পূজা নিবেদন করেছিলেন এবং নিজে রামকৃষ্ণময় হয়ে হিন্দুর সনাতন ধর্মের মূল সত্য প্রচার করে বিশ্বজয় করেছিলেন।**

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এমনি বাতাবরণে ও সামাজিক-রাজনৈতিক পটভূমিকায় সমগ্র দেশ অনুপ্রাণিত এবং কর্মচঞ্চল। সমাজ-সেবা ও ভগবত-সেবার অভিন্নতা সম্পর্কে নতুন সাধনা-পথ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। বর্তমান বাঙলাদেশের ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর পরগণায় দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগরা গ্রামে এক দরিদ্র কবিরাজ কৃষ্ণচন্দ্র সেন। তখন সময়টা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর রমরমা। চারিদিকে প্রথাগত বিধিব্যবস্থার উপর নূতন নূতন ভাবনা-চিন্তার প্রভাব কার্যকর হচ্ছে। কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর নিজস্ব পরিমন্ডলে বেশ পরিচিত—সকলেই তাঁকে ভালবাসে শ্রদ্ধা করে। জীবিকাবৃত্তিতে বেশ হাতযশ আছে—তাই নিত্যদিনের অনিবার্য প্রয়োজন কবিরাজির পেশায় মিলে যেত প্রতিবেশীদের দেওয়া শাক-সব্জি-ফলমূল-এমনকি দুধ-ঘি পর্যন্ত। মোটের উপর অন্নাভাব তেমন প্রকট ছিল না।

কৃষ্ণচন্দ্রের তিন ছেলে-দুই মেয়ে। দুর্গাপ্রসাদ সেন, গুরুপ্রসাদ সেন এবং কনিষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন। কন্যাদের মধ্যে বড় উমাতারা, ছোট ভবসুন্দরী।

রামপ্রসাদ সেন শৈশবে গ্রামের পাঠশালায় পড়েছেন। তারপর আর্থিক অব্যবস্থা ও অস্বচ্ছলতার জন্য রামপ্রসাদের শৈশব জীবন ও লেখাপড়া তার সহোদর জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবসুন্দরীর বাড়ীতে কেটেছে। সেখানেই রামপ্রসাদ মাতৃভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ও পারসি ভাষার চর্চা করেন। প্রথম জীবনে রামপ্রসাদ সেন জাপসা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেছেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন প্রসন্ন ছিল না। একটা উচ্চাভিলাষ তাঁকে কলকাতায় নিঃস্ব অবস্থায় নিয়ে এল। কলকাতায় তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পরিচিত হন। মহর্ষি রামপ্রসাদের ভক্তি, দৃঢ়চিত্ততা এবং সাহসে মুগ্ধ হলেন। অতঃপর দেবেন্দ্রনাথের উদ্যোগে ও সহযোগিতায় রামপ্রসাদ কলকাতার মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেন। তখন মেডিকেল কলেজে বাঙলায়ও ডাক্তারী পড়ানো হত। রামপ্রসাদ ডাক্তার হলেন। সেসময় তিনি মহর্ষির দ্বারা ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হলেন এবং ঢাকায় এসে পাগলা-গারদে সরকারী চাকুরী গ্রহণ করলেন। কেশবচন্দ্র সেন যখন ঢাকায় এসে তাঁর নূতন আদর্শের মূল সূত্রগুলি জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করলেন এবং বিশ্লেষণ করলেন, তখন ঢাকার এবং বরিশালের বহু বিখ্যাত মানুষ ব্রাহ্মধর্মে আকৃষ্ট হলেন এবং কেশবচন্দ্রের আদর্শে 'নববিধানে' যোগদান করলেন। রামপ্রসাদও 'নববিধানে' যুক্ত হলেন।

কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মবোধে, সমাজ সংস্কারে সকলের সার্বিক কল্যাণে সমান অধিকার স্থাপনের কথা বার বার উল্লেখ করতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্ম-বিশ্বাসে অনুগত মানসিকতা এবং স্ত্রীজাতির সুশিক্ষা বিস্তারের পরিকল্পনাকে তৎকালের বহু খ্যাতিসম্পন্ন মানুষ গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই, যাঁরা কেশবচন্দ্র সেনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'নববিধানে' যোগদান করেছিলেন পরবর্তী সময়ে তাঁরা 'নববিধানের' বিধানকে পুরোপুরি প্রতিদিনের জীবনচর্চায় গ্রহণ করতে পারলেন না। পূর্ণাঙ্গ ধর্মজীবনের কঠিন পথ থেকে অনেকেই তখন সরে দাঁড়ালেন। তাঁরা যুক্তিবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার সাথে ভক্তিবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারলেন না—তাঁদের কাছে ভক্তিবাদ কুসংস্কার। ধীরে ধীরে তাঁরাই ১৮৭৮ সালে 'নববিধান' ত্যাগ করে আলাদা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করলেন—তাতে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ করে আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গামোহন দাশ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন উল্লেখযোগ্য।

ব্রাহ্মধর্ম যাঁরা গ্রহণ করতেন সমাজ তাঁদের একঘরে করত। রামপ্রসাদ ঢাকায় যখন এলেন তখন তাঁকেও সমাজচ্যুত করা হল। কিন্তু তাতে তিনি এতটুকু বিষণ্ণ

হননি। বিশ্বাস-ত্যাগ-ঈশ্বর-নির্ভরতার উপর তাঁর প্রতিদিনের সাধনা—একক জীবন, অসচ্ছল জীবিকা—তবুও ধর্মবোধের প্রেরণায় মানুষের সেবা করে যেতেন অবিরাম গতিতে। তিনি পাগলা-গারদে প্রতিদিন রুটিন মাফিক চিকিৎসার কাজ ছাড়াও গারদে আবদ্ধদের কাছে পরম ঈশ্বরের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য উপাসনা করতেন—যদি তাঁর দেখাদেখি গারদ-বাসীদের মানসিক পরিবর্তন হয়।

পাগলা-গারদের পাগলা-ডাক্তার রামপ্রসাদ সেনের সহমর্মিতা ও চারিত্রিক স্বচ্ছতার কথা ঢাকার সর্বস্তরের কাছে বিদিত হয়ে গেল। সে'সময়ে ঢাকায় ব্রাহ্মঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের প্রভাব খুবই ব্যাপক। তাঁর রচিত সঙ্গীত এবং ব্যবহারিক জীবনধারা সাধারণ মানুষের কাছে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে খুবই আদরণীয় ছিল। কালীনারায়ণের স্ত্রী অন্নদাদেবীও ঈশ্বর-নির্ভর। উভয়ের কন্যা হেমন্তশশী গুণবতী, ধর্মশীলা, সহিষ্ণু, সাহসিনী—এক কথায় সর্বগুণসম্পন্না। কালীনারায়ণ তাঁর কন্যার বিবাহ দিলেন রামপ্রসাদ সেনের সঙ্গে। রামপ্রসাদ সেন তীর পেলেন। সরকারী চাকুরীর একঘেয়ে জীবনে রামপ্রসাদের মন প্রসন্ন হত না। উন্নত মানসিকতার ভূমি নেই, পরিবেশ অপরিচ্ছন্ন—প্রায়ই নানাভাবে রামপ্রসাদের দৈনন্দিন গারদ-কাজে অন্য কর্মীদের সঙ্গে কলহ হত—অন্যায় কাজ হত, যা রামপ্রসাদের সহ্য করা সম্ভব ছিল না। পরের চাকুরী করাও তাকে বেদনা দিত।

প্রায়ই গারদের কাজের শেষে বাড়ী এসে চুপচাপ বসে থাকেন। স্ত্রী হেমন্তশশী স্বামীর গম্ভীর মুখ দেখে সব বুঝতে পারতেন। রামপ্রসাদও সব খুলে বলতেন। হেমন্তশশী বলতেন, 'চাকরি করার দরকার নেই, প্রাইভেট ব্যবসা কর—ঢাকায় তোমার নাম আছে—সবাই তোমায় ভালবাসে। সাহসিনী, ঈশ্বরনির্ভরা সুন্দরী স্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে পাগলা-গারদের ডাক্তারের চাকুরী তিনি ছেড়ে দিলেন এবং হাসনাবাজারে মিরাতারের ভাড়া বাড়ীতে 'এ. পি. সেন নিউ মেডিকেল হল' নামে নিজস্ব দোকান করলেন। রামপ্রসাদ যেন মুক্ত হাওয়ায় প্রাণ ফিরে পেলেন। কিন্তু সারাদিনের কর্মক্লান্ত জীবনে 'উপাসনার'—'প্রার্থনা কর, প্রার্থনা কর' নিজস্ব একটা আলয় না থাকায় মনঃকষ্টও অনুভব করতেন। কিন্তু হতাশ হতেন না। যা উপার্জন করতেন রামপ্রসাদ প্রিয়তম পত্নীর সহযোগিতায় 'উপাসনালয়' নির্মাণের জন্য কিছু সঞ্চয় করতেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৮৭১ সাল। অক্টোবর মাস। শরৎকাল—প্রকৃতির নিরাভরণ সৌন্দর্য তিল তিল করে আলো-আকাশের সীমাহীন আনন্দের দ্যুতিতে ছড়িয়ে দিচ্ছে ভুবন।

এমনি **একটি দিনে ২০শে অক্টোবর,** ঢাকায় ভাটপাড়ায় ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্তের লক্ষ্মীবাজারের বাড়িতে রামপ্রসাদ সেন ও হেমন্তশশীর পুত্রসন্তান জন্মলাভ করল।

মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের আনন্দের সীমা নেই। তাঁর প্রথম দৌহিত্র নবজাতককে ঈশ্বরের আশীর্বাদী-কুসুম বলে বুকে তুলে নিলেন। **তাই তিনিই নবজাতকের নাম দিলেন অতুলপ্রসাদ।—পরম কল্যাণময়ের অপরিসীম করুণার প্রসাদ অতুলপ্রসাদ।**

রামপ্রসাদ সেন ভক্ত, ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে নিবেদিত প্রাণ। প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনের নানাবিধ কাজ-কর্মে রামপ্রসাদ সৎ-মানসিকতার সঞ্চার করতেন—উদ্দেশ্য মানুষের সেবা—আর্তজনের পাশে থেকে মমতার পরশ দান করা। ঈশ্বর-নির্ভরতা ও নিষ্কাম কর্মের প্রেরণায় রামপ্রসাদ বিশেষভাবে আলোকিত হন নিজের ভেতরের অবর্ণনীয় কোন এক দীপশিখাব প্রজ্জ্বলিত আলোতে। তখন তিনি এককভাবে সম্পূর্ণ অনন্য হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় পত্নী হেমন্তশশীর সহযোগিতা তথা বিচারানুভূতি, আন্তরিক সেবা এবং ভালবাসা। স্বামীকে নানাভাবে উৎসাহ এবং উদ্দীপ্ত করার সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতেন সকল কাজে হেমন্তশশী। পিতা কালীনারায়ণ গুপ্তের শিক্ষা ও মনুষ্যসেবা, জাতি-ধর্ম ভেদাভেদশূন্যতাও এর মূলে ক্রিয়াশীল ছিল।

শিশুপুত্রের একাকীত্ব কাটাবার জন্য রামপ্রসাদ তাঁর মেজভাই গুরুপ্রসাদের পুত্র সত্যপ্রসাদ সেনকে নিজের কাছে পড়াশোনার জন্য মিরাতারের বাড়ীতে নিয়ে আসেন—নবজাতক অতুলের সহযোগী হবার জন্য।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

প্রতিদিন ভোরে রামপ্রসাদ সেন শয্যা ত্যাগ করে ঊষা বন্দনা করতেন।

রামপ্রসাদ গাইতেন,

'অয়ি সুখময়ি ঊষে, কে তোমারে নিরমিল
বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল।

উপনিষদ থেকে ছন্দময় সঙ্গীতে গাইতেন,

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎ কিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনম্।।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাব শিষ্যতে।।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গানের কলি এবং সংস্কৃত ছন্দের ধ্বনি শিশু অতুলপ্রসাদকে প্রভাতের সংবাদ দিত। ঘুমে আচ্ছন্ন চোখ দুটি রগড়াতে রগড়াতে শয্যা ত্যাগ করে পিতার পাশে ধ্যানাসনে বসে অস্ফুটস্বরে সঙ্গীতে এবং ছন্দবদ্ধ স্তোত্রে কণ্ঠ মিলাতেন। রামপ্রসাদও পুত্রকে নিজের কোলের কাছে টেনে নিতেন—সঙ্গীতের মূর্ছনায় বিভোর হয়ে উপাসনায় একাকার হয়ে যেতেন।

একটা অদৃশ্য আন্তরিক নিস্তব্ধতায় শিশু অতুলপ্রসাদের অন্তর স্নিগ্ধ, পবিত্র, অমলিন সুখানন্দে সকল ক্লান্তির অবসান ঘটাত।

প্রতিদিনের এই ঊষা বন্দনার এবং স্তোত্রের সুর ও স্বরের মাধুর্যমণ্ডিত পরিমণ্ডলে অতুলপ্রসাদের বিচরণ ধীরে ধীরে একান্তভাবে আয়ত্তের সীমায় এসে গেল।

প্রাতঃরাশের পর রামপ্রসাদ তাঁর নিত্যদিনের কাজে—ডিসপেনসারী খুলে অপেক্ষমান রোগীদের ঔষধ দিতে যেতেন আর অতুলপ্রসাদ মাতা হেমন্তশশীর কাছে লেখাপড়ার জন্য বাড়ীর ভেতরে ছুটে যেতেন।

ডিসপেনসারীতে রামপ্রসাদ বন্ধু-বান্ধব অভ্যাগতদের সঙ্গে নানাবিষয়ে, বিশেষ করে ধর্ম-আলোচনা করতেন। কখনো কখনো মিরাতারের বাড়ীতে ডাক্তার সূর্যনারায়ণ সিংহ, ডাক্তার দুর্গাদাস রায়, ডাক্তার প্রিয়লাল বসু, কাশীচন্দ্র দত্তগুপ্ত প্রভৃতিগণ আসতেন। মাঝে মাঝে ডাঃ ক্রমবি সাহেবও আসতেন।

প্রতি বৎসর রামপ্রসাদ কাজের ক্লান্তি দূর করার জন্য নিজের দেশের বসত-বাড়ীতে যেতেন। রামপ্রসাদ নিজের উপার্জিত অর্থে দেশের বাড়ীতে একটি ইস্কুল তৈরী করেছিলেন—অতি সাধারণ দরিদ্র ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য। রামপ্রসাদ একবার স্ত্রী পুত্র নিয়ে দেশের বাড়ী গিয়েছিলেন—ফেরার পথে পদ্মানদীতে বজরায় আসছেন—সেসময় ঝড় ও তুফান উঠল। সময়টা ১২০০ বঙ্গাব্দ। প্রচন্ড ঝড় বন্যায় বজরার মাঝিদের পরামর্শে প্রাণ বাঁচাবার জন্য তাড়াতাড়ি চড়ায় উঠলেন। চড়াও বন্যার জন্য ডুবে যাচ্ছে—স্রোতের টান তীব্র—পা রাখা যাচ্ছে না। রামপ্রসাদ শিশুপুত্র অতুলপ্রসাদকে কাঁধে তুলে নিলেন আর পরম নির্ভর করুণাময়ের ধ্যান করতে লাগলেন। অবশেষে অশান্ত ঝড় শান্ত হল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

যথাসময়ে অতুলপ্রসাদ এবং সত্যপ্রসাদ পিতৃবন্ধু ডাঃ দুর্গাদাস রায়ের মডেল স্কুলে ভর্তি হলেন।

মডেল স্কুলে পাঠ শেষ করে অতুলপ্রসাদ ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের নবম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন।

রামপ্রসাদ সাহেবি কায়দার পোশাক ভালবাসতেন এবং নিজে তা ব্যবহার করতেন। এই নিয়ে অতুলপ্রসাদের ছোট বন্ধুরা ঠাট্টা করত কিন্তু রামপ্রসাদকে শ্রদ্ধাও করত।

রামপ্রসাদ প্রায়ই অতুলপ্রসাদকে বলতেন, জান তো আমরা ব্রাহ্ম। ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। খুব উঁচু স্তরের ধর্ম।

স্কুলে শিক্ষক আসতে দেরী করলে অতুলপ্রসাদ বন্ধুদের সঙ্গে গান করতেন। রামপ্রসাদ নিজে গান গাইতেন—তাই অতুলপ্রসাদের গানের প্রতি আকর্ষণ শৈশব থেকেই জেগেছিল।

এদিকে ১৮৭৮ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কন্যা সুনীতি দেবীর সঙ্গে কুচবিহারের মহারাজার বিবাহকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মসমাজে আদর্শ ও নীতিবোধের সংঘাত এল এবং তাতে **'ভারতীয় ব্রাহ্ম সমাজ'** দু'ভাগে ব্রাহ্ম-সমাজের রূপান্তর ঘটল। ব্রাহ্ম-সমাজের এই ভাগের প্রভাব ঢাকায়ও তীব্রভাবে এল। শিবনাথ শাস্ত্রী, পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রজনীকান্ত ঘোষ, প্রসন্নকুমার মজুমদার, ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রভৃতি 'সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে' গেলেন—আর 'নববিধান সমাজে' যাঁরা কেশবচন্দ্র সেনকে সমর্থন করলেন, তাঁরা হলেন বঙ্গচন্দ্র রায়, কৈলাশচন্দ্র নন্দী, গোপীকৃষ্ণ সেন, দুর্গাদাস রায়, রামপ্রসাদ সেন প্রভৃতিগণ।

ঢাকায় 'নববিধান সমাজে'র নিজস্ব কোন উপাসনাস্থল ছিল না। রামপ্রসাদ তাঁর ভাড়া বাড়ীতেই উপাসনা কাজ করতেন প্রতি রবিবার। উপাসনার সাথে সাথে ব্রহ্মসঙ্গীতও পরিবেশিত হ'ত।

রামপ্রসাদের শ্বশুর ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র অন্তর্ভুক্ত হলেও তিনি প্রতি রবিবার রামপ্রসাদের বাড়ীর উপাসনায় যোগ দিতেন।

অতুলপ্রসাদ পিতার ব্রহ্মসঙ্গীত পরিবেশনে যোগ দিতেন, খোল বাজাতেন এবং কণ্ঠ দিতেন।

রামপ্রসাদ মিরাতারের কালীপ্রসন্ন বসুর বাড়ীতে এক নাগাড়ে এগার বছর ভাড়া আছেন। বারো বছর হ'লে ভাড়া বাড়ীর উপর ভাড়াটিয়ার স্বত্ব এসে যায়—তাই কালীপ্রসন্ন বসুর অনুরোধে রামপ্রসাদ ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দেন। কারণ, ছেড়ে না দিলে কালীপ্রসন্নবাবুর প্রতি অধর্ম করা হবে—যা রামপ্রসাদের পক্ষে করা সম্ভব না।

বাড়ী ছেড়ে দিয়ে কালীনারায়ণ গুপ্তের নির্দেশে রামপ্রসাদ স্ত্রী, পুত্র ও তিন

কন্যা—হিরণবালা, কিরণবালা ও প্রভাবতী এবং সত্যপ্রসাদকে সঙ্গে করে কালীনারায়ণের বাড়ীতে উঠে এলেন। রামপ্রসাদ নিজে দিনে ডিসপেনসারীতে কাটাতেন, রাত্রিতে লক্ষ্মীবাজারে কালীনারায়ণ গুপ্তের বাড়ীতে যেতেন।

কিন্তু 'নববিধান' সমাজের উপাসনা স্থানের অভাব হ'ল। রামপ্রসাদ অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করলেন নিজস্ব উপাসনা গৃহ সম্পর্কে। স্থির হল, 'নববিধান সমাজে'র উপাসনা ঘর চাইই। তার জন্য টাকা দরকার। রামপ্রসাদ নিজে ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ঢাকার পথে পথে চাঁদা তুলতে লাগলেন। তাতে রামপ্রসাদের নিকটজন, আত্মীয়জন এবং কিছু বন্ধু আপত্তি জানালেন। কিন্তু কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী রামপ্রসাদ সেন আদর্শ ও জীবন একই সূত্রে গ্রথিত করেছেন—তাই কারো ভর্ৎসনায় পথ থেকে সরে যান নি। এমনি পরিস্থিতিতে রামপ্রসাদ একদিন হেমন্তশশীকে জিজ্ঞাসা করলেন—আমি মন্দিরের কাজে রাস্তায় অর্থ সংগ্রহ করছি—এটা কি অন্যায়! হেমন্তশশী রামপ্রসাদের কাছে এসে আপন অন্তরের সকল ব্যাকুলতা দিয়ে বুকে হাত রেখে বললেন, না গো, না—তুমি কোন অন্যায় করছ না। ঠিক পথই তোমার—তবে শরীরটা বেশী কষ্ট সহ্য করছে—সেদিকে নজর দিও। এমনি একদিন রাত্রিতে রামপ্রসাদ বন্ধু রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের কুলীনদের বহু বিবাহ বন্ধ করার বিষয়ে চিন্তা করতে করতে স্ত্রী হেমন্তশশীকে কাছে ডেকে বললেন, যদি কোন পুরুষ তার স্ত্রীর মৃত্যুর পর পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন তা যদি সমাজ মেনে নেয় তাহলে স্বামীবিয়োগের পর স্ত্রীরও দ্বিতীয়বার বিবাহে আপত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়—তুমি কি বল!

হেমন্তশশী আনত নয়নে রামপ্রসাদের কথাগুলো চিন্তা করতে করতে একবার স্বামীর দিকে তাকালেন এবং অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ কথা অন্তরে বিশ্বাস কর!

রামপ্রসাদ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, নিশ্চয়ই; আমি মনে প্রাণে তা মেনে নেবো।

ঝড়-বৃষ্টি রোদে রামপ্রসাদ অবিরাম পরিশ্রম করে উপাসনা গৃহের জন্য অর্থ সংগ্রহ করছেন—তার ফলে রামপ্রসাদ অসুস্থ হ'লেন। দেহে একটি বিষাক্ত ব্রণ ফোড়ায় পরিণত হল। এবং নিজেই তা' অপারেশন করলেন। কিন্তু ফল বিপরীত হ'ল। ডায়াবেটিজ ছিল বলে' অপারেশনের পর ক্ষত স্থান শুকালো না। অবশেষে রামপ্রসাদ কার্বাঙ্কলে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর সন্নিকটে উপস্থিত—সে'সময় কালীনারায়ণ গুপ্তের চেষ্টায় রামপ্রসাদকে তাঁর বাড়ী লক্ষ্মীবাজারে স্থানান্তরিত করা হ'ল।

অবশেষে মারাত্মক ব্রণ থেকে কার্বাঙ্কলে পরিণত হল। রামপ্রসাদ একেবারেই

শয্যাশায়ী। নববিধান সমাজের সবাই রামপ্রসাদের কাছে আসছে, কিন্তু দেখা করা বারণ। কেউ কেউ আসেন—কিন্তু বিশেষ কথা বলেন না রামপ্রসাদ। এদিকে উপাসনা মন্দিরের কাজ পুরোদমে চলছে তার খবর নিচ্ছেন রামপ্রসাদ—তাতেই তার সকল অসহ্য যন্ত্রণা যেন দূর হয়ে যায়—মাঝে মাঝে তিনি উপনিষদের স্তোত্র পাঠ করেন। দুর্বল শরীর—দিনে দিনে অবস্থা আয়ত্বের বাইরে চলে যাচ্ছে—ডাক্তার আসছে—চিকিৎসা হচ্ছে—ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডঃ পি. কে. রায় সহ অনেক বড় বড় ডাক্তার এলেন—কিন্তু হল না কিছুই।

১৮৮৪ সনে সেখানেই রামপ্রসাদ সেন পরলোকে গমন করেন। স্ত্রী হেমন্তশশী ছেলে-মেয়েদের বুকে-কোলে জড়িয়ে অঝরে কান্নায় কান্নায় যখন প্রায় হতচেতন তখন পিতা কালীনারায়ণ গুপ্ত হেমন্তশশীর মাথায় হাত রেখে বললেন, মৃত্যু অনিবার্য—প্রাণ যিনি দেন তিনিই তা নেন—ভাবনা করো না মা, তিনিই সব ব্যবস্থা করবেন। আমি তো আছি। বড় ভাই কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তও বিধবা বোন হেমন্তশশীর কাছে এসে বললেন, ভাবিস না—আমরা তো আছি।

এদিকে সত্যপ্রসাদ কাকা রামপ্রসাদের মৃত্যুতে খুব বেদনাসিক্ত হলেন। সকলের অজানতে একা নীরবে শোক-তাপিত কান্নায় ক্লান্ত, অবসন্ন হয়ে পড়লেন। সবাই তার খোঁজ করছে, কোথায় সত্যপ্রসাদ! অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর সত্যপ্রসাদকে পাওয়া গেল—। স্থির হল, হেমন্তশশী ছেলে মেয়েদের সঙ্গে সত্যপ্রসাদকে নিয়ে মিরাতারের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে পিতা ভাইদের সংসারে যাবেন। সত্যপ্রসাদ যেতে চাইলেন না। হেমন্তশশী সত্যপ্রসাদকে ডেকে বললেন, তুমি আর অতুল আমার কাছে সমান। অতুলের মামা তোমারও মামাবাড়ি—দু'জনই আমার ছেলে। বিধবা হেমন্তশশী পুত্র, সত্যপ্রসাদ সহ কন্যাদের নিয়ে পিত্রালয়েই থেকে যেতে বাধ্য হলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রথমজীবনে হিন্দু, পরম বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর মা খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন—কিন্তু কালীনারায়ণ মা'কে প্রণাম না করে কোন কাজ করতেন না।

সকল ধর্মের সকল জাতের মানুষের অন্তর-সত্যের প্রতি ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। তিনি প্রায় তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের বলতেন, আসল ধর্ম মানুষ—কারণ 'সবার উপরে মানুষ সত্য'। এই সত্যই আসল উপাসনার মন্ত্র। মানুষের মধ্যেই পরম ব্রহ্মের প্রকাশ নিতুই নব।

বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্রের মৃত্যুতে ঋষি কালীনারায়ণ গুপ্ত প্রার্থনায় বলেছিলেন,— হে প্রাণের আরাম, তুমি যে আজ দয়া করিয়া আমার স্নেহের ধনকে রোগ-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিয়া দিলে এজন্য কৃতজ্ঞতা ভরে তোমায় প্রণাম করিতেছি।

কালীনারায়ণ গুপ্তের চার পুত্র—স্যার কে. জি. গুপ্ত, ডঃ প্যারীমোহন গুপ্ত, গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত এবং বিজয়চন্দ্র গুপ্ত; ছয় কন্যা—হেমন্তশশী, সৌদামিনী, চপলা, সরলা, বিমলা ও সুবালা।

একটি সুন্দর প্রাণ-সম্পদের সংসার অতুলপ্রসাদের মাতুলালয়। সেখানে অন্তর-প্রসারের সাধনা হত অনবরত—ছোট, বড় যেকোন ঘটনা ও আলোচনায়। এমনি বাতাবরণে সত্যপ্রসাদ কোনদিনই নিজেকে এতটুকু 'নিজের মাতুলালয়' নয় বলে ভাবতে পারতেন না। সত্যপ্রসাদ ডাইরিতে লিখেছেন... আমি এখানে যে যত্ন স্নেহ পাইয়াছি, তাহা স্মরণ করিতেই আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠি। কোনমতে তাহারা বুঝিতে দিতেন না যে এ বাড়ি আমার আপন মাতুলালয় নহে। বিনয় ছিলেন আমাদের কিছু বড়। প্রতি সময় আমরা পাবনার ধুতি পাইতাম, বিনয়-অতুল কি আমার কাপড়ের কোন প্রভেদ থাকিত না।...

মানুষকে ভালবাসার আদর্শ কালীনারায়ণ শুধু বলতেন না, নিজের জীবনে তার প্রত্যক্ষ আচরণ ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপেও সার্থকভাবে রূপ দিতেন। সমাজের মাঘোৎসবে তিনি নিজের হাতে সকল স্তরের মানুষকে প্রাণভরে খাওয়াতেন এবং দু'হাত ভরে অন্ধ-আতুর-দীন-দুঃখীদের দান করতেন।

'গান'-এর মধ্য দিয়ে কালীনারায়ণ মানুষের অন্তরে সহজভাবে প্রবেশ করতেন। বিভিন্ন সময়ে মানুষের প্রতি কেউ অবজ্ঞা করলেই কালীনারায়ণ বেদনা পেতেন এবং সেই বেদনার জ্বালায় গান রচনা করেই নিজেই তা গেয়ে গেয়ে প্রচার করতেন। কীর্তন বড় ভালবাসতেন কালীনারায়ণ। তাই তাঁর রচিত গানগুলিতে 'ভাবসঙ্গীত' (কীর্তনের সুর) এবং তারই সঙ্গে পরম ব্রহ্মের গুণ-গাঁথার মধ্য দিয়ে উপাসনার সূত্রগুলি অতি নিপুণভাবে গ্রথিত করে সাধারণের কাছে প্রচার করতেন। এ'কাজে শৈশব থেকেই নাতি অতুলপ্রসাদের উদ্যোগ খুবই কার্যকর ছিল।

কালীনারায়ণ কাউকে কিছু দিতে চাইলে অতুলপ্রসাদের হাত দিয়েই তা' দান করাতেন— এই থেকেই অতুলপ্রসাদের মানসিকতায় উদার ভিত্তিভূমির সৃষ্টি হয়েছিল।

অতুলপ্রসাদও মাতামহের কাছেই বেশীক্ষণ সময় দিতেন—ঠাকুরদার চলন-বলন এমন কি আচার-আচরণ গভীরভাবে অনুসরণ করতেন। কালীনারায়ণ জামাতা রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর অতুলপ্রসাদ ও তার তিন বোনেদের এমনভাবে

নিজ স্নেহের নীড়ে সযতনে রেখেছিলেন যে, পিতৃবিয়োগ-বেদনায়, তথা পিতার অভাবটুকু পর্যন্ত অনুভব করার কোন সুযোগ তারা কেউ পায়নি। একটা নিবিড় আনুগত্য ঘেরা সাহচর্য, সঙ্গ, কালীনারায়ণ ও অতুলপ্রসাদের উভয়ের মধ্যে এমনভাবে গড়ে উঠেছিল যে, একের ভাবনা আর জনের হৃদয়তন্ত্রীতে বাণী জাগাত—একের আকুলতা আর জনের হৃদয়ভেদী সমর্পণ—এ দুয়েরই সমান্তরাল গতি ছুটে চলত। এমন কি গান-কাব্যালোচনা-চিত্রাঙ্কন উভয়ের দেখা ও অনুভবের ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করত।

অতুলপ্রসাদ ঠাকুরদা কালীনারায়ণ গুপ্তের হৃদয়-পদ্মে সমাসীন।

কালীনারায়ণ খাবার সময় ডেকে বলতেন, ভাই দাদু তুমি কোথায়! এসো, খাবে এসো! কালীনারায়ণ একটি কালো পাথরের থালায় ভাত খেতেন এবং খাবার পর দীর্ঘদিনের পুরনো বাড়ীর মেথরকে ডেকে সেই থালায় নিজে খেতে দিতেন এবং নিজে তা'ধুয়ে পরিষ্কার করে রাখতেন।

অতুলপ্রসাদ দ্রুত ছুটে এসে বলতেন, দাদুভাই—বীজমোহন এখনোও আসেনি!

খেতে খেতে ও ঠিক আসবে। বোসো, আমার কাছে। অতুলও দাদুর সাথে বসে আহার করছে, মেথর বীজমোহন বাড়ীতে প্রবেশ করেই বলত, আমি এসেছি—ঠাকুরদা, দাদাবাবু।

অতুলপ্রসাদ খেতে খেতে কোন দিন বীজমোহনকে বলত—বীজমোহন আমাকে এক গ্লাস জল দাও! বীজমোহন জল দিতেই কালীনারায়ণ অতুলের মাথায় বাঁ হাত রেখে পরমের কাছে প্রার্থনা জানাতো।

কালীনারায়ণ খাবার খেতে খেতে বলতেন, বীজমোহন, আজ জন্মাষ্টমীর মিছিলে যাবি—গোলাম, সফুউদ্দিন, করিমদের খবর দিয়েছি, এক সঙ্গে অতুলের কাছাকাছি থেকে কীর্তন করবি।

বীজমোহন উৎসাহিত হয়ে বলত, সেবার ঠাকুরদা, মহরমের মিছিলে তোমার গান আর নাচ তাঁতিবাজারের-নবাবপুরের-নারিন্দার সবাই খুশী হয়েছে। আমাদের মা-বৌ'রা তো অবাক! আর দাদাবাবু, কচি ডাগর ডাগর হাত দিয়ে প্রাণ ভরে চাল আঁচল ভরে দিয়ে যেতো।

খাবার পরিবেশনের কাছেই সেদিন বসেছিলেন হেমন্তশশী, তিনি বললেন, অতুলের জন্য আমার ভিক্ষার চাল সর্বসময় ভাণ্ড ভরে রাখতে হয়। অল্প দিয়ে তাঁর প্রাণ কিছুতেই তৃপ্ত হয় না।

এমনি একবার জন্মাষ্টমীর মিছিলে বিনয়মামার সঙ্গে সত্যপ্রসাদ ও অতুলপ্রসাদ অতি সাবধানে আর সকলের আড়ালে লক্ষ্মীবাজার থেকে হাঁটতে হাঁটতে বাঁশের

সাঁকো পেরিয়ে উর্দুলালাবাবুদের বাগানবাড়ী পেরিয়ে তাঁতির বাজার হয়ে নবাবপুরে হাজারো নরনারীর জমায়েতে হাজির হল। মেলা ও পথঘাটের জন-সমাগম সে এক বিরাট শোভাযাত্রা। হাতি আর ঘোড়ার নয়নআকর্ষণ করা পোশাক ও সোনার হারে সজ্জিত হয়ে রোমাঞ্চিত হত। অতুল-সত্য-বিনয় তিন জন খুব আনন্দে মসগুল হতেন।

একবার মাতামহ কালীনারায়ণ অতুলপ্রসাদ, সত্যপ্রসাদ ও বিনয়কৃষ্ণদের নিয়ে বাঙলাবাজারের প্রতাপবাবুর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে সেখানকার শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠবিহারের মাটির সুন্দর মূর্তি দেখালেন। সবাই, বিশেষ করে অতুলপ্রসাদ ভাবাবিষ্ট হয়ে মনোলোকে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার ভাব-তরঙ্গে অভিভূত হলেন। মূর্তিগুলির বিভিন্ন অবয়ব-নানা ব্যঞ্জনার আনন্দে ভরপুর। দাদু তা বুঝিয়ে ওদের মন ও ভাবনাকে অনবদ্য সুখ-আনন্দ দান করালেন।

কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে কবি, সংগীত রচয়িতা ও সঙ্গীতজ্ঞ। পুত্র-কন্যারা ও নানাগুণের অধিকারী। অতুলপ্রসাদ কৈশোর থেকেই স্বপ্নালু-কবি ও কবিত্বের অনুরণন তাঁর রক্তে দোলন দিয়ে যায়। ছবি আঁকা, ছবি দেখে তন্ময় হয়ে যাওয়া, গান আর গানের সুরের পাতায় উড়ে চলা, তবলা-বেহালার-এস্রাজের তরঙ্গ হৃদয়তন্ত্রীতে সপ্ত ধ্বনির নৃত্য বিভোর করে তুলত অতুলপ্রসাদকে। মামা গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত, অতুলপ্রসাদের পানিমামা-নাটক লেখা, অভিনয় করা, গান গাওয়া, নৃত্য পরিকল্পনা ইত্যাদিতে পটু ছিলেন। অতুলপ্রসাদ উন্মুখ হয়ে পানিমামার দিকে, তার সৃষ্টির-তরঙ্গে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে আনন্দ পেতেন। এই পানিমামার সঙ্গে ও উৎসাহে অতুলপ্রসাদ অনেক নাটকের অভিনয় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে দেখেছেন। সেসময় থেকেই অতুলপ্রসাদের মনের অত্যন্ত গোপন স্তরে আনন্দ-বেদনার উৎস সঞ্চারিত সংগীতের বীজ ধীরে ধীরে রোপণ হয়ে এসেছিল। মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্ত নিজে কবিতা-গান রচনা করতেন-তাঁর প্রেরণা অতুলপ্রসাদকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু কবিতা লেখা ত আর খুব সহজ ব্যাপার নয়। বহুবার মামারা—ঠাকুরদা এবং বন্ধুবান্ধবরা অতুলপ্রসাদকে কবিতা লেখার কথা বলত, কিন্তু ফরমাইস দিয়ে কবিতা হয় না—তা জানতেন অতুলপ্রসাদ। একটা ভেতরের প্রেরণার বাণী-বহ শব্দ সাজসজ্জায় কবিতার জন্ম হয়—এটা অতুলপ্রসাদ জানতেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বাড়ীতে উৎসব। কালীনারায়ণের বড়ছেলে স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্তের ছোট

মেয়ে তপসীর (ইলা সেন) অন্নপ্রাশন। চারিদিকে হৈ হৈ আনন্দ রব। বাড়ী ভরা লোকজন। অতুলের পড়ায় মন বসছে না। কি একটা ভাবনায় মন খুবই উদাস—আবার আনন্দ মধুরতায় পুলকিত। বার বার ছোট বোন তপসীর কথা মনে হচ্ছে—কী করা যায় ওর জন্য। বাড়ীতে উপহারের মিছিল লেগেছে সকাল থেকে। কিন্তু অতুল কি উপহার দেবে না তার ছোট বোনকে? আনন্দের মুগ্ধোচ্ছ্বাস হৃদয়ে ঢেউ তুলছে—প্রকাশের উত্তেজনায় অতুলের কবি হৃদয় অস্থির। পড়ার ঘরে একলা বসে কাগজ কলমে মন যুক্ত করলেন—দ্রুত ভাব-তরঙ্গের সকল বন্ধন যেন খুলে গেল—খস্ খস্ করে লিখে ফেললেন—দ্রুত ভেতরে ছুটে গেলেন—সত্যপ্রসাদ এবং বিনয় মামা অতুলপ্রসাদের কবিতা লেখার সময় কাছেই ছিলেন। অতুলপ্রসাদ কবিতার খাতাটি রেখেই সরে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরেই অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত লজ্জাবনত কণ্ঠে ডাকলেন, তপসী—! মা তপসী কোথায়। ওকে নিয়ে এসো। ঠাকুর্দা, তপসীর জন্য একটি গান লিখেছি—ওর জন্মদিনে ওকে উপহার দেব। অতুলপ্রসাদ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আকুতিতে বললেন। বিনয় মামা কবিতার খাতাটি এনে অতুলপ্রসাদের হাতে দিলেন।

ততক্ষণে তপসীকে সাজিয়ে হেমন্তশশী অতুলের কাছে নিয়ে এলেন। তপসীকে সামনে বসিয়ে, সদ্য প্রস্ফুটিত কাব্যকুসুম বিনয় মামা সুর করে পড়ে শোনালেন। পরে তপসীর বুকে ডান হাত রেখে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

তোমারি উদ্যানে তোমারি যতনে
উঠিল কুসুম ফুটিয়া।
এ নব কলিকা হউক সুরভি
তোমার সৌরভ লুটিয়া।
প্রাণের মাঝারে নাচিছে হরষ
সব বন্ধন টুটিয়া।
আজ মন চায়, অঞ্জলি লয়ে
ধাই তব পানে ছুটিয়া।
যে প্রিয় নামটি দিলাম শিশুরে
স্নেহের সাগর মথিয়া।
সে নামের সাথে তব পূত নাম
থাকে যেন সদা গ্রথিয়া।
হাসি দিয়া এরে কর গো পালিত
তব স্নেহ-কোলে রাখিয়া;

নয়নেতে দিও, মা গো স্নেহময়ী,
প্রেমের অঞ্জন আঁকিয়া।
যেন স্বার্থের কঠিন আঘাতে
যায় না কুসুম ঝরিয়া।
রক্ষিও নাথ, তোমার বক্ষে
সকল দুঃখ হরিয়া।
দেখ প্রভু দেখ, চালাইয়ো এরে
তুমি নিজ হাতে ধরিয়া;
মঙ্গল-পানীয় দিও তুমি দিও।
পরাণ-পাত্র ভরিয়া।
দীর্ঘায়ু হোক এ কোমল শিশু
সকলের প্রেমে বাড়িয়া;
সে জীবনে প্রভু, যেন কোথা কভু
না যায় তোমারে ছাড়িয়া।

কালীনারায়ণ আনন্দরসে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, আনন্দ ও পরম করুণাঘন পরম ব্রহ্মের সাক্ষাৎ কৃপা না হ'লে এমন 'দরদ', হৃদয় উজাড় করা গান লেখা যায় না। অতুল, দাদাভাই, কল্যাণময় তোমাকে আশীর্বাদ করবেন অনবরত।

সকলের চোখ-মুখ আনন্দের পুলকে পুলকিত; মা হেমন্তশশী কাছে এসে পুত্রের চিবুকে চুম্বন করে বললেন, পরম ব্রহ্মের প্রকাশ হোক তোমার জীবনে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ঢাকার তাঁতিবাজারের, 'নাটক', 'বাউল গান' , যাত্রাগান, কবিগান, কীর্তন এবং খেমটা নাচ প্রায়শই জমজমাট। অতুলপ্রসাদ সেই সব আসরে উপস্থিত থাকতেন— সুরের মূর্ছনা তাঁর চিত্তে গভীর ব্যঞ্জনার কর্ষণ হত অনবরত। সেই সব আসরে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের রসিকজন উপস্থিত থাকতেন। কোন ধর্মবিরোধ তেমনভাবে প্রকট হত না। মহরমের তাজিয়া—জন্মাষ্টমীর মিছিল, হোলির গানের মিছিল হিন্দু-মুসলমানের বাৎসরিক মিলনের উপায়।

অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হয়েছিলেন—তার ফলে রামপ্রসাদের যা কিছু সমাজসেবা নিম্ন জাতীয় হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যেই তা' বেশী করা হত—এবং এ'ভাবেই নিচু তলার হিন্দু ও মুসলমানদের ভালবাসা ও মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। শৈশবে তার প্রভাব

অতুলপ্রসাদের মধ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী সময়ে মুসলমান প্রীতি অভিন্ন মানসিকতায় বর্ধিত হয়েছিল অতুলপ্রসাদের চিন্তা ও মনন।

কালীনারায়ণ গুপ্তের তৃতীয় সন্তান গঙ্গাগোবিন্দ গুপ্ত—ডাক নাম পানির বিয়ে হল ব্রাহ্ম দুর্গাদাস রায়ের কন্যা বিনোদের সঙ্গে। অতুলপ্রসাদ খুবই আনন্দিত হয়েছেন। বিয়ের পর পরই পানিমামা চাকরী নিয়ে কলকাতায় চলে গেলেন, গেলেন বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ ও স্ত্রী-পুত্রকন্যাদের নিয়ে। দেখতে দেখতে লক্ষ্মীবাজারের কালীনারায়ণ গুপ্তের আনন্দের হাট খালি হয়ে গেল। হেমন্তশশী প্রায়ই অতুলপ্রসাদকে বলতেন, **অতুল তুমি ব্যারিস্টার হয়ে দেশের দশের সেবা করবে—এটা আমার ইচ্ছা। রাত্রিতে মা'র পাশে শুয়ে দুর্বল শরীর বয়ে চলা মা'কে সেবা করতে করতে অতুল মাকে ভরসা দিত—সে বড় হবে, ব্যারিস্টার হবে**। পিতার মৃত্যুর পর হেমন্তশশীই অতুলপ্রসাদের একমাত্র ভরসা—ভরসা জীবনের তরঙ্গ উত্তরণের জন্য মাতৃ-নির্দেশ পালনের। কন্যারা—হিরণ-কিরণ-প্রভা কাছে আসে—অতুলপ্রসাদের কাছে, মা'র কাছে একই শয্যায় শুয়ে থাকে। হেমন্তশশী অসুস্থ হাতে ওদের জড়িয়ে ধরে স্বামীর ধ্যান করতে করতে বলেন, তুমি আমায় সব ভার দিয়ে চলে গেলে—আমায় শক্তি দিও, ওদের যাতে মানুষ করতে পারি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

হেমন্তশশী স্বামীর মৃত্যুর পর নিজে খুবই কৃচ্ছ্রসাধন করতেন—যার ফলে প্রায়ই তিনি অসুস্থ হতেন। পুত্র-কন্যাদের চিন্তায় মানসিক যন্ত্রণাও পেতেন—ঈশ্বর-নির্ভরতার বোধে তা'থেকে মুক্তিও পেতেন। তা'সত্ত্বেও নিজের প্রতিদিনের জীবনচর্চায় হেমন্তশশী কাহাকেও বিব্রত করতেন না।

এমনিভাবেই অবশেষে হেমন্তশশী খুবই অসুস্থ হলেন। ডাক্তারের পরামর্শে হাওয়া বদলের জন্য ঢাকা ছাড়ার কথা ভাবলেন। সেই মত বড় ভাই স্যর কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বোনের চিকিৎসার জন্য তাঁর কলকাতার বাড়ীতে হেমন্তশশীকে নিয়ে গেলেন। সেই থেকে হেমন্তশশী ঢাকা ত্যাগ করে বড় ভাই কৃষ্ণগোবিন্দের বাড়ীতে, কলকাতায়।

অতুল-হিরণ-কিরণ-প্রভা ওদের বিরহে হেমন্তশশীর কান্নায় কান্নায় অসুস্থতা বেড়ে গেল—আবার ফিরে এলেন কলকাতা থেকে ঢাকায়। কিন্তু তাতে হেমন্তশশীর শরীর আরো ভেঙ্গে গেল—অসুস্থতা চরমে উঠল। বাধ্য হয়ে তাকে

কলকাতায় ফিরে যেতে হ'ল। সে এক কঠিন আর্তনাদভরা প্রস্থান—হেমন্তশশীর অন্তর-হাহাকার লক্ষ্মীবাজারের প্রতিটি স্পর্শে যেন রোদনে ভরে গেল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বাঙলার আবহাওয়া স্বদেশ-প্রেমের উন্মাদনায় চঞ্চল। গানে-সাহিত্যরচনায়, বক্তৃতায়, মিছিলে স্বদেশের কথা, স্বাধীনতার কথা আর নানা ঘটনায় উত্তেজনা। অতুলপ্রসাদ প্রায়শই দেশনেতাদের সভায় তাঁদের বক্তৃতা শুনতেন এবং পরবর্তী সময়ে নিজে হুবুহু বন্ধুবান্ধবদের সামনে বলতেন। কৈশোর থেকেই অতুলপ্রসাদের রাজনৈতিক আদর্শ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর চিন্তাধারায় সঞ্জীবিত। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের জন্য অতুলপ্রসাদ ঢাকায় গিয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথের একটি বক্তৃতা শুনতে। ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ এসে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সহিত দেখাও করেন। সুরেন্দ্রনাথও কিশোর অতুলপ্রসাদের দেশ-ভক্তি ও দেশ-সেবার প্রেরণায় মুগ্ধ হন।

অতুলপ্রসাদ ঢাকা থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন—পরীক্ষায় পর অফুরন্ত সময় ও অবসর। যখনই দেশনেতাদের আগমনবার্তা শুনতেন, অতুলপ্রসাদ ছুটে যেতেন তাঁদের বক্তৃতা শুনবার জন্য। পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, টি. পালিত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি দেশবরণ্যদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ-বিস্ময়ে আনমনা হয়ে যেতেন—নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের, দেশব্রতের রূপরেখায় আঁচড় দিতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধগুলি যা হাতের কাছে পেতেন নিবিষ্ট মনে পড়তেন।

অতুলপ্রসাদ শৈশব থেকেই তাঁর পিতা রামপ্রসাদের সঙ্গে নববিধান সভার উপাসনায় যেতেন—বাবার সঙ্গে গান গাইতেন। সেই ধারা এখনও চলে এসেছে। পিতা নেই, কিন্তু ঠাকুর্দার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও অতুলপ্রসাদ যেতেন, গান গাইতেন—উপাসনায় গভীরভাবে মনসংযোগ করতেন।

এমনি একদিন ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা শেষ করে অতুলপ্রসাদ, সত্যপ্রসাদ ও বিনয়মামার সঙ্গে বাড়ী লক্ষ্মীবাজারে এলেন।

ঘরে ঢুকতেই অতুলপ্রসাদ অনুভব করলেন—বাড়ী নিশ্চুপ-অসাড়-ভয়ার্ত পরিবেশ—কোথাও প্রাণের কোলাহল পর্যন্ত নেই—চেয়ে দেখলেন এবং উৎকণ্ঠায় চিৎকার করে বললেন—

...কী ব্যাপার! বাড়ীতে কে কোথায় আছ? কেউ কথা বলছ না কেন, কী হয়েছে তোমাদের—কেন এমন বিহুল নীরবতা? কী হয়েছে—তোমরা কাঁদছ

কেন? হিরণ—কিরণ ও প্রভা কাঁদছিস্ কেন? কী হয়েছে—'মাসি, তুমিও কথা কইছ না কেন? কেন , কেন কাঁদছ—দিদা, তুমি কাঁদছ কেন? আমায় বল কী হয়েছে, কোন খারাপ খবর কিনা? কী বল, বল, এই বলে দিদার হাত দুটো সজোরে নাড়া দিলে দিদার হাত থেকে এক টুকরো চিঠি মাটিতে পড়ে গেল—। চিঠিটা লিখেছেন বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত। চিঠিটি কুড়িয়ে অতুলপ্রসাদ নয়নার্দ্র উৎকণ্ঠায় পাঠ করলেন; তার পর পরই চিঠিটি সজোরে ডান হাতের মুষ্টিবদ্ধ করে দ্রুত স্থান পরিত্যাগ করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে চিৎকার করে বেদনায় কেঁদে কেঁদে বলছেন,

—মা—একি করলে! মা গো, আমার মা—আমরা এখন কোথায় যাবো—! আমার কত স্বপ্ন কত কল্পনা, কত নির্ভয়-নির্ভরতা তোমাকে ঘিরে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত তিলে তিলে গড়েছি—আজ হঠাৎ আমার সব স্বপ্নের আকাশটা বিকট শব্দে মাথার উপর ভেঙ্গে পড়ল গো, মা আজ আমি অসহায়, হতাশার অন্ধকারে তলিয়ে গেলাম—মা গো, কেন এমন হলো!

ঘরের ছোট্ট শয্যায় শুয়ে মুখ বালিশের মধ্যে লুকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত-অবসন্ন। চোখ বুজে বিবশ ব্যাকুলতায় ছিন্ন-ভিন্ন আকুতিতে নানা ভাবনায় বেদনাতুর অতুলপ্রসাদ ঘরের দেয়ালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ফটো সংলগ্ন প্রয়াত পিতা রামপ্রসাদ সেনের তৈলচিত্র দেখামাত্র শয্যা ত্যাগ করে সটান উঠে দাঁড়িয়ে অপলক নয়নার্দ্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। ক্ষণিকের মধ্যে পিতার কণ্ঠস্বরে কে যেন বলল,

অতুল, তোমার মাকে ভুল বুঝ না! আমিই তোমার মাকে বলেছিলাম, আমার অবর্তমানে তুমি প্রয়োজনবোধে পুনরায় বিবাহ করো—বিধবা বিবাহ অন্যায় নয়।

—না, না, তা' হয় না—কে তুমি, চুপ কর, স্তব্ধ হও—মা গো, আমার পরম আশ্রয় আমার একান্ত-নির্ভর। আমি যে আজ সব হারালাম—সব হারালাম! অতুলপ্রসাদ উচ্চস্বরে কেঁদে কেঁদে আবার শয্যায় লুটিয়ে পড়ল।

—দাদা, দাদা, দোর খোলো। এখন তুমিই আমাদের ভরসা দাদা, দোর খোলো—হিরণ দরজায় আঘাত করে কাঁদতে কাঁদতে বলল। কিরণ ও প্রভা আর্তনাদ করে চলল, দোর খোলো দাদা—আমাদের কাছে টেনে নেও দাদা! বলে, সজোরে কাঁদতে লাগল।

ঠাকুরদা কালীনারায়ণ অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বন্ধ দরজায় মুখখানা রেখে নরম গলায় বললেন, দাদু ভাই, আমি,—দোর খোলো। ভেঙ্গে পড়লে চলবে না—তা' ছাড়া তোমার মা তো কোন অন্যায় কিছু করেননি—পরম করুণাময়ের কল্যাণে ও ইচ্ছায় সব ঘটছে—বৃথা আর্তনাদ করছ—দোর খোলো।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের জ্যেঠামশাই দুর্গামোহন দাশের সঙ্গে বিধবা হেমন্তশশীর বিবাহ হয়। দুর্গামোহন দাশ ব্রাহ্মসমাজের নেতা, ধনী। হেমন্তশশীর এক বোন বিমলার সঙ্গে দুর্গামোহন দাশের এক পুত্রের বিবাহ হয়। সেইসূত্রে দুর্গামোহন দাশের কালীনারায়ণ গুপ্তের বাড়ীতে আসা-যাওয়া। কলকাতায় হেমন্তশশী বড় ভাইয়ের কাছে থাকার সময় দুর্গামোহন দাশ খবরাখবর রাখতেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই কলকাতা থেকে মা হেমন্তশশীর একটি পত্র এল পুত্র অতুলপ্রসাদের কাছে।

—অতুল, বোনদের নিয়ে কলকাতায় চলে এস—।

অভিমানে বিধ্বস্ত অতুলপ্রসাদ। দিদিমার কাছে গিয়ে বলল, দিদা, মা'র পত্র এসেছে—লিখেছে আমি যেন বোনদের নিয়ে কলকাতায় চলে আসি—বোনদের নিয়ে কলকাতায় চলে যাই।

সত্যপ্রসাদ আশ্রয়হীন হয়ে গেলেন। অতুলপ্রসাদের মামাবাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিঁড়ে গেল। যেন একটা শোক-প্রবাহ অতুলপ্রসাদ ও সত্যপ্রসাদকে ঘিরে ফেলল। ছোটবোনরা সবাই কেমন যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরছে। অতুলপ্রসাদের কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে অনুনয় সুরে বলছে, দাদা আমরা মায়ের কাছে যাব—অনেকদিন মাকে দেখিনি—মার কাছে চল। ভারাক্রান্ত শোক ও বেদনার প্রতিটি আঁচড় অতুলপ্রসাদের চোখে মুখে—'বোনদের শান্ত করে বলল, যাব, যাব—তোমাদের মা'র কাছে দিয়ে আমি অন্য কোথাও চলে যাব—মা নেই— মা, এ কি করলে মা!

...এই ঢাকা, লক্ষ্মীবাজার আমার আনন্দ-নিকেতন, কুসুমনীড়। এর প্রতি ধূলি-কণায় আমার জীবনের ভাল-মন্দ-আনন্দ-বিরহ; একে ছেড়ে যেতে হবে! যেতে হবেই—আমাকে বড় হতে হবে। আমি বিলেতে যাব—ব্যারিস্টার হব—। মাসি (সুবালা), আমি কলকাতায় যাব—হিরণ-কিরণ-প্রভাকে সাথে করে কলকাতায় যাব—দরকার হয়তো কারো চাকর হয়েও বিলেতে যাব। অতুলপ্রসাদ বললেন।

সুবালা মাসি অতুলের কাছে এসে আন্তরিক দরদে বললেন,—অতুল কলকাতায় দিদির কাছে বোনদের রেখে তুই কোথায় যাবি? বড়মামার ঠিকানাটা আমি তোকে দেব,—দরকার হয়তো সেখানে থাক্‌বি। তুই অন্য কোথাও থাকলে তোর মার কষ্ট হবে। অভিমান ছেড়ে মা'র কাছে কিছুদিন থাক। জামাইবাবু দুর্গামোহন দাশ খুবই সজ্জন, খুবই সচেতন সংবেদনশীল। তোকে ভালভাবেই আপন করে নেবেন। আমাদের খুবই পরিচিত— দিদির সাথে আগেও যোগাযোগ ছিল। তোর কোন অসুবিধাই হবে না। অভিমান ছাড়! অতুল।

অতুলপ্রসাদ নীরবে দাঁড়িয়ে মাসির কথাগুলি শুনছিল। পাশে দাঁড়িয়ে বোনেরা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কলকাতায়।

অতুলপ্রসাদ, তিন বোন—হিরণ, কিরণ ও প্রভাকে সঙ্গে করে দুর্গামোহন দাশের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে দ্রুত সেখান থেকে চলে গেলেন। অভিমানে ক্ষত-বিক্ষত অতুলপ্রসাদ মা'র সঙ্গে দেখা পর্যন্ত করলেন না। অতুলপ্রসাদ কলকাতায় সেজ মামা'র বাড়ীতে। পরে বড় মামা'র বাড়ী গেলেন। বড়মামা কৃষ্ণগোবিন্দ অতুলপ্রসাদকে নিজের ঘরে এনে ডেকে বললেন, ...অতুল, তুই আসবি আমি জানতুম। খুবই খুশী হয়েছি রে। মা'র সঙ্গে দেখা না করাটা ঠিক হয়নি। ভুল বোঝাবুঝির মামলা তুই জিইয়ে রাখলি কেন? যা'হোক মন্দের ভালো তুই এখানে এসেছিস—এখান থেকেই তোর পড়াশুনার ব্যবস্থা করতে হবে।

অতুলপ্রসাদের চেতনা ফিরে এল। মামার স্নেহ ও সম্ভাষণ এক নিমেষে জগৎ সম্পর্কে সকল বিতৃষ্ণা যেন ধুয়ে মুছে গেল। বুঝতে পারল পৃথিবীতে সে একা নয়—এবার নূতনভাবে হৃদয়ের দরজা খুলে অগ্রসর হতে হবে। সহজ ও স্বাভাবিকতা অতুলপ্রসাদের মানসিকতাকে যেন আবার উচ্ছল করে তুলল—মামাতো বোনদের আদর ও কথাবার্তা এবং সম্ভাষণ 'ভাইদাদা' অতুলপ্রসাদের চোখের সামনে থেকে সকল আবরণ যেন সরে গেল। বড় মামার তদ্বিরে অতুলপ্রসাদ প্রেসিডেন্সীতে ভর্তি হলেন।

... আমাকে ভালভাবে এ কলেজ থেকে পাশ করতেই হবে। ব্যারিস্টারী পড়ার জন্য বিলেতে যেতেই হবে—অতুলপ্রসাদ স্থির প্রতিজ্ঞা করলেন। প্রেসিডেন্সী কলেজের সহপাঠী চিত্তরঞ্জন দাশ, বিহারীলাল মিত্র এবং ব্রজেন্দ্রনাথ মিত্র।

কলেজের ক্লাসের শেষে একদিন চিত্তরঞ্জন অতুলপ্রসাদকে একান্তে নিয়ে গিয়ে বললেন, অতুল, তুমি আমার ভাই। আমার জ্যেঠুই দুর্গামোহন দাশ। তোমার কথা জেঠু প্রায়ই খোঁজ নেন আমার কাছে। তুমি চলে এসো আমাদের জেঠুর কাছে—দেখবে কত বই আর বই। তা'ছাড়া জেঠু খুব অমায়িক শান্ত এবং পবিত্র চিত্তের সহজ সরল মানুষ। তোমার নিশ্চয় ভাল লাগবে। আমার বড়মা, মানে তোমার মাও, আমাদের একান্ত আপনজন—আমাদের সকলের শ্রদ্ধেয়া পরমাত্মীয়া।

বন্ধু বিহারীলাল মিত্রও অতুলপ্রসাদকে বললেন, মা'র সঙ্গে দেখা না করাটা তোমার উচিত কাজ হয়নি অতুল! তিনি যে তোমার মা—গর্ভজননী—সকল অভিমান ত্যাগ করে মা'র কাছে গিয়ে লুটিয়ে পড় অতুল।

অতুলপ্রসাদ আপন মনে বলে উঠলেন, আমার মা—আমার মা!

যাবো—মা'র কাছে যাবো! কিন্তু? কিন্তু নেই, আর কিন্তুর বাঁধনে নিজেকে নিঃশেষ করিস নে অতুল, নিজের মধ্যেই অতুলপ্রসাদ বললেন।

এদিকে দুর্গামোহন দাশ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য তাকে তার মায়ের কাছে নিয়ে যাবার জন্য প্রায়ই পানিমামার বাড়ী আসতেন। তিনি অতুলপ্রসাদকে বললেন, চল অতুল, তোমার মার কাছে চল। তোমার মা খুবই ক্লান্ত, অসুস্থ। তোমাকে কাছে পেলে তিনি খুশি হবেন। আমার সঙ্গে তুমি চল।

অতুলপ্রসাদ সেদিন তার অভিমানের কারাগার থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারলেন না। ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই বলে, ...মাকে জানিয়ে দেবেন, আমার কোন ভালবাসা তাঁর জন্য নেই। আমার বোনেদের নিয়েই তিনি যেন থাকেন—আমার কথা যেন এতটুকু মনে না রাখেন।

দুর্গামোহনবাবু সেদিন বেদনাবিদ্ধ হয়েছিলেন—কিন্তু ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হননি। অতুলপ্রসাদকে স্পর্শ করেই অত্যন্ত আন্তরিক পিতৃত্বের প্রচ্ছন্ন আকুলতায় পুনরায় বলেছিলেন, ...রাগ তুমি করতে পার অতুল। কিন্তু আমি তোমাকে নিতেই এসেছি— তোমার মা'র জন্য। তাঁর সেবায় তুমি তাঁর কাছে কাছে থাকলে তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন—চল, অতুল আমার সঙ্গে চল।

অতুলপ্রসাদের চোখদুটো জলে ভেসে গেল। অস্ফুটস্বরে মা—আমার সুন্দরী মা... কতদিন তোমায় দেখিনি।

মা'র জন্য অতুলপ্রসাদের মন-প্রাণ আঁকুপাঁকু করত সকল সময়ে—মাতৃচরণে সমর্পণের ব্যাকুলতা গভীরভাবে অনুভব করতেন, কাতর হতেন—তবুও অভিমান-সঞ্জাত অদৃশ্য যন্ত্রণা তাঁর চিত্তকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রাখল—এমনি মানসিক অবস্থায় অতুলপ্রসাদ 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র উপাসনায় একদিন উপস্থিত ছিলেন—উপাসনায় অতুলপ্রসাদ মা'কে দেখতে পেলেন—চকিতে হেমন্তশশী দেখলেন; কিন্তু উভয়ের কেউ কাছে এসে একাকার হতে পারলেন না—উভয়ের নয়ন সিক্ত—অপার মিলন-আকাঙ্খায় উন্মুখ—কিন্তু কোথায় যেন বাধা! হেমন্তশশী এগিয়ে যেতে চায়। অতুলপ্রসাদ দূরে সরে অদৃশ্য হতে চায়—স্নেহ-আকর্ষণের লুকোচুরিতে উভয়েই হারিয়ে যায়; আবার নিঃসঙ্গ বেদনায় নিজেদের মধ্যে উভয়ে ছট্‌ফট্ করতে থাকেন।

অতুলপ্রসাদের অন্তর শূন্যতার পরিমন্ডলে মাতৃহারা বেদনায় ছট্‌ফট্ করছে—এমনি সময়ে মামাতো বোন হেমকুসুমের কোমল স্পর্শ যেন নূতন প্রাণের স্পন্দন দিল। হেম তখন কিশোরী, কিন্তু শরীরের ভাষা ও চাল-চলনে অতুলপ্রসাদের চিত্তে

রোমাঞ্চ জাগিয়েছিল গভীরভাবে। যখন অতুলপ্রসাদ নিঃসঙ্গতার সঙ্গে বলতেন, আমার কিছু ভাল লাগে না, আমি বাবার কথা ভুলতে পারছি, মাকে ভালবাসতে পারছি না—দুর্গামোহনকে শ্রদ্ধা করতে পারছি না—বোনদের ভাল লাগছে না—তোমাদের কাছেও যেতে—কথা বলতে উৎসাহ পাই না—আমার কিচ্ছু হবার নয়—আমি শেষ হয়ে যাচ্ছি—এমনি মানসিক অবস্থায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় অতুলপ্রসাদের হৃদয়ে সেই মায়াঘেরা নির্ভর-আকাংখার তড়িৎ প্রবাহে হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের হাত ধরে তুলে ধরে অতি কাছে, অত্যন্ত সান্নিধ্যে মুখখানি উঁচু করে বলল—অবশ হলে চলবে না—তোমাকে বড় হতে হবে—সব ঠিক হয়ে যাবে অতুলদা।

এদিকে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলেতে যাবার ব্যবস্থা প্রায় পাকাপাকি করে ফেলেছেন বড় মামা এবং দুর্গামোহন বাবু।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

প্রায়ই বড় মামার ছাদে একাকী পায়চারী করতে করতে অতুলপ্রসাদ বিড় বিড় করে হাত-নেড়ে কিছু বলছে।

সুবালা মাসি বললেন, কি বলছ অতুল?

অতুলপ্রসাদের চমক ভাঙ্গল—বলল, কিছু না, এক জায়গায় কিছু বলবার জন্য ছাত্রবন্ধুরা ধরেছে। তাই যা বলব তাই অভ্যাস করছি।

... মা'র সাথে দেখা হয়েছে, কথা বললি না কেন? এটা তোর ঠিক হয়নি। 'দিদির কি অবস্থা হচ্ছে তা' তুই বুঝলিনি অতুল!' সুবালা মাসি বললেন।

—আমারও যে খুব কষ্ট হচ্ছে মাসি; আমার ভেতরটা যেন মা'র জন্য কেঁদে কেঁদে প্রায় শুকিয়ে যেতে বসেছে—আমি আর পারছি না। এমন করে আমায় ঈশ্বর কেন কষ্ট দিচ্ছেন! অতুলপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন।

—চল অতুল, আমার সঙ্গে চল। মেজদা, আমি আর তুই যাই দিদির কাছে। তোর বিলেত যাবার খবরটাও দিয়ে আসব। সুবালা মাসি কাছে এসে অতুলপ্রসাদকে বললেন।

... না মাসি—বিলেত যাবার খবর দিও না। মেজমামা আমার যাবার সবরকম চেষ্টা করছেন, এখনো পাকা হয়নি। তাই ব্যাপারটা জানাজানি না হওয়াই ভাল।...

... খবরটা পাকাই। দিনক্ষণ প্রায় ঠিক হয়ে গেছে। চল—তোর মা'কে খবরটা দিয়ে আসবি, আর সকল বাঁধ ভেঙ্গে বিলেতে যাবার আগে মা'র আশীর্বাদ নিবি। সবাই জানে তুই বিলেত যাচ্ছিস। নিশ্চয় দিদিও এর মধ্যে জেনে গেছেন। আর

দেরী করিস নি—তা'হলে দিদির মন আরো ভেঙ্গে যাবে। সুবালা মাসি বলেছিলেন।

অতুলপ্রসাদ মাথা নিচু করে বললেন, মাতৃ প্রণাম না করে কোথাও যাবো না। আমি যাবো, আমি যাবো মা'র কাছে।

সেদিনই অতুলপ্রসাদ মা হেমন্তশশীর সাথে দেখা করতে গেলেন—দীর্ঘ দিন পর।

অতুল এসেছে শুনতে পেয়ে হেমন্তশশী— অতুল, অতুল আয়—অতুল, আমায় ভুল বুঝিস নি অতুল। এই বলে, সর্বাঙ্গ দিয়ে অতুলকে জড়িয়ে নিলেন—কিছুক্ষণ দু'জনে কান্নায় কান্নায় সকল ক্লেদ ধুয়ে মুছে দিয়ে চিবুকে আদর করতে করতে বললেন—আমি শুনেছি, আমি সব শুনেছি, আমার অতুল বিলেতে যাচ্ছে—আমার অতুল—!

মার বুকে মুখ রেখে অতুলপ্রসাদ ভারি গলায় বললেন, ...আমি বিলেত যাচ্ছি, এবারে ব্যারিস্টার হয়ে ফিরে আসব। তারপর মুখ তুলে মা'র দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বোনেরা—হিরণ-কিরণ-প্রভা কোথায়?

ওরা পড়তে গেছে। হেমন্তশশী তারপর অতুলকে আবার বুকে টেনে নিয়ে বললেন, ...'কত রাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শোনার সময় আমি বলেছি—অতুল, বড় হয়ে তুমি কি হবে বাবা, তুই দৃঢ়কণ্ঠে বলেছিলি—আমি বড় হয়ে ব্যারিস্টার হব—আজ তোর সেই স্বপ্ন সফল হতে চলেছে।' জোড়া হাত দিয়ে অতুলপ্রসাদের মুখটি আবৃত করে, ...আমার অতুল আজ বড় হয়ে বিলেতে যাচ্ছে।

অতুলপ্রসাদ মা'কে প্রণাম করে চলে গেলেন। অতুলের চলে যাবার পর রিক্তবক্ষে হেমন্তশশী কিছুক্ষণ উদাস হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

স্বামী দুর্গামোহন দাশ ঘরে প্রবেশ করে হেমন্তশশীকে আনমনা অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলেন—

কী হয়েছে—শরীর খারাপ কি?

... না—ঠিক আছি। আজ অতুল এসেছিল—কথাটা শেষ না হতেই দুর্গামোহন বললেন, ...অতুল এসেছিল! তারপর, তারপর কথা হয়েছে—কখন এল, কখন গেল।

... অতুল বিলেতে যাচ্ছে—ব্যারিস্টারী পড়তে—দাদারা ব্যবস্থা করে দিয়েছে—তুমিও একটু খোঁজ খবর নাও, যাতে বিলেতে আমার অতুলের কোন কষ্ট-অসুবিধা না হয়। হেমন্তশশী ব্যাকুল হয়ে বললেন।

দুর্গামোহন দাশ আনন্দ উজ্জ্বল সোৎসাহে বললেন, নিশ্চয়; আমি সব খোঁজ

খবর নিচ্ছি—তোমার চিন্তা করতে হবে না। আমি যথাসাধ্য ব্যবস্থা করছি যাতে অর্থকষ্ট না হয়। অতুলের জন্য সব করব। ও যে আমাদেরও ছেলে। বড় অভিমানী—তা' হতেই পারে—আমার আজ খুব ভাল লাগছে—একটা অপরাধী মানসিকতা আমার সকল চিন্তায়—কাজে এতদিন আচ্ছন্ন হয়েছিল। কল্যাণময়ের সীমাহীন করুণায় চারদিক থেকে সহমর্মিতার, সম-প্রাণের আরাম আসবে। তোমার অতুল, আমারও অতুল। তুমি যা বলবে তাই হবে।

দুর্গামোহন দাশ অতুলপ্রসাদের বিলেতে যাবার প্যাসেজ মানি নিজেই ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। প্রথম প্রথম দুর্গামোহনের দেওয়া প্যাসেজ গ্রহণ করতে অতুলপ্রসাদের দ্বিধা সংকোচ তথা মানসিকতায় আটকালো।

অতুলপ্রসাদ মা হেমন্তশশীর কাছে গিয়েছিল, মাকে কাতর অথচ অভিমানসিক্ত কণ্ঠে ঐ প্যাসেজ গ্রহণ করা ওর পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়েছিল। সেদিন হেমন্তশশী নীরবে অতুলের দিকে তাকিয়ে অসহায়ের মত কেঁদেছিলেন—কিচ্ছু বলতে পারেননি।

অতুলপ্রসাদ মায়ের কান্নায় খুবই বিহ্বল হলেন। হঠাৎ আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিল, মা তুমি কাঁদছ! আমি বিলেত যাব না। হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে দু'হাতে কাছে টেনে বুকের নিভৃত স্থানে জড়িয়ে বলল, অতুল—তা হয় না বাবা—তুমি বিলেতে যাবে, ব্যারিস্টার হবে, দেশ ও দশের মুখ গর্বে উদ্‌ভাসিত হবে—আমরা এবং তোমার স্বর্গতঃ পিতাও খুশী হবেন।

দুর্গামোহন দাশের টাকা গ্রহণ করার ব্যাপারে অতুলপ্রসাদের অন্তরে যে ঝড় উঠেছিল তা হেমন্তশশী অসহায়ের মত সহ্য করেছিলেন—কিন্তু অতুলের ভবিষ্যৎ জীবনের 'ব্যারিস্টার' হবার দুর্বার প্রবৃত্তিকে দমন করা কোনভাবেই সম্ভব নয়—তাই বার বার তিনি পুত্রের মানসিক অনীহায় কেঁদেছেন—এই কান্না অতুলপ্রসাদকে ভাবিয়েছে—'মা' যাতে কষ্ট না পান সেদিকে তাঁর ছিল গভীর বোধ। তাই 'মা'র জন্যই দুর্গামোহন দাশের টাকা গ্রহণ করেছিল—বিলেতের জন্য শীতের পোষাক যা দুর্গামোহন দাশের তত্ত্বাবধানে কেনা হল—সবটাই অতুলপ্রসাদ গ্রহণ করলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৮৯০ সাল। অতুলপ্রসাদ বেদনা-কাতরহৃদয়ে স্বদেশ-মাতৃভূমি-মা, একান্ত আপনজনদের ছেড়ে বহুদূরে দেশের কূল পেরিয়ে বিলেতে রওনা হলেন জাহাজে করে।

জেটিতে বিদায় জানাতে দুর্গামোহন দাশ, হেমন্তশশী, হিরণ-কিরণ-প্রভা,

কৃষ্ণগোবিন্দ, মেজমামা-মামাতো বোনেরা সবাই উপস্থিত। কারু কোন কথা নেই—প্রত্যেকের চোখ আর্তিতে সিক্ত। জল পড়ছে না পাছে 'ভাইদা'-র অমঙ্গল হয়।

দুর্গামোহন এগিয়ে গিয়ে কিছু বলার উদ্যোগ নিতেই অতুলপ্রসাদ ছুটে এসে পায়ে মাথা নত করে কাঁদতে লাগলেন। হেমন্তশশী ছুটে এসে প্রাণাধিক প্রিয় অতুলকে তুলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে শুধু বলল, 'অতুল, তোর পথ চেয়ে রইলুম।'

... করুণাঘন তোমার কল্যাণ করবেন—কোন অসুবিধা হলে আমাকে দ্রুত জানাবে, বিলেতে তোমার সব ব্যবস্থা করা আছে। কোন ভয় নেই। পরম ব্রহ্মের শরণ নিও। দুর্গামোহন ধীরে ধীরে বললেন।

ধীরে ধীরে জাহাজ কূলের মায়া কাটিয়ে ভেসে চলেছে, চলেছে। 'মা' ও 'মাতৃভূমি'র নিবিড় যোগোযোগ আস্তে আস্তে দোল খেতে খেতে অকূলে একাকার হয়ে ভেসে চলল—শুধু জল, আর জল। চোখের জল আস্তে আস্তে সাগরের হাতছানিতে মিশে গেল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অতুল তার নির্দিষ্ট স্থানে যাবার পথে সোল্লাসে ও বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল—এই জ্ঞান, জ্ঞান, তুই জ্ঞান রায় না'!

জ্ঞান রায়—অতুলপ্রসাদের বাল্যবন্ধু, একই বিদ্যালয়ের ছাত্র।

... অতুল! তুই কোথা থেকে? কী মজা—! ভাবতেই পারছি না আমি—তুই, এটা সত্যি তো। জ্ঞান রায় বিস্ময়ানন্দে বললেন।

... বিলেতে যাচ্ছি, ব্যারিস্টারি পড়তে। তুই, কী ব্যাপার! অতুলপ্রসাদও খুশীর আনন্দে বললেন।

জ্ঞান রায় খুব প্রত্যয় সহকারে বললেন, ...আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে। তোর সেই শৈশবের স্বপ্ন তা হ'লে সার্থক হতে চলেছে? (একটু পরে) অতুল, অনেকদিন রবি ঠাকুরের কবিতা শুনিনি। সেই ঢাকায় যে বাগানের নিভৃত ছায়াঘেরা ছোট্ট বৈঠকে আমরা মিলিত হতাম—হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কবিতা আর রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতাম—সে'সব দিনগুলি কোথায় যেন হারিয়ে গেল, তাই না'রে অতুল! একটা দিনের কথা আমার খুব মনে আছে। আমরা সবাই তর্ক করতাম শ্রেষ্ঠ কবি মধুসূদন-হেম-নবীন। আর তুই বলতি, রবীন্দ্রনাথ। আমরা তা মানতাম না, আমরা গাইতাম 'ভারত-ভিক্ষার' ছন্দবদ্ধ গান আর তুই উদাত্ত সুরে গাইলি—"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের প্রাণ জুড়াক"—আজও আমার মনে আছে। তর্কে তুই জিতে যেতিস্। আজ আমাদের এই জাহাজে সেই গানটি একবার শুনিয়ে দে অতুল।

অতুলপ্রসাদ ঃ আজ বড়ই ক্লান্ত জ্ঞান, বেশ কিছুদিন তো এই জাহাজেই আমাদের থাকতে হবে। সময় বুঝে নিশ্চয় আমি গাইব, অন্য আরো গান।

জাহাজ ভেসে চলেছে—সমুদ্রের অতল থেকে প্রাণের সংবাদ নিয়ে যাত্রীদের অভ্যর্থনা জানাচ্ছে অনবরত। জ্ঞান রায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তার বন্ধু জ্যোতিষ দাশ আর নলিন গুপ্তদের। গানের আসর—অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগতজনের প্রাণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্
মুখ তুলে আজি চাহরে..."

গানটি শেষ না হতেই সাদা চামড়ার কয়েকটি শাসকশ্রেণীর কর্তাব্যক্তিরা এক সঙ্গে ছুটে এসেই গান বন্ধ করতে বলল এবং অসভ্য আচরণ ক'রল ভারতীয় যাত্রীদের প্রতি।

অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত ক্ষুব্ধভাবে তাদের আচরণের প্রতিবাদ জানালো—সাথে সাথে জাহাজের অন্য ভারতীয়রা একত্রিত হয়ে অসভ্য আচরণকারীদের বাধা দিল।

জাহাজ চলেছে অসীম থেকে আরো অসীমে—অনবিল বাঁধনহীন গতির ছন্দময়তায় অতুলপ্রসাদের হৃদয় বীণায় তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে—বিচিত্র তান-লয়ে ভাবের লুকোচুরি মাতিয়ে তুলছে অস্ফুট কলতান, আঁকুপাঁকু করছে ভাষায় রূপ পেতে। এমনি তন্ময়তায় ভূমধ্যসাগরে জাহাজ ভেসে ভেসে শব্দময় হয়ে উঠছে ইতালির ভেনিস নগরের গণ্ডোলা চালকদের গানের সুরে আর তরঙ্গের নৃত্যরসে। অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ-মনে ও প্রাণে 'সেই সুর' সযত্নে ধরে রাখলেন।

অবশেষে স্বপ্নের দেশ লন্ডনের কিংস ডকে জাহাজ থামল। অতুলপ্রসাদ জাহাজ থেকে নেমে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইলেন, অনন্ত সমুদ্র আর উদার নীল আকাশ অতুলপ্রসাদের হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দিল।

অতুলপ্রসাদের ব্যারিস্টারী পড়া শুরু হ'ল মিড্‌ল টেম্পল-এ। বৃটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়তে পড়তে নিজেকে বিস্ময়-বিমুগ্ধতায় হারিয়ে ফেলেন।

বিলেতে অতুলপ্রসাদ ফিরে পেলেন চিত্তরঞ্জন দাশকে। আলাপ হ'ল অরবিন্দ ঘোষ, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতিদের সাথে। মনমোহন ঘোষের মাধ্যমে অতুলপ্রসাদ মহম্মদ আলি জিন্নার সাথেও পরিচিত হলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ বিদেশে, ভারতীয়দের প্রতি বৃটিশদের অভদ্র আচরণ এবং তার

প্রতিবাদ জানাবার জন্য প্রথমবার আই. সি. এস. পাশ করতে পারেননি। অন্যায়ের প্রতিবাদে ভারতীয় ছাত্রদের সমর্থন পেলেন। জেমস্ ম্যাকলীন কর্তৃক ভারতীয় মুসলমানদের 'দাস' এবং হিন্দুদের 'চুক্তিবদ্ধ দাস' উক্তির তীব্র প্রতিবাদ জানান চিত্তরঞ্জন এবং অবশেষে জেমস ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচনে সদস্য দাদাভাই নৌরোজীকে নির্বাচিত করার জন্য চিত্তরঞ্জন সমর্থন জানালেন।

অরবিন্দ ঘোষ, ঠিক করেছিলেন আই. সি. এস. পরীক্ষার দিন পরীক্ষা দিতে যাবেন না, কিন্তু পরীক্ষার দিন অতুলপ্রসাদ-চিত্তরঞ্জন-মনমোহন ঘোষ এবং সরোজিনী নাইডু এই চারজন জোর করে পরীক্ষা হলে অরবিন্দকে পৌঁছে দিলেন। আসলে অরবিন্দ আই. সি. এস. পাশ করে কারো গোলামী করতে রাজী নন—তাই ঘোড়ায় চড়া হ'ল না।

লন্ডনে থাকাকালে অরবিন্দের অন্তরে দেশপ্রেমের বীজ আস্তে আস্তে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে গোপনে উপ্ত হয়। পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ মাঝে মধ্যে লম্বা চিঠিতে দেশের মানুষদের উপর ইংরেজ শাসকদের অত্যাচারের কথা এবং 'বেঙ্গলী' কাগজের কাটিং নিয়মিত পুত্র অরবিন্দকে পাঠাতেন। অরবিন্দের কল্পনাশক্তি ছিল অসাধারণ। দাদাভাই নৌরোজীর নির্বাচন, আমেরিকার স্বাধীনতার সংগ্রামের কাহিনী, সব মিলিয়ে অরবিন্দের চেতনার পদ্ম ধীরে ধীরে ফুটতে লাগল। লন্ডনের 'ভারতীয় মজলিশে' নিয়মিত যোগদান করে অরবিন্দ ভারতবাসীর দুঃখ দুর্দশার কথা উল্লেখ করে উত্তপ্ত বক্তৃতা দিতেন।

অতুলপ্রসাদ স্বদেশ ছেড়ে বিলেতে এসে অনুভব করলেন দেশের জন্য সবার মন উদাস। শাসকের যে কোন স্বদেশ বিরোধী মনোভাবে ভারতবর্ষের এ সকল দামাল ছেলে-মেয়েদের মন-প্রাণ গর্জে উঠত—তা স্বদেশ বা বিদেশ যেখানেই থাকুক না কেন! কিন্তু আবার এও গভীর সত্য এই যে, স্বদেশের তথা বাঙলা সাহিত্য, বাঙলার গ্রাম তার সংস্কৃতির হাতছানি এক মধুর-অথচ বিবশ প্রাণে বার বার আঘাত হানত, তা-থেকে নিজেদের প্রাণকে স্বদেশভূমির দিকে আকর্ষণ করার জন্য বিদেশেই সাহিত্য-চর্চা, সংগীত-চর্চার আয়োজন করেছিলেন ওঁরা। বিলেতের নাম করা সাহিত্যিক এডমন্ড গসের উৎসাহে ও উপস্থিতিতে 'স্টাডি সার্কেল' করা হল—এই 'স্টাডি সার্কেলে' সরোজিনী নাইডু, মনমোহন ঘোষ স্বরচিত কবিতা পাঠ করতেন, গান গাইতেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। অতুলপ্রসাদ এমনি এক সন্ধ্যায় বিলেতে আসার পথে ভাসমান জাহাজের গতিতে ছেড়ে আসা স্বদেশের আর্তিতে ভরপুর অনুভবে এবং ভূমধ্যসাগরের সেই 'ভেনিস নগরের'' গন্ডোলা চালকদের সম্মিলিত সুরে সুরায়িত হয়ে রচনা করেছিলেন, তার অংশ বিশেষ একদিন নিজেই গাইলেনঃ

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ' আদি-জগত-জনপূজ্যা
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কত সজ্জা।
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে। ...."

এক ধ্যান-মন্ত্রোজ্জ্বল স্নিগ্ধ আরাধনায় মাতৃ-বন্দনা, স্বদেশপ্রেমের ভাবগম্ভীর ব্যাকুলতা পরিবেশন করলেন, যা উপস্থিত পূজারীগণ পরম বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য অনাড়ম্বর শুচি-শুদ্ধ প্রাণের অঞ্জলী দান করে তৃপ্ত।

অরবিন্দ ঘোষ বাঙলা তেমন জানতেন না—কিন্তু ভাষার ও সুরের ধ্বনির তরঙ্গ এমনভাবে তাঁর হৃদয়ে ঢেউ তুলেছিল যার প্রভাবে তাঁর অন্তরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হ'ল। গানটি শুনতে শুনতে অজানা ভাব-তন্ময়তায় বাইরেও উদার-উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের অপ্রত্যাশিত রূপরেখাটি দেখতে পেলেন—স্বতোৎসারিত আবেগে চোখদুটি জলে ভরে গেল আর সেই জলেই মায়ের চরণ ধুয়ে বাঁধনহারা আনন্দ ধারায় ভরপুর। সরোজিনী নাইডু a placid and sweet expression এমন করে মাতৃভূমি ও মা-এর জন্য এর আগে অনুভব করিনি বলে অভিমত প্রকাশ করে আনন্দ স্নিগ্ধ তন্ময়তায় আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করলেন।

১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের চিকাগো শহরে ধর্ম মহাসভা সম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দের অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা এবং সে বিষয়ে নানা পত্র পত্রিকায় যে সকল মন্তব্য ভারতের সনাতন হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে প্রকাশিত হয়েছে—তার সংবাদ লন্ডনের ভারতীয়দের মন ও প্রাণকে গভীর আনন্দ ও সম্মান দান করেছিল।

অরবিন্দ-চিত্তরঞ্জন-দ্বিজেন্দ্রলাল সহ অতুলপ্রসাদও সেই সব প্রকাশিত সংবাদের জন উৎসুক হয়ে থাকতেন। Study circle-এ বিবেকানন্দের বিশ্বজয়ের বিষয়ে সপ্রশংস আলোচনায় প্রত্যেকের হৃদয় উদ্বুদ্ধ হত—মনে মনে সংকল্প করতেন—স্বদেশে গিয়ে বিবেকানন্দের আদর্শ ও কর্মধারায় নিজেদের উৎসর্গ করবেন।

এদিকে চিত্তরঞ্জন দাশ ব্যারিস্টারী পাশ করে স্বদেশে ফিরে যাবেন, আনন্দ ও বেদনা যুগপৎ আর সকলকে আচ্ছন্ন করল। বিদায় বাসরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এবং অতুলপ্রসাদ গান গেয়ে মধুর রস পরিবেশন করলেন।

অতুলপ্রসাদ সময় পেলেই বিখ্যাত গায়িকা ম্যাডাম প্যাটের গান শুনতে যেতেন। শ্রীযুক্তা প্যাটের মধুর কণ্ঠে Home Sweet Home গানটি অতুলপ্রসাদের স্বদেশ আর্তিকে গভীরভাবে নাড়া দিত। পরবর্তী সময়ে প্যাটের সুরে ও কথার অনুসরণে

।। প্রবাসী চলরে, দেশে চল;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল।।

গানটি রচনা করেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বড় মামা কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত নিজস্ব একটি কাজে সপরিবারে বিলেতে এলেন। খবর পেয়ে অতুলপ্রসাদ লাগামহীন উৎসাহে ও আনন্দে ছুটে গেলেন মামা-মামিমা-মামাতো বোন হেমকুসুমের কাছে। স্বদেশের কথা, মা হেমন্তশশীর কথা, বোনদের কথা, দুর্গামোহন দাশের কথা বারবার নানা প্রশ্নের বিচিত্র ঘটনার জাল বুনে জিজ্ঞাসা করেন, উত্তরের সীমাহীন উৎকণ্ঠায় যে তিয়াস মেটে না। বার বার কুশল সংবাদের আগ্রহ পরিবেশকে কেমন যেন এক নিমেষের মধ্যে ঘরোয়া করে তুলল। কথাগুলি সবই দেহাতি বাঙলায়—এক কথায় ঢাকাই বাঙলায়। হাসি-মসকরার মধ্যে কুশল বিনিময়, আবার হেমকুসুমের সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্য। হেমকুসুম সংগীত-এস্রাজ-বেহালা-পিয়ানো এবং ছবি আঁকার প্রতি গভীরভাবে নিমগ্না। সুকণ্ঠী হেমকুসুমের বাঙলা গানের মিষ্টতার সাথে অতুলপ্রসাদের ভাবের তুফান যেন বিলেতকে ক্ষণিকের মধ্যে ঢাকা সদরবাজারে, নবাবগঞ্জের রাস্তায় সঙ্গীতের মিছিলে নিয়ে যেত।

অতুলপ্রসাদের ব্যারিস্টরী পড়ার নিঃশব্দ নিবিড়তায় মামা-মামিমার তথা হেমকুসুমের হাতছানি কেমন যেন আনমনা মাদকতায় লক্ষ্যভ্রষ্ট করে দিত। শিথিল ভাবনার প্রভাব অনেকটা হেমকুসুমের আবদারকে প্রশ্রয় দিয়েছিল; ধীরে ধীরে অত্যন্ত গভীরে জায়গা জুড়ে নিল। সুন্দরী, ব্যক্তিত্বপূর্ণা, সাহসিকতার ছটায় উজ্জ্বল হেমকুসুম প্রবাসী অতুলপ্রসাদের হৃদয়ে তোলপাড় সৃষ্টি করল। উভয়ে উভয়ের নিবিড়তায় কেমন যেন সব কিছু থেকে বিচ্ছিন্ন—আবার সব কিছু নিয়ে পূর্ণ; নিমেষের ভাল লাগার কাজল মনের ও প্রাণের সকল বর্ণের মধ্যে শুধু একটি মুখ, দুটো চোখ আর এই পৃথিবীর সকল রসের সমন্বিত চেতনা—অতুলপ্রসাদ-হেমকুসুম, হেমকুসুম আর অতুলপ্রসাদ। আর কিছু নেই উভয়ের সামনে। শুধু দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে থাকা—শুধু চেয়ে থেকে, চেয়ে থেকে একাকার হয়ে যাওয়া, ক্ষুধা তৃষ্ণা এই পৃথিবীর কত কি কথা, কিছুই ওদের দু'জনকে আকর্ষণ করে না, শুধু তাকিয়ে থাকার অবিরাম ব্যাকুলতা। সমস্ত দেহ প্রাণ যেন ক্ষণিকের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। ঐ দুটো প্রাণ নিবিড় হয়ে শুধুমাত্র দু'জনকে খুঁজে খুঁজে অতলে হারিয়ে যাচ্ছে, একটিমাত্র আর্তি নিয়ে—ওগো দাও, দাও, আমায় আরো

দাও, আমি যে পিপাসার্ত, পিয়াস যে মিটছে না; আরজন বলছে নাও, নাও আরো নাও আমায় শূন্য করে তোমার কাছে তুলে নাও। এমনিভাবে যখনই অতুল-হেম মিলিত হয়, ক্ষণিকের মধ্যে ভাললাগা প্রাণের আকুলতা কেমন যেন সব বাঁধন ছিন্ন করে উভয়ে উভয়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। এত কথা, এত ভাললাগা যেন শেষ হতে চায় না। এস্রাজ-পিয়ানোর বাজনায় আর গানের সুরে সেই একই, উভয়ের তাকিয়ে তাকিয়ে থাকা। এটাই উভয়ের বয়সের স্বাভাবিক ধর্ম—তা' প্রতিরোধ করার কোন কথা নেই, নেই কোন প্রয়োজনও। ভবিষ্যৎ সেখানে শুধু একাকার হয়ে যাওয়া—তুমি আমার, আমি যে তোমার।

হেমের ব্যক্তিত্বপূর্ণ আকর্ষণীশক্তি অতুলপ্রসাদকে নাড়া দিয়েছিল। হেমের সঙ্গে কথা বলতে, তার দিকে চেয়ে থাকতে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হন, আনন্দ অনুভব করেন। তাই পড়াশোনার পর প্রতিদিনই অতুলপ্রসাদ ছুটে আসেন বড়মামার বাড়ী—হেমকুসুমের সান্নিধ্যের জন্য, তার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিভোর আনন্দ লাভ করার জন্য।

বড় মামা কৃষ্ণগোবিন্দের লন্ডনের কাজ শেষ হল। এবার সপরিবারে স্বদেশ ফিরে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

আবার অতুলপ্রসাদ একা—একান্ত একা! সেই চেয়ে থেকে থেকে লীন হবার নেশা যেন নিঃসঙ্গতার বেদনায় ছটফট করছে, ক'দিনের ভাললাগার উদ্বেগহীন নিঃশেষ নিবিড়তার ছন্দপতন ঘটল, ছিন্নতার অসহনীয়তা সবটুকু পেয়েও যেন নিঃস্ব করে তুলল প্রতিটি মুহূর্তের না পাওয়ার শূন্যতায়। অতুলপ্রসাদ নিঃসঙ্গ—পেয়ে হারাবার যন্ত্রণায় নিজেকে খুঁজতে খুঁজতে আবার নিজের মধ্যেই তলিয়ে গেলেন। সামনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা। দ্রুত স্বদেশে যেতে হবে সেই শূন্য-প্রাণের পূর্ণকুম্ভের সন্ধানে। দিনরাত তার প্রস্তুতি। পড়া আর পড়া।

মাঝে মধ্যে মা'র চিঠি আসে। বোন হিরণ-কিরণ-প্রভা যুক্তভাবে দাদার কুশল প্রার্থনার লিপি পাঠায়। অবসর নেই, আজ আর কোন অপেক্ষা নয়, শুধু সমানে সামনে এগিয়ে যাওয়া—পরীক্ষা-পরীক্ষা। তারপর স্বদেশ—স্বদেশের সেই দিনগুলিকে ফিরে পাবার জন্য ব্যাকুলতা।

ব্যারিস্টারী পরীক্ষা সময় মত হয়ে গেল। অতুলপ্রসাদও কৃতিত্বের সাথে পাশও করলেন। সার্থকতার শিখরে উঠে পূর্ণতার আনন্দ পান করে সফল করলেন আনন্দ উল্লসিত স্বপ্নকে।

সময়টা ১৮৯৪ সাল।

স্বদেশে, কলকাতায় ফিরে এলেন ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ। মা হেমন্তশশী ও দুর্গামোহন দাশ এগিয়ে এসে অতুলকে বুকে টেনে নিলেন—সে এক অনিন্দ্য আনন্দঘন মুহূর্ত। অতুলপ্রসাদকে কলকাতায় সবাই দেখছে—কিন্তু অতুলপ্রসাদ যাকে খুঁজছে—সেই হেমকুসুমকে দেখছে না। মনটা অস্থির হল। মামা-মামিরা এসেছেন কিন্তু সে কোথায়! হেম কোথায়—এল না কেন? তবে কি! না না—ও আমায় ভোলেনি—। নানা কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ অতুলপ্রসাদ মামিকে জিজ্ঞাসা করল হেমকুসুমের বিষয়ে। শুনল হেমের শরীর ভাল নেই, ও বাড়ীতেই আছে।

স্বদেশে এলাম—হেমকে দেখলাম না—এটা সহ্য করতে না পেরে নিজেই ছুটে গেলেন—হেমকুসুমের কাছে—সামনাসামনি এসেই অতুলপ্রসাদ শুয়ে থাকা হেমকুসুমের কপালে হাত রাখলেন—কিন্তু হেম চোখ বুঁজে রইলেন—তাকালেন না—আনন্দ উৎফুল্লতার চিহ্ন ফুটে উঠল না—তবে কি হেম অভিমান করেছে! এবার অতুলপ্রসাদ আর একটু এগিয়ে হেমকুসুমের ঘন কেশরাশির মধ্যে তার হাত এলিয়ে আদর করতেই হেম চোখ খুলে শয়ান থেকে উঠে বলল,—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না—কেন আমাকে চিঠি দাওনি—সবাইকে চিঠি লিখেছ—আমাকে লেখনি কেন? তোমার কোন কথাই আমি শুনব না।

অতুলপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলল, ও, তাই অভিমান! হেম, আমি অপরাধ করেছি—কিন্তু তাতেও হেমের মুখে হাসি নেই, নেই চোখের মায়াজড়ানো আকুতি। অনেক সাধ্য-সাধনা মান-অভিমানের পালা শেষ করে উভয়ে উভয়ের উন্মুক্ত হৃদয়প্রান্তরে একাকার হয়ে গেল—

হেম অতুলপ্রসাদের বুকে হাত দিয়ে বলল, শরীর ঠিক আছে তো।

অতুলপ্রসাদ বলল, তোমার জন্যই ভাল আছি।

এদিকে ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ, সুদর্শন অতুলপ্রসাদের কর্মক্ষেত্রে নূতন জীবন শুরু করার ভাবনায় কলকাতায় দুর্গামোহন দাশের সহযোগিতায় বাড়ীভাড়া করা হল—৮২ নং সারকুলার রোডে। অচিরেই কলকাতা হাইকোর্টে এনরোল্ড হলেন।

কলকাতা হাইকোর্টে অতুলপ্রসাদ লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের জুনিয়র হয়ে যোগদান করলেন। কর্মক্ষেত্রের বিচিত্র মানুষের সংস্পর্শে অতুলপ্রসাদের জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা গভীরভাবে গড়ে উঠছে। সারাদিনের কর্মক্লান্ত পরিবেশে সারকুলার রোডের বাড়ীতে কিছুক্ষণ কাটিয়ে চলে যান ক্লাবে—সাহিত্য, সঙ্গীতের আসরে। বয়েস প্রায় একুশ-বাইশ।

এই সময়েই সরলাদেবী চৌধুরাণীর সহযোগিতায় জীবনের অতি সযত্নে পালিত আকাঙ্খার প্রজ্বলিত শিখায় অতুলপ্রসাদ-রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এক মুহূর্তের দেখাশুনায় পরম আত্মীয়তায় গভীর ও নিবিড় বন্ধনে উভয়ে যুক্ত হলেন। সে স্থানটি হ'ল **খামখেয়ালীর আসর**। "প্রথম দর্শনেই প্রেম"। রবীন্দ্রনাথ গান করেন। অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ। আসরে উপস্থিত একজন কবির কাছে অতুলপ্রসাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলেন, দেখুন, অতুল গান করে আর নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করেন।

লজ্জায় ও সংকোচে অতুলপ্রসাদ জড়সড়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আগ্রহ সহকারে বললেন, ...'সে ত' খুব ভাল কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন'। অতুলপ্রসাদ বিব্রত। রবীন্দ্রনাথ আশ্বাস দিয়ে গান গাইতে বললেন। অতুলপ্রসাদ কম্পান্বিত কলেবরে ও কম্পিত কণ্ঠে গান করেছিলেন, ভক্তি বিনম্র-চিত্তে জীবনের প্রথম শ্রেষ্ঠ পূজা সমর্পণ করলেন।

'খামখেয়ালী' সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসর। রবীন্দ্রনাথ অধিকারী, নেতা; সভ্যরা—অবনীন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, লোকেন পালিত, রাধিকামোহন গোস্বামী প্রভৃতি। অতুলপ্রসাদ নবাগত সর্বকনিষ্ঠ সভ্য। সাহিত্য-সঙ্গীত ও হাস্যরসের পরিবেশনে আনন্দ দানই উদ্দেশ্য। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অফুরন্ত হাসির গানে আসরকে মাতিয়ে তুলতেন। তিনি গাইতেন আর উপস্থিত অন্যান্যরা কোরাস ধরতেন। রবীন্দ্রনাথ কোরাসের নেতা।

দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গাইতেন—'হতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর,' রবীন্দ্রনাথ মাথা নেড়ে কোরাস ধরতেন, 'তা বটেই ত, তা বটেই ত'। দ্বিজেন্দ্রলাল গাইতেন, 'নন্দলাল একদা একটা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্রনাথ গাইতেন 'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। 'খামখেয়ালী' আসরে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান আসরের অন্যতম সদস্য রাধিকানাথ গোস্বামী তাঁর সুরে পরিবেশন করতেন।

রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে 'মহারাজ একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণ তলে কোটিশশী সূর্য মরে লাজে'; 'মম' যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী; সখী জাগো, জাগো'; 'বধু হে ফিরে এসো, মম সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত অন্তরে ফিরে এস'; 'জাগি পোহাল বিভাবরী'—প্রভৃতি গান 'খামখেয়ালী' আসরে অতুলপ্রসাদ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনতেন।

'খামখেয়ালী' আসর এক একজন সদস্যের বাড়ীতে বসত। তিনিই সকলকে নিমন্ত্রণ করতেন এবং ভোজের সুব্যবস্থা করতেন। একবার অতুলপ্রসাদ তাঁর বাড়ীতে 'খামখেয়ালীর' অধিবেশন আহ্বান করলেন। সেদিন অধিবেশন শেষে

রবীন্দ্রনাথ বাড়ী গেলেন রাত্রি বারোটার পরে, মহারাজা নাটোর গেলেন রাত্রি একটা-দুটার সময় আর দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ সবাই কীর্তন আর হাসির গান শুনে রাত কাটিয়ে তবে বাড়ী ফিরলেন। অতুলপ্রসাদ নিজে দ্বিজেন্দ্রলালকে বাড়ী দিয়ে এসেছিলেন। এমনিভাবেই অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য পেলেন; 'আপনি' হলো 'তুমি', পরম আত্মীয় সম্বোধনে পুলকিত অতুলপ্রসাদ প্রায় প্রতিদিনই জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে যাতায়াত করতেন। রবীন্দ্র-সাহিত্য রসাস্বাদন ও জলযোগে অতুলপ্রসাদ ধন্য হতেন। সে এক অনবদ্য অভাবনীয় আকর্ষণ—যা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অতুলপ্রসাদ অনুভব করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের দুয়ার, তাঁর হৃদয়ের প্রতিটি স্পন্দনে অতুলের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সাহিত্য আসর—গানের আসর তারই সঙ্গে ব্যারিস্টারি—অতুলপ্রসাদের সময় তাতেই ফুরিয়ে যায়—আর অন্য কোথাও তিনি যান না। বড় মামা মামিমা এলেন অতুলপ্রসাদের খোঁজ নিতে—সঙ্গে অবশ্যই হেমকুসুম। বড় মামা অতুলপ্রসাদকে জীবনে বড় হতে হবে তাই প্র্যাকটিস জমাতে হবে—তার জন্য সেদিকেই নজর দেবার পরামর্শ দিলেন। হেমকুসুম কথার ফাঁকে ফাঁকে অত্যন্ত মায়াবী চাউনিতে অতুলকে গ্রাস করছিলেন। ফিরবার সময় শুধু বলল, একদিন বাড়ীতে এসো, আমি অপেক্ষা করব।

'এসো' এই কথাটি অতুলপ্রসাদকে কেমন যেন মায়া জড়িয়ে সব কাজের উপর নেশা ছড়িয়ে দিল। ব্যারিস্টারী কাজের প্রয়োজনীয় কাগজপত্তরের কথা ভুল হতে লাগল—বার বার 'এসো' এই কথাটির মোহ আচ্ছন্ন করে অতুলপ্রসাদকে বিমূঢ় করে তুলল। কাজে মন নেই—ভাল লাগছে না। এমনি মানসিক অস্থিরতায় মাঝে মধ্যে ঘরের বাইরে ছুটে যায় নির্মল স্বচ্ছ পরিবেশে—এমনি একদিন চলতে চলতে নববর্ষার শান্তিবারি অতুলপ্রসাদের মাথায় পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে মন-প্রাণ স্নিগ্ধ হল—রবীন্দ্রনাথকে মনে পড়ল—ছুটে গেলেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীতে। রবীন্দ্রনাথও তখন নববর্ষার আগমনে বিহ্বল হয়ে বন্ধু লোকেন পালিতের সঙ্গে কাব্যচর্চায় মগ্ন। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে দেখলেন—বললেন, বোস অতুল, বোস এখানে, আমার পাশে।

হেমকুসুম হঠাৎ কখনো বা জানিয়ে অতুলপ্রসাদের সারকুলার রোডের বাড়ীতে এসে হাজির হন। তখন অতুলপ্রসাদের ব্যারিস্টারী সব কাজের দশা হয়। বিব্রত হন, আনমনা হন—কিন্তু কিছু বলা যায় না—বোঝানো যায় না—ও যে হেমকুসুম, অতুলের হেম! হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের বাড়ী এসে তার জীবনযাত্রার

অসংস্কৃত-অপরিচ্ছন্নতা, যদি কোথাও দেখে থাকেন, তা পরিচ্ছন্ন করেন—এটা ওটা গুছিয়ে দিয়ে যান।

মাঝে মাঝে হেমন্তশশীও পুত্রকে দেখতে আসেন—কেমনভাবে থাকে তা দেখে সেইমত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দিয়ে যান।

কিন্তু এদিকে অতুলপ্রসাদের ব্যারিস্টারীতে পসার হচ্ছে না। অবসাদ আসছে—কি করবেন, ভাবনায় যখন ক্লান্ত, তখন হেমকুসুম কাছে এসে উৎসাহ দেন—ভেঙ্গে না পড়ার জন্য প্রেরণা দেন—শক্তি সঞ্চয়ে সাহস জোগান।

কলকাতা ছেড়ে অতুলপ্রসাদকে রংপুরে গিয়ে প্র্যাকটিস করার পরামর্শ দেন অনেকে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-খামখেয়ালী আসর, দ্বিজেন্দ্র-বলেন্দ্র সান্নিধ্য ছেড়ে কি করে সম্ভব? মনটাকে উপবাসী রেখে অর্থ উপার্জন অতুলপ্রসাদের পক্ষে খুবই অসম্ভব।

সময়টা তখন ১৮৯৭ সাল, ডিসেম্বর মাস। দুর্গামোহন দাশ হঠাৎ মারা গেলেন। বিধবা হেমন্তশশীকে বিবাহ করার জন্য দুর্গামোহন দাশ নিকট আত্মীয়দের কাছ থেকে এবং প্রথম পক্ষের পুত্রকন্যা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন। মা, হেমন্তশশীর একমাত্র কূল ভেসে গেল। অতুলপ্রসাদের দায়িত্ব বেড়ে গেল, সংসারের খরচ সংগ্রহ করার গুরুত্ব গভীর হল। অতুলপ্রসাদ তাই সাংসারিক আর্থিক অব্যবস্থায় রংপুরে গিয়েছিলেন, কিন্তু হেমকুসুমের আর্তি এবং সাহিত্য মজলিসের প্রেরণায় আবার কলকাতাতেই তিনি চলে আসেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদ উভয়ে বিবাহে মনস্থির করেছেন—কিন্তু উভয়ের পারিবারিক কর্মকর্তারা তাতে সায় দিতে পারছেন না। মামাতো-পিসতুতো ভাই-বোনে বিবাহ! অসম্ভব, কোনভাবেই তা' মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। হেমকুসুমের মা-বাবা ও আত্মীয়-পরিজন সবাই প্রতিবাদ জানালেন। অতুল-জননী হেমন্তশশীও রাজি নন। তিনি প্রিয় পুত্র অতুলকে বোঝাতে চাইলেন, কেন রাজী নন তিনি। তিনি বলেন, অতুল—তুমি যদি হেমকে বিবাহ কর, তাহলে আত্মীয়-পরিবারে কিন্তু বিচ্ছেদ আসবে—আমাদের সমাজও তা গ্রহণ করবে না—মামাতো বোনকে বিবাহ করা। এই বলে হেমন্তশশী কাঁদে—বেদনার তপ্ততায় হৃদয় পুড়ে যেতে চায়—কিন্তু অতুল, সে যে আমার হৃৎপিণ্ড! আমার অন্তরের সকল সাধনার ফসল!

অন্যদিকে হেমকুসুমও বলে দিলেন, অতুল ছাড়া অন্য কাউকে সে বিবাহ করবে না—হয় বিবাহ করব নয়তো আত্মঘাতী হব—একগুঁয়ে, জেদী মনের উপর কেউ কর্তৃত্ব করতে পারবে না—করেওনি।

চারিদিক থেকে সামাজিক বিধি-ব্যবস্থায় ভাই-বোনে বিবাহ কোনমতেই গ্রহণযোগ্য নয়, আইনসিদ্ধ নয়।

কিন্তু অতুল-হেমকুসুম উভয়েই তাদের সিদ্ধান্তে অনড়, বিবাহ তাদের হবেই। হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদ উভয়ের অনমনীয় ভাবনায় আত্মীয় পরিজন সবাই অবসন্ন। ভাই-বোনের বিবাহ হিন্দু আইনে, বৃটিশ আইনে সেরকম কোন ব্যবস্থা নেই। ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিবাহ করতে অতুলপ্রসাদ একেবারেই রাজি নন। অবশেষে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের পরামর্শে এবং বড়মামার সহযোগিতায় বিলেতে গিয়ে স্কটল্যান্ডে গ্রেট্‌নাগ্রীন গ্রামের গীর্জায় বিবাহ সম্পন্ন করার জন্য অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে নিয়ে পুনরায় বিলেতে রওনা হলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বিলেতে স্বাভাবিক পরিবেশে এবং পরিকল্পনায় অতুল-হেম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন, সময়টা ১৯০১ সাল। আত্মীয়-পরিজন তথা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে অতুলপ্রসাদ কেমন যেন একটা মানসিক যন্ত্রণায় জীবনের গভীরতম আনন্দের অধিকার লাভ করলেন যা পরবর্তী ভাবনায় কখনও কখনও নিজের ভেতরটাকে সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল।

উভয়ের, অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম, এই আনন্দ ও জীবনের এই অধ্যায়টি প্রচ্ছন্নভাবে মাঝে মধ্যে বেশ বেগ দিত—চিন্তার গ্রন্থিতে জড়ত্বের দুর্বিষহ কান্না অনুভব করতেন। অভিমান পুষ্ট চেতনা যৌবনের উচ্ছল আবেগে দিশাহারা গতিতে ভেসে চলার প্রবণতা যখন থিতিয়ে গেল তখনই নিজেদের দিকে তাকিয়ে শুধু দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকত না।

অতুলপ্রসাদ স্থির করলেন দেশে ফিরবেন না। বিলেতেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করবেন—এই সিদ্ধান্ত হেমকুসুমও সমর্থন করলেন এবং সেইমত উভয়ে উভয়ের মানসিকতাকে রূপ দিতে লাগলেন। ব্যারিস্টারী পড়তে এসে এই বিলেতে দেশী বিদেশী যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত এবং দ্রুত তার রূপায়ণে অতুলপ্রসাদ রাতদিন পরিশ্রম করছেন, জীবনটাকে সুন্দর ও সহজবোধ্য করতেই হবে। প্রাণের এই আবেগকে প্রতিটি কর্মের মধ্যে অভিষিক্ত করে অতুলপ্রসাদ বিলেতেই প্র্যাকটিস শুরু করলেন। সারাদিনের ক্লান্তির মধ্যে হেমকুসুমের স্নিগ্ধ আদর এবং গানে অতুলপ্রসাদ ভেসে যেতেন। কিন্তু ব্যারিস্টারী তেমন জমছে না। অর্থাগম বেশ কষ্টসাধ্য। অনিবার্যভাবেই আস্তে আস্তে আনন্দের দিনগুলি বিষাদের ছায়ায় আচ্ছন্ন

হতে লাগল। নিরুপায় অতুলপ্রসাদ তবুও পরিশ্রম করে চলেছেন। একা শুধু একা। স্বদেশের কোন সংবাদ তাঁকে উদ্বেল করতে এগিয়ে এল না—ভরসা দিল না।

অতুলপ্রসাদ যখন একান্ত একা থাকেন—তখন দেশের জন্য, মার সেই মুখটার কথা মনে করে কেঁদে ওঠেন—কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেম কাছে এসে গেলে সহজ হয়ে যান। হেম বুঝতে পারেন অতুলের অসহায় অবস্থার অনুভব—তাই কাছে এসে বার বার সাহস জোগায়—ভরসা দেয়—বলে, একদিন দিন ফিরবে—তুমি অনেক অনেক বড় হবে। কিন্তু বর্তমানে অর্থ যে নেই—অতুলপ্রসাদ সেই কথাই বলতে চায়—কিন্তু বলার আগেই হেম বলে, ও তুমি চিন্তা করো না—আমার যা আছে তাতে চালিয়ে যাব।

এদিকে বাড়ী ভাড়া বাকী; শীতবস্ত্র তেমন নেই—সব মিলিয়ে একটা মানসিক যন্ত্রণায় ভুগছেন। অতুলপ্রসাদ চিরদিন আত্মীয়-পরিজন নিয়ে থাকতে ভালবাসেন। তাই বিলেতে এসে নিঃসঙ্গ অবস্থায় বার বার কলকাতার— বিশেষ করে মা-বোনদের-বন্ধুবান্ধবদের কথা খুব মনে পড়ে—এমনি ভাবনায় মাকে চিঠি লিখতে চেষ্টা করে। কিন্তু হেম তাতে কুণ্ঠা জানায়—বলে, ওরা তোমার কোন খোঁজ নেয় না—তুমি কেন চিঠি লিখবে! অতুলপ্রসাদ তাকিয়ে থাকে হেমের মুখের দিকে। হেম বলে, তোমার মাকে তুমি ভালবাস—কিন্তু আমাদের বিয়ের ব্যাপারে তোমার মা-বোনেদের মানসিকতার কথা ভুলে গেছ অতুল! এমনি অনেক কথা বলতে বলতে হেম উত্তেজিত হয়ে যান।

অতুলপ্রসাদ কাছে এসে হেমকে আদর করে, কাতরভাবে অনুনয় করে বলে—হেম তোমাকে খুশী করতে পারলাম না। বোধহয় আমি পরাজিত।

হেম অতুলপ্রসাদের বুকে মাথা রেখে বলে, না, আমি সুখী—তুমি চিন্তা কোর না—আমাদের দিন অবশ্যই বদলাবে।

এমনি অবস্থায় হেমকুসুম একজোড়া সন্তানের জননী হলেন। শিশু দুটির নামকরণ হল—দিলীপকুমার এবং নিলীপকুমার। অভাবনীয় ঐশ্বরিক আনন্দে উৎসারিত হয়ে অতুলপ্রসাদ জীবনের সকল শক্তি ও উৎসাহকে যুক্ত করলেন জীবন-ধারণের অনিবার্য কর্মে—প্র্যাকটিসে। স্ত্রী-পুত্রদের জন্য তাঁকে এগিয়ে যেতে হবেই, যত বাধাই তাঁর পথ অবরোধ করুক তা অতিক্রম করে যেতেই হবে—এই পণে অতুলপ্রসাদ দিন-রাত পরিশ্রম করছেন, ছুটোছুটি করছেন। স্বদেশে মার কাছে সংবাদ পাঠিয়েছেন, বন্ধুদের জানিয়েছেন হেমকুসুমের জননী হবার সংবাদ। কিন্তু স্বদেশের কোন দিক থেকে কোন বার্তা এল না—স্বাভাবিকভাবেই উভয়ের চেতনা বিচলিত, অনেকটা বিধ্বস্ত। এদিকে প্র্যাকটিসও মন্দা। আয় নেই, ব্যয় তীব্র।

হেমকুসুম নানাভাবে অতুলপ্রসাদকে সাহস ও শক্তি দান করছেন—কিন্তু তা কতক্ষণ, কতটুকুই বা বাস্তব পরিস্থিতিকে আসান দিতে পারে! একে একে সংসারের খরচের জন্য সব সঞ্চয় নিঃশেষ—হেমকুসুমও তাঁর নিজস্ব সম্পদ গহনাগুলি, বিক্রি করে সন্তানদের ও নিজেদের সামলাচ্ছেন। কিন্তু তাও কতদিন? গোপনে যদিও কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত কিছু কিছু সাহায্য করতেন—তাও অভাবের সাগরে কতটুকু!

এদিকে নিলীপকুমারের জ্বর। সামান্য পথ্য ও ঔষধের জোগান না পেয়ে প্রচণ্ড শীতে নিলীপকুমার মারা গেলেন।

আচমকা ঝড়ে সব আনন্দ একমুহূর্তে উড়ে গেল, বেদনার কান্না যেন সর্বদিক থেকে ঘিরে ফেলল অতুলপ্রসাদ-হেমকুসুমকে। নিরুপায়, নিঃসঙ্গ একান্তভাবে অবসন্ন উভয়ে। কোথাও এতটুকু হাত ধরার নেই। নেই আশ্বাস। সব উদ্যম ও উৎসাহের অনিবার্য পরিণতি বিষাদ যেন কালো মেঘের মত সর্বক্ষণ-প্রাণ আচ্ছন্ন করেছিল। এমন অসহায় অবস্থার কথা উভয়ের কেউ কোনদিন ভাবেনি পর্যন্ত। কিন্তু কেন হল! কার কাছে যাবে অতুল, হেমকুসুম আর শিশুপুত্রকে নিয়ে! কেই বা ওদের এই বিপর্যয়ে আশ্রয়-অন্ন-স্বস্তি দেবে! এ যে স্বদেশ নয়—এর পথঘাট তো হৃদয়তন্ত্রীতে অপরিচিত। বন্ধু-বান্ধব যা জুটেছে, তাঁদের দিক থেকেও কিছু ভরসা পাবার সম্ভাবনা নেই। নেই এতটুকু আলোর সন্ধান। অন্ধকারে হাত-মুখ যেন আরো শিথিল—আরো নিরুপায়, একান্তভাবে নিঃস্ব। চারিদিকে যখন হতাশা আর হতাশা তখন অতুলপ্রসাদ অবসন্ন, অন্তরের কান্নায় অন্তরদেবতার চরণ ধুয়ে শুধু প্রার্থনা জানালেন—বিবশ চেতনায় শিশুর মতো নিজেকে নিবেদন করলেন সেই পরমের কাছে, যেখানে সব অভিমান সব অহংবোধের ধুলো ঝেড়ে তিনি কোলে তুলে নেন। মেঘাচ্ছন্ন আকাশেও আলোর রেখা দেখা যায়, তখন সব হারিয়েও জীবনের সন্ধানে পুলকিত হই আমরা। অতুলপ্রসাদের প্রার্থনা ব্যর্থ হয় নি—করুণাঘন, অতুলপ্রসাদের অন্তরের আর্তিতে নিজেই কাতর হলেন—অন্ধকার বিবশতা অতিক্রম করে আলোর বার্তা পৌঁছে দিলেন।

বিলেতে প্র্যাকটিস করার সময় একজন ভারতীয় বন্ধু মমতাজ হোসেন ব্যারিস্টারী করতেন। মাঝে মাঝে ব্যারিস্টারীর ব্যবসা সংক্রান্ত পরামর্শ ও আলোচনা অতুলপ্রসাদ ও মমতাজ হোসেন উভয়ে উভয়ের কাছে যাওয়া আসা করতেন। মমতাজ হোসেন অতুলপ্রসাদকে খুবই ভালবাসতেন, আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধাও করতেন তাঁর অমায়িক সততার জন্য। অতুলপ্রসাদের প্রবাসজীবনের আর্থিক অস্বচ্ছলতা মমতাজ হোসেন বুঝতেন—কিন্তু কোনদিনই সে সম্পর্কে

ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করতেন না। নিলীপকুমারের মৃত্যুর পর অতুলপ্রসাদের মানসিক অবস্থায় সান্ত্বনা দিয়েছিলেন এই মমতাজ হোসেন। কিন্তু মুখ ফুটে কোন সাহায্যের কথা তিনি বলতে সাহস পেতেন না। কিন্তু, দরদী মন তো বেশিদিন নীরবে চুপ থাকতে পারে না। তাই অতুলপ্রসাদের অন্তরের সীমাহীন যন্ত্রণার তল যখন খুঁজে আর পাওয়া যায় না তখন মমতাজ হোসেনই অতি সন্তর্পণে এগিয়ে এলেন—পাশে এসে সমব্যথীর মত হাতে হাত রেখে বললেন, অতুলপ্রসাদ, একটা কথা বলব, যদি অভয় দেন। অতুলপ্রসাদ শুধু চেয়ে রইলেন অন্তর উজাড় করা মমতাজ হোসেনের মুখের দিকে। কত কথা বলতে চায় অতুলপ্রসাদ—কিন্তু কিছু বলার আগেই মমতাজ হোসেন বললেন, আপনি স্বদেশে ফিরে যান; সেখানে লখনউতে গিয়ে প্র্যাকটিস করুন।

অতুলপ্রসাদের দু'টি চোখ জলে ভরে গেল—আমার স্বদেশ, আমার আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব, আমার মা—আমার স্বদেশ—সেই স্বদেশ—সেই স্বদেশ ছেড়ে অভিমানে চলে এসেছি মমতাজ হোসেন, আবার আমাকে সেই স্বদেশেই যেতে বলছ। অন্যমনস্ক হয়ে কী যেন বলতে যাচ্ছে অতুলপ্রসাদ—মমতাজ সেই ব্যাকুলতা কেড়ে নিয়ে বললেন, আমি লখনউ-এর বাসিন্দা, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আমি যথাসাধ্য করব আপনার জন্য, আপনার প্রতিষ্ঠার জন্য। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনার প্র্যাকটিস সেখানে ভাল হবে এবং লখনউবাসীর বিশ্বাস ও আনুগত্য আপনি নতুন জীবনের উপাদানে সমৃদ্ধ হবেন। অতুলপ্রসাদ, আপনি লখনউতে যান। আমার অনুরোধ, আপনি বিষয়টি ভালভাবে ভাবুন। তিনি আরো বললেন,

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এডভোকেট বিপিনবিহারী বসু লখনউ-এর বিশিষ্ট বাঙালি—আপনার সবরকম সাহায্য করবেন। আমি তাঁকে সব জানিয়েছি—অতুলবাবু আপনি লখনউতে যান—সেখানে আপনার যোগ্য পরিস্থিতি ও সুযোগ হবে।

অতুলপ্রসাদ প্রবাসী-বন্ধু-ভাই-অকৃত্রিম সহমর্মী মমতাজ হোসেনের উপদেশ গভীরভাবে চিন্তা করলেন—হেমকুসুমকে সব বললেন। একটা কূলহীন নোঙরহীন জীবন তরীতে ভেসে ভেসে কতদিন অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকা যায়! এ যে দুঃসহ, বিপর্যস্ত মানসিকতা—অন্তরের সকল সুষমাকে তিলে তিলে কদর্যতায় পর্যবসিত করছে অভাবের তীব্রতার প্রতিঘাতে। প্রেম ভালবাসা—ভাল ভাল আদর-সিক্ত কথাও যেন আজ আর আসে না। সেই প্রাণ নেই, সেই প্রীতি নেই, নেই সেই ব্যাকুলতা, নেই সুন্দরের প্রতি, স্নিগ্ধতার প্রতি আকর্ষণ। আবার এরই মধ্যে গুঞ্জরিত হচ্ছে—

'প্রবাসী, চলরে দেশে চল'
কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল।
চলরে প্রবাসী দেশে চল—

ভাবনায় ছন্দময় হয়ে উঠেন অতুলপ্রসাদ। উৎসাহ ও প্রেরণার অদৃশ্য কোমল হাতের পরশ-আনন্দে মাঝে মাঝে বিহ্বল হয়ে উঠেন। মা-মাতৃভূমির প্রতি কৃতঘ্নতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য অবোধ শিশুর মত বোবামনে ও চেতনায় আবিষ্ট হয়ে হেমকুসুমের কাছে ছুটে যান—পুত্র দিলীপকুমারকে আদর করে কোলে তুলে নেন। হেমকুসুমও হাত দুটো বাড়িয়ে দিয়ে প্রিয় অতুলের হাতে হাত লাগিয়ে মুখখানা পরম নির্ভয়ে বুকের মধ্যে লুকিয়ে অস্পষ্ট সুরে বললেন, চল, লখনউ যাই, যা হবার স্বদেশেই হোক।

দু'টো হাতে হেমকুসুমের মুখখানা অঞ্জলি করে চারটি নয়ন নিবদ্ধ করে রইলেন অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ। চোখের তারা থেকে ছিট্‌কে পড়া মুক্তোর শীতলতা বিদ্যুৎগতিতে সমস্ত মন ও প্রাণের উষ্ণতাকে ঝর্ণার প্রবাহে পরিশুদ্ধ করে নিল।

স্থির হল—স্বদেশেই ফিরবেন। মমতাজ হোসেনকে জানালেন—তার কথা মত স্বদেশ-লখনউতেই যাবেন অতুলপ্রসাদ সপরিবারে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বিলেত থেকে স্বদেশে—কলকাতায় ফিরে এলেন অতুলপ্রসাদ সপরিবারে—অভ্যর্থনায় কেউ নেই, কোথাও আর দশজন ভারতীয়দের বা বিদেশীদের আগমনে পুষ্পস্তবক আলিঙ্গন-মিষ্টিহাসি দিয়ে অভিনন্দন জানাতে এলেন না। অতুলপ্রসাদ পুত্র দিলীপকুমারকে কোলে নিয়ে হেমকুসুমের হাত ধরে নিস্তরঙ্গ অথচ আফসোস হাসিতে কলকাতায় এলেন। আত্মীয়-বন্ধু-এমন কি তিন বোন-মা কেউ তাঁদের আগমনে শুভেচ্ছা বা কুশল সংবাদ নিতে বা দিতে এলেন না। তবুও অতুলপ্রসাদ তাঁর সেই প্রাণখোলা হাসি ও উদ্দীপনায় হেমকুসুমের অনিবার্য ক্ষোভকে সরলীকরণ করার চেষ্টা করতে ব্যস্ত অনবরত। একমাত্র একজন, শিশিরকুমার দত্ত অতুলপ্রসাদের স্বদেশে ফেরার সংবাদ জানামাত্র ছুটে এসেছিলেন। অতুলপ্রসাদ যেন কলকাতার আত্মীয়-বন্ধুজনের অবজ্ঞা ও অবহেলার মধ্যে একটা প্রশান্ত-স্থির-নীরব-আশ্রয়পূর্ণ সহমর্মিতার পরশ পেলেন—জীবনের প্রতি, দেশের প্রতি ফিরে এল ভরসা। শিশিরকুমার দত্তের কাছেই অতুলপ্রসাদ মা হেমন্তশশী, তিন বোন হিরণ-কিরণ-প্রভার খোঁজ খবর পেলেন। খামখেয়ালী সভারও খোঁজ নিলেন।

দেশ জুড়ে তখন বাঙলা ভাগের আয়োজন—তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

আন্দোলনের বক্তৃতায় এদিক ওদিক আন্দোলিত। সবাই পথ খুঁজছে—কখনো আবেদন নিবেদনে, কখনো বা এদিক ওদিক অসন্তোষের প্রকাশ্য আর্তনাদ মূর্ত হচ্ছে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সময়টা ১৯০২ সন।

লখনউ এর সেই বিখ্যাত মানুষ বিপিনবিহারী বসু তার পুত্র সনৎকুমার লখনউ স্টেশন থেকে অতুলপ্রসাদদের নিয়ে সোজা ঝাউতলা পুলের বাড়িতে উঠালেন।

একেবারে সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশ—উত্তরপ্রদেশের নবাবী নগর, টপ্পা-ঠুংরির সুরে সুরায়িত নগর লখনবতী লখনউ। দিল্লীর বাদশা-নবাবদের স্বহস্ত প্রোথিত পৌরাণিক নগরী লখনউ; প্রবাসী বহু বাঙালির উজাড় করে দেওয়া শিল্প-কর্ম-ভাবনা ও কর্মধারায় পুষ্ট লখনউতে অতুলপ্রসাদ এলেন সপরিবারে। কেউ তেমন পরিচিত নেই, নেই কোন সজ্জন-বন্ধুও—তবু ভরসা এই যে,

"জিস্ কো না দেয় মৌলা
উস্‌কো দেয় আসফ-উ-দ্দৌল্লা।।"

তাই অতুলপ্রসাদ সপরিবারে লখনউতে প্রথম ক'দিন বিপিনবিহারী বসুর বাড়ীতে থেকে পরবর্তী সময়ে সেই মমতাজ হোসেনের সহযোগিতায় রাজা শ্রীপাল সিংহের বাড়ি ভাড়া করে সংসার সাজান। মমতাজ হোসেনের হিতৈষণায় লখনউ-এর বহু সম্ভ্রান্ত মুসলমান অতুলপ্রসাদের প্রতিষ্ঠায় স্বইচ্ছায় গভীর আন্তরিকতায় এগিয়ে এলেন—অন্তর দিয়ে সহযোগিতা করলেন। মমতাজ হোসেন অতুলপ্রসাদকে বড় ভাই বলে সম্মান করতেন।

বিপিনবিহারী বসু লখনউ বার এসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি অতুলপ্রসাদকে বার এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত করে নিলেন এবং নিজে এগিয়ে এসে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস সংক্রান্ত কিছু কিছু তথ্য জানিয়ে দিলেন। তিনি অতুলপ্রসাদকে লখনউ-এর স্থানীয় ভাষা 'উর্দু' শেখার জন্য বললেন এবং লখনউ-এর বিখ্যাত আইনজীবিদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। কিছুদিনের মধ্যে অতুলপ্রসাদ একটি বাড়ী ভাড়া করে লখনউতে পুরোশক্তিতে ও মেজাজে ব্যারিস্টারী ব্যবসা শুরু করলেন।

ভাড়াবাড়ী সাজিয়ে প্রখ্যাত ব্যারিস্টারের বাসোপযোগী করে তুলতে হেমকুসুম দিনরাত পরিশ্রম করছেন। আস্তে আস্তে লখনউ-এর গণ্যমান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের সাথে যোগাযোগে অতুলপ্রসাদের জীবনের সকল গ্লানি ও শূন্যতা ধীরে

ধীরে দূর হতে লাগল। সরকারী উকিল টমাস সাহেবের জুনিয়র বিপিনবিহারী বসু এবং ঝাউলাল পুলেরৎ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষালের সাহায্যে অতি অল্প সময়ের মধ্যে লখনউ কোর্টে প্র্যাকটিস শুরু করলেন অতুলপ্রসাদ। কিন্তু তিনি কোনদিন কারোর জুনিয়র হয়ে প্র্যাকটিস করেননি। আপন সুপ্ত কৌশল ও বুদ্ধিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নামকরা ব্যারিস্টার হয়ে উঠলেন।

সেজন্য অতুলপ্রসাদ আইন ব্যবসায় কোর্টকাছারির চলাচলের ভাষা উর্দু শিক্ষা করেন। একজন মুন্সীও তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন।

প্রতিদিন কোর্টে যেতেন অতুলপ্রসাদ। প্রতিদিনের বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে করে প্রথম প্র্যাকটিস জীবনের দুর্বলতা জয় করতে পেরেছিলেন খুব দ্রুত। লখনউতে তালুকদারী ব্যবসায় শরিকী ঝগড়া খুবই স্বাভাবিকভাবে প্রায়ই অতুলপ্রসাদকে মেটাতে হত। তাতে অর্থাগম যেমন হত, তেমনি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ল নাম ও ব্যবহারের কথা। খুব অর্থ পেতেন না—তবে অভাব ধীরে ধীরে আয়ত্তের মধ্যে এসে যেতে লাগল। তবে তার জন্য হেমকুসুমের সক্রিয় ভূমিকা গভীর। সামান্য অর্থে ঘর ও সংসার একজন শুচি-শুদ্ধ সংস্কৃতি-মনা মানুষের নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল। সবটুকু কৃতিত্ব হেমকুসুমের নিজস্ব ভাবনায় অতি যতনে ও সুপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছিল। বাঙলার নিজস্ব আদব-কায়দায় সংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দুতে যে মমত্ব, যে অননুকরণীয় স্নিগ্ধ আন্তরিকতা, হেমকুসুম অন্তরের আকুতি দিয়ে তিলে তিলে উজাড় করে দিয়ে আপন সত্তার পরিচয় গেঁথে দিলেন। কল্পনার সঙ্গে না পাওয়ার যন্ত্রণাকে প্রায়শই অতিক্রম করে উভয়ে উভয়ের স্বপ্নালু ভাবনাকে একটু একটু করে দিনে দিনে প্রতিদিনের দেনা-পাওনায় সামঞ্জস্য রক্ষা করে এক অনিন্দ্য আনন্দের প্রবাহ সৃষ্টি করত অনবরত। সেই আনন্দে ব্যক্তিগত পাওয়া না পাওয়ার দাবী তেমনভাবে উভয়ের কাহারো অন্তরে তেমন ঝড় তুলতে পারত না।

লখনউতে অতুলপ্রসাদ একেবারে আন্‌কোরা—নূতন। ব্যারিস্টারী ব্যবসায় পসার তখনও তেমনভাবে গতি পায়নি। সামান্য রোজগার হতে আরম্ভ করেছে, মনে মনে ভয়—জীবন সফল হবে তো? অর্থ না হলে যে সবই ব্যর্থ হবে!

একদিন কোর্ট থেকে ফেরার পথে রাস্তায় এক ফকিরের সঙ্গে দেখা হল। ফকিরই অতুলপ্রসাদকে ডেকে চোখ-মুখ-কপাল দেখে বলল, খুব চিন্তা করছ? কোন চিন্তা ভাবনা করিস না—তোর অনেক টাকা রোজগার হবে, প্রভূত সম্মান তুই এখানে পাবি। অনেক টাকা হবে বেটা।

তারপর ফকির নিজেই আস্তে আস্তে পথে হারিয়ে গেলেন। আচমকা

বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে চলে যাওয়া পথের দিকে সজল দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন অতুলপ্রসাদ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ নগরীর তথা উত্তরপ্রদেশের বাঙালিরা অন্তরসত্তায় যা কিছু শ্রেয়, যা কিছু পরহিতায়, সবটুকু অন্নভূমির জন্য উজাড় করে দিয়েছিল—নানা সেবা কর্মে, প্রতিষ্ঠান, মন্দির, চিকিৎসালয়, বিদ্যালয় স্থাপনে। তাই সেদিন বাঙালি ডাক্তার, বাঙালি ইঞ্জিনীয়ার, বাঙালি উকিল, বাঙালি জজ, বাঙালি হোটেল, বাঙালি ধর্মশালা— এক অর্থে একটি নগর পরিকল্পনায় যা-যা অনিবার্য তার প্রায় সবকিছুতেই বাঙালির গতি ছিল মান্যতার, সুখকর ও প্রতিষ্ঠার। সেদিন বাঙালির সম্মান ছিল, সেবা কাজে উৎসর্গীকৃত চেতনায় প্রতিযোগিতা ছিল, তাই বাঙালি ছিল শ্রদ্ধেয়, আন্তরিক।

লখনউ-এর সেসময়ের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের মধ্যে যাঁরা সর্বত্র পরিচিত ছিলেন সেই গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মমতাজ হোসেন, নবীউল্লা বেগ, লালা শ্রীরাম, বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব, সামীউল্লা বেগ, গোকরনাথ মিশ্র—প্রভৃতি গণ্যমাণ্যগণ প্রায় প্রতিদিন অতুলপ্রসাদের সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টার—মামলার ব্যাপারটা হৃদয়ে খুব একটা সায় পেতেন না। তাই তাঁর কাছে যাঁরা কোন বিষয়ে সালিশী চাইতে আসতেন, অতুলপ্রসাদ মন-প্রাণ দিয়ে তা' সম্পন্ন করতে চাইতেন। মধ্যস্থতায় মিটমাট করে শান্তি স্থাপনের দিকেই তাঁর বেশি উৎসাহ ছিল। মামলার দীর্ঘসূত্রতায় যে অবাধ অর্থাগম এবং উকিলবাবুর পসার—অতুলপ্রসাদের ভাবনায় তার কোন স্থান ছিল না।

লখনউ হিন্দু ও মুসলমানের অন্তর-শক্তির সংস্কৃতি পাশাপাশি। মসজিদ আর মন্দির—মহরম ও রামলীলার রাবণ-বধ—উভয় সম্প্রদায়ের নিত্যকালের উপভোগের আকর্ষণ। নবাবি আমল থেকেই মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিয়া-সুন্নির বিরোধ বিবাদ লেগেই আছে। আবার আলোচনার মধ্য দিয়ে তা আবার মিটেও যায়।

সামাজিক প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়েই চিরস্থায়ী সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য অতুলপ্রসাদ আইনের ব্যবসা না করে হৃদয়ের বোঝাপড়ার জন্য কিছু ছাড়, কিছু ত্যাগ করা এই ধরনের কর্মধারায় বেশী উৎসাহী ছিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ-এর সামগ্রিক উন্নয়নে বহির্বঙ্গের যে ক'জন বাঙালির চিত্ত গভীরভাবে

নিয়োজিত ছিল তাঁদের সঙ্গে যুক্ত হলেন অতুলপ্রসাদ। বাবু গঙ্গাপ্রসাদ লখনউ মিউনিসিপ্যাল ভাইস-চেয়ারম্যান থাকাকালে অতুলপ্রসাদ ছিলেন তাঁর ডান হাত। অতুলপ্রসাদ কঠোর পরিশ্রমে ও সততায় গঙ্গাপ্রসাদের অতি কাছের বিশ্বস্ত লোক হলেন খুবই অল্প সময়ের মধ্যে।

সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার, ক্লাব, নাট্যশালা—যেখানে বাঙালি সেখানেই এগুলির প্রকাশ—আর অতুলপ্রসাদ তার পুরোধা। এই লখনউ নগরীতে ১৮৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের' সংস্কার এবং 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র প্রতিষ্ঠা অতুলপ্রসাদের স্মরণীয় কাজ। 'গুডউইল ক্লাব'-এর আদলে ১৯৩০ সাল থেকে লখনউতে অতুলপ্রসাদ নানাবিধ সেবাশ্রম সমিতি গড়ে তোলেন।

এই সব সেবামূলক কাজে লখনউ-এর সাধারণ মানুষের কাছে অতি অল্প সময়ের মধ্যে অতুলপ্রসাদ একটি বিশেষ নামে পরিচিত হতে লাগলেন। ব্যারিস্টারী প্রাকটিস, সেবা কাজ ইত্যাদিতে এত সময় দিতেন যার জন্য ঘরের কাজে, ঘরোয়া নিবিড়-স্নিগ্ধ পরিবেশে হেমকুসুম খুব কম পেতেন অতুলপ্রসাদকে। সারাদিন যাঁর অপেক্ষায় থেকে থেকে তিনি ক্লান্ত—সেই তাঁর একান্ত, একান্ত আপন অতুলপ্রসাদ তখনও ঘরে ফেরেন নি। এমন অনেক দিন হয়েছে, সারারাত অপেক্ষা করে করে অবসন্ন হৃদয় এলিয়ে পড়েছে ক্ষোভে-বেদনায়, অনেকটা নিঃসঙ্গ যন্ত্রণায়। সেই যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে হৃদয়ের অতি নিভৃত স্থানে অতুলপ্রসাদের প্রেম ও ভালবাসার প্রতিটি দিনের কুঁড়ি অকারণে খসে পড়ে, কখনও বা শুকিয়ে কালো হয়ে ঝরে যায়। অলক্ষ্যে অবচেতন মনে এর প্রতিক্রিয়া হেমকুসুমের অন্তর-সত্তায় গভীরভাবে প্রতিরোধ সৃষ্টি হয় যা বাইরে থেকে অতুলপ্রসাদ বুঝতে পারতেন না। অতুলপ্রসাদ আজন্ম ভাবুক। জীবনের সকল পরিস্থিতিতে চেতনার পাপড়িগুলি ফোটাবার জন্য প্রতিনিয়ত আনন্দ-অনুষঙ্গে সকল কাজ করে যেতেন—পেছনে তাকাবার সময় নেই। তাই গভীররাতে যখন দিনের কাজ সমাপন করে নীড়ে আসতেন তখন প্রিয়ার—একান্তনির্ভর হেমকুসুমের উত্তাপহীন নীরবতা সজোরে ফিরিয়ে দিয়ে ব্যর্থ করে দেয় প্রিয় সম্ভাষণের দীর্ঘ প্রতিক্ষার ব্যাকুলতা। তবুও অতুলপ্রসাদ থামেননি। পিতা রামপ্রসাদ সেন এবং মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের কাছ থেকে সঞ্চারিত সেবাব্রতের বীজ প্রতিদিন প্রতিটি সূর্যালোকের তেজে উপ্ত হয়ে উঠছে অতুলপ্রসাদের চিত্তে। সেখানে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সবার জন্য উন্মুখ তপস্যা প্রতিনিয়ত সাধনা করে যাচ্ছে। এর বিরাম নেই, কোন বাধায় স্তব্ধ হবার এতটুকু সুযোগ নেই। রাত্রিতে ব্যর্থ-আবাহন বক্ষে ধারণ করে অতুলপ্রসাদ প্রভাতের সূর্য প্রণামের সাথে সাথে বেরিয়ে পড়েন। ঘরের কথা, একান্ত প্রিয়জনের

বিরহ কাতরতা তাঁকে পথ থেকে ঘরে ফেরাতে পারে নি। এভাবে প্রতি রাত্রির নানা উপাচারে হৃদয়-উৎসারিত বিচিত্র অনুভূতির সম্মিলিত কুসুমে সজ্জিত ফুলশয্যা শূন্য বাসরে পরিণত হয়েছে হেমকুসুমের। এ যে কী যন্ত্রণা, কী অপমান, কী দুঃখ—তা' সেই জানে, যিনি শুধু অপেক্ষা করেন, যাঁর প্রাণবায়ু প্রতি পলকে স্পন্দিত, উৎসুক হৃদয়ে যাঁর জন্য সজাগ। বন্যা-দুর্ভক্ষ-বিপদগ্রস্তদের পাশে যত সহজে অল্প আয়াসে অতুলপ্রসাদকে লখনউ-এর আপামর জনসাধারণ কাছে পায়—হেমকুসুম তার জন্য কঠিনতম তপস্যায় সর্বস্ব খুইয়েও অতুলপ্রসাদকে নিরবচ্ছিন্ন আপন বাহুলতায় এখন আর পাচ্ছেন না। অতুলপ্রসাদের ঘর আছে, ঘরে তিনি নেই;—প্রেম আছে কিন্তু প্রিয়া উপবাসী।

এমনিভাবে অতুলপ্রসাদ অনেকটা কাজ-পাগলের মত বাউল হয়ে সারা লখনউ শহরের সর্বত্র ঘুরে চলেছেন। ঘরের কথা, হেমকুসুমের কথা ভাবার সময় নেই।

লখনউতে অতুলপ্রসাদের রথ সকলকে প্রসন্নতা দিয়ে দুর্বার গতিতে চলেছে। 'অতুলপ্রসাদ' এই নাম সেই রথের বেগে হারিয়ে 'ভাইদাদা'-'সেন সাহেব' তাঁর একমাত্র পরিচয়। অনেক দৌড়েছেন অতুলপ্রসাদ। মাঝে মাঝে যখন নিজের দিকে তাকিয়েছেন তখন হেমকুসুমের মুখখানি, বিরহ কাতর তপস্বিনীর মত মনে হয়েছে—তখন আর অবহেলা নয়, নয় এতটুকু বিলম্ব—দ্রুত ছুটে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে দরজায় দাঁড়িয়ে অন্তরের উজাড় করা স্পন্দনে ডাকেন, 'হেম, আমার হেমকুসুম।'

সেই ধ্বনি যেন পাষাণের ভেতর থেকে প্রীতির রসাস্বাদনে স্নিগ্ধ হয়ে সকল অবরোধ অতিক্রম করে বন্যা হয়ে দু'চোখ ভাসিয়ে বলে, এই যে আমি এসো, দুয়ার খোলা! তারপর; তারপর উভয়ের আকুতিভরা পিপাসার পরিতৃপ্ত আদরে আর আলিঙ্গনে সকল বিচ্ছেদের, যন্ত্রণার উপশম।

হেমকুসুম শিক্ষিতা, সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। তবে চলনে-বলনে একটা আভিজাত্য যেন সকল হীনভাবনাকে মুহূর্তের মধ্যে জয় করতে পারে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার মধ্যে মানসিক যন্ত্রণায় ছটফট করেও হেমকুসুম তার অতুলপ্রসাদের হৃদয় নিভৃতে মুখখানি রেখে বলে, ...ওগো, আমি যে তোমার প্রেম, তোমার শক্তি— 'শুধু নর্মসহচরী নই, কর্মসহচরীও হতে পারি।'

... হেম, হেম তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার আরাম। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার কিছু নেই। তোমার জন্যই তো আমার লখনউ আসা। আমি জানি, আমাকে তুমি ভুল বুঝবে না। অতুলপ্রসাদ দ্রুত কথাগুলি বলে আবার আদর আর আলিঙ্গ নে নিবিড় হয়ে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ বাড়ী পরিবর্তন করলেন—শ্রীপাল সিংহের বাড়ী ছেড়ে কেশররাগ সার্কাসের কাছে ব্যাঙ্কস রোডে দেয়ালঘেরা বাড়ী ভাড়া করলেন।

অতুলপ্রসাদ মা হেমন্তশশীকে কলকাতা থেকে নিয়ে এলেন তাঁর কাছে রাখার জন্য। বোনেদের সকলের বিয়ে হয়ে গেছে।

মা হেমন্তশশী আজ একা। অতুলপ্রসাদও মা'র কাছে থাকতে চায়—তার আজ বড় দরকার মা'র সান্নিধ্য আর মা'র সেবা করার সুযোগ। অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টার—অর্থ আর যশ পুরোপুরি তাকে সুউচ্চ শিখরে নিয়ে যাচ্ছে—সেখানে মাকেই সবথেকে বেশী প্রয়োজন—। কিন্তু হেমকুসুমের মন তাতে বিদ্রোহ করে—আপত্তি জানায়। হেমকুসুম ভুলতে পারেনি তাদের, যারা অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের বিবাহকে মেনে নিতে পারেন নি—তাই কোন সম্পর্ক নয়, নয় কোন আত্মীয়তা। অতুলপ্রসাদকে বার বার বারণ করেছিলেন হেমকুসুম। কিন্তু অতুলপ্রসাদ তা মানবেন কি করে! সে যে মায়ের জন্য কাঙ্গাল! মা ছাড়া তার অন্য কোন আশ্রয় যে নেই। তাই হেমকুসুমের প্রতিবাদে অতুলপ্রসাদ বেদনা পেয়েছেন—তাকে বোঝাতে সেটা করেছেন।

অতুলপ্রসাদ আশৈশব একটি বিরাট পরিবারের মধ্যে লোক-জন-পাড়া প্রতিবেশী এদের নিয়েই বড় হয়ে উঠেছেন। আত্ম-কেন্দ্রিক মানসিকতার এতটুকু পরশ তার চরিত্রে দেখা যায়নি। হেমকুসুমের তাতে আপত্তি—তাই বার বার অতুলপ্রসাদের ইচ্ছাকে প্রতিঘাত করেছেন। নানা কথায় যখন হেমকুসুম বুঝতে পারলেন অতুলপ্রসাদ তার মাকে লখনউ-এর বাড়ীতে রাখবেই তখন তিনি সহজ অথচ নিষ্ঠুরভাবে বলে দিলেন... তাহলে আমাকে এ বাড়ী ছাড়তে হবে।

অতুলপ্রসাদ নীরব হলেন। শুধু বললেন, ...তুমি যা করবে করবে। তবে মা ছাড়া আমার আর কেউ আপন নেই। মা'র জন্যই আমি আজ এখানে! আমার প্রতিষ্ঠা—মাকে কোনভাবেই আর একা একা আমার কাছ থেকে দূরে থাকতে দেবো না—একথা স্পষ্ট করে হেম তোমায় জানাচ্ছি। অগত্যা হেমকুসুম সেসময়ের জন্য অতুলপ্রসাদের ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছিলেন।

এখনকার বাড়ীটি বড়—তাই অতুলপ্রসাদ, মা ও হেমকুসুম নিয়মিত উপাসনা করতেন। হেমকুসুম ব্রহ্মসংগীত পরিবেশন করতেন। হেমন্তশশী কীর্তন ভালবাসতেন। অতুলপ্রসাদ তারও ব্যবস্থা করেছিলেন। লখনউ-এর 'মূক ও বধির' স্কুলের প্রধান শিক্ষক রেবতীকুমার প্রায়শই অতুলপ্রসাদের বাড়ী এসে হেমন্তশশীকে কীর্তন শুনিয়ে যেতেন। বাঙলার কীর্তন প্রাণের সকল দুয়ার খুলে দিত—হৃদয়

পত্রপুটে সঞ্চিত সকল আবেগ নিমেষের মধ্যে চোখের পর্দা ভাসিয়ে দিত, এমন অনেকদিন অতুলপ্রসাদের চোখ দুটিও ভেসে গিয়েছিল।

রেবতীকুমার ছিলেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য। অঘোরনাথ মুখোপাধ্যায় উপাসনায় অধ্যক্ষের পদে বৃত হতেন।

অতুলপ্রসাদ ধীরে ধীরে লখনউ তথা উত্তরপ্রদেশের অপ্রতিরোধ্য নেতৃত্বের সুউচ্চ শিখরে। রাজনৈতিক নানাবিধ আলোচনায়ও অতুলপ্রসাদের উপস্থিতি খুবই আদরণীয় ছিল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯০৫ সাল। নানা বাগবিতন্ডার বেড়াজাল ছিন্ন করে ইংরেজ সরকার 'বঙ্গ বিভাগ' করে অবিভক্ত বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের সংহত ঐক্যশক্তিকে ছিন্ন-ভিন্ন করার কুটিল অভিপ্রায়ে দীর্ঘদিন থেকে চক্রান্ত করে চলেছে; মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য আলাদা আবাস-এর কথা বলে ক্ষেপিয়ে তুলতে সবরকম প্রয়াস করা হ'ল।

অবশেষে ১৯০৫ সালের ১৫ই অক্টোবর বাঙলা ১৩১২, ৩০শে আশ্বিন 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ' ঘোষণা হল। অবিভক্ত বাঙলাদেশের বুকে এ আঘাত যেন আশীর্বাদের মত নেমে এল। বাঙলাদেশের অভিজাত ও উচ্চশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের সাথে মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা একসঙ্গে এই আইনের, ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে সামিল হলেন— যা এর আগে এমনভাবে দেখা যায়নি। অতুলপ্রসাদও সুদূর লখনউ থেকে এই মহাপুর্ণ মিছিলে যোগদান করার জন্য কলকাতায় এলেন সেই পুণ্য দিনে ১৬ই অক্টোবরে। হাওড়া স্টেশনে নেমে কলকাতা অভিমুখে রওনা হবার মুখে সমবেত সুরে একটি গান শুনতে পেয়ে থমকে দাঁড়ালেন—

দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এনু মা, তোর
হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।
এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে;
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।
অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে—

থাকব না আর স্বার্থে ভুলে।
থাকবে না আর রেষারেষি—
কাহার অল্প কাহার বেশি;
দু ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণতলে।
দু'জনেই বুঝেছি এবার—
তোর মতো কেউ নেই আপনার;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

অতুলপ্রসাদ মস্তক অবনত করে নয়নমুদে গানটি শুনছিলেন। গানটি শেষ হ'বার পর দলের মধ্যে একটি ছেলেকে ডেকে অতুলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, এ গানটি কার ভাই তোমরা যা গাইছ! ছেলেটি বেশ আশ্চর্য হয়ে গর্বিত সুরে বলল, কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের গান, আপনি জানেন না! অতুলপ্রসাদ স্মিতহাস্যে পুলকিত গৌরবে সেই গানের দলের সাথে চলেছেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখলেন দেশপ্রেমিক জন-সাধারণ দলে দলে গান গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন—বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য। শোভাযাত্রার সামনে একটি অল্প বয়স্ক বালক (মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিশু পুত্র, অধুনা মহারাজ) মোটাকায় একটি লোকের স্কন্ধে উঠে হাত নেড়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইছে... 'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল...' শোভাযাত্রায় সমবেত সকলে তার পুনরাবৃত্তি করছেন। সে দৃশ্য হৃদয়স্পর্শী— অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ, প্রণত হলেন সকলের চরণে। রবীন্দ্রনাথও নিজে খালি পায়ে গঙ্গাস্নান করে নতশিরে সেই মহাপুণ্য মিছিলে মাতৃবন্দনায় যোগ দিয়েছিলেন, সকলের কণ্ঠে 'যদি ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে...'

সে বৎসরই কংগ্রেসের অধিবেশন বারাণসীতে। অতুলপ্রসাদ লখনউ থেকে মনোনীত অধিবেশনের অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য। তাঁর সাথে ছিলেন গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, গোকরনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, মমতাজ হোসেন এবং আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ। অতুলপ্রসাদ শুধু সদস্য নন, লখনউ-এর নেতা। বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতি মহামতি গোখলে। সেবার অধিবেশেনে আলোচ্য বিষয় ছিল বঙ্গভঙ্গ। বাঙালির দেশপ্রেমের যে বহিঃপ্রকাশ সেদিন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় আপামর মানুষের বিনম্র রাখি-বন্ধনের পদযাত্রা ও পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের পটভূমিকায় জনচিত্ত, বিশেষভাবে যুব সমাজে

স্বদেশের জন্য, স্বদেশের স্বাধিকারের জন্য ব্যাকুলতা—কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি গোখলে তার উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু কার্যতঃ কোন পরিকল্পনা বঙ্গ-ভঙ্গের বিষয়ে কোন প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচী গ্রহণ করেননি। তাতে অতুলপ্রসাদ যারপর নাই ক্ষুব্ধ, লজ্জিত। সমস্ত মন-প্রাণ যন্ত্রণায় ছটফট করছে, কিন্তু সদ্য জাতীয় কংগ্রেসের সদস্য হয়ে অতুলপ্রসাদ নিরুপায়; কিন্তু হৃদয় মধ্যে তারজন্য যে ঝড় উঠছে তার প্রকাশ করলেন। অধিবেশন চলাকালে অতুলপ্রসাদ বেদনাসিক্ত কণ্ঠে গাইলেন,

আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।...

অধিবেশন মঞ্চে উপবিষ্ট জাতীয় নেতৃবৃন্দ কেমন যেন আনমনা হয়ে নত মস্তকে কৃতকর্মের সংশোধন উপায় অন্বেষণ করছেন—বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ করতেই হবে। জাতীয় ঐক্যবোধের সম্মিলিত ভাবনা দেশকে আরও বেশি যুক্ত করতে হবে, কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

সভাপতি মহামতি গোখলে অতুলপ্রসাদ-এর কাছে এসে বিমুগ্ধ আন্তরিকতায় আশ্বাস দিলেন।

গোখেলে উদাত্তকণ্ঠে জানালেন,

... The tremendous upheaval of popular feeling which has taken place in Bengal in consequance of the partition will constitute a landmark in the history of our national Progress. For the first time since British rule began all sections of the community, without distinction of caste or creed, have been moved by a common inpulse and without the stimulous of external pressure to act together in offering resistance to a common wrong.

অতুলপ্রসাদ বারাণসী কংগ্রেস অধিবেশনে গোখলের বক্তব্যে গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। গোখলেও অতুলপ্রসাদের ব্যবহার ও দেশপ্রেমের স্বচ্ছ বিরোধহীন ব্যাকুলতায় সন্তুষ্ট হলেন এবং লখনউতে এসে অতুলপ্রসাদের আতিথ্য গ্রহণ করলেন। হেমকুসুম এবং হেমন্তশশী গোখলের অভ্যর্থনায় হৃদয় উজাড় করে দিলেন।

গোখলে বাঙলা বুঝতেন। অতুলপ্রসাদও গোখলের মানসিকতাকে অনুভব

করতে পারতেন। তাই বাড়ীতে একান্তভাবে পেয়ে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের একটি গান গেয়ে গোখলেকে অভ্যর্থনা জানালেন।

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্,
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক—
মুখ তুলে আজি চাহো রে।
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি—
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহো রে।।
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী, এ নহে স্বপন—
আসিবে সে দিন আসিবে।।
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে
পুণ্য প্রেমের বাতাসে
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ—
না থাকে কলহ, না থাকে বিবাদ—
ঘুচে অপমান, জেগে ওঠে প্রাণ—
বিমল প্রতিভা বিকাশে।।

ধ্যান-মন্ত্রের উদাত্ত কণ্ঠে সঞ্জীবিত প্রতিটি শব্দ হৃদয়ের সকল আকুতি নিঙড়ে অতুলপ্রসাদ গানটি পরিবেশন করলেন গোখলের অভ্যর্থনায়। গোখলে অতুলপ্রসাদের কণ্ঠের আবেগ এবং গানের সুরে এমনই বিহ্বল হয়েছিলেন যে তাঁর দু'চোখ জলে ভেসে গেল, হাত দিয়ে গলে যাওয়া চোখের বন্যাকে আটকালেন।

অতুলপ্রসাদ গোখলেকে জানালেন— শৈশবে রবীন্দ্রনাথের এই গানটি আমি

সর্বত্র গাইতাম। এরপর অতুলপ্রসাদ নিজের রচিত সেই প্রথম দেশাত্মবোধক সঙ্গীত—

উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা—

এই গানটি আংশিক গাইলেন। এই গানের সঙ্গে কণ্ঠ জুড়েছিলেন হেমকুসুমও। মা হেমন্তশশী গোখলের সম্মানে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে নানা কুশল বার্তায় বঙ্গ-ভঙ্গ তথা কংগ্রেসের কার্যাবলীর খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন।

অতুলপ্রসাদের উদ্যোগে গোখলকে লখনউ-এর 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় নিয়ে যাওয়া হয়। সমিতির কাজকর্মে গোখলে উৎসাহিত হয়েছিলেন এবং প্রতিটি রাজ্যের প্রতিটি শহরে এই ধরনের সমিতির মাধ্যমে আর্ত-মানুষের সেবা এবং দেশাত্মবোধ উদ্‌বোধনে পরিকল্পনা গ্রহণের অভিপ্রায় জানিয়েছিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউতে আসার পর অতুলপ্রসাদের অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি, জনপ্রিয়তা এক অর্থে একটি জীবনে যা যা আয়ত্তে আসলে শিখরচূড়ায় ওঠা যায়, তিনি তাই উঠেছিলেন। অনলস পরিশ্রম এবং বাঁধনহীন পরহিতে কর্ম-সচেতন এই মানুষটির অন্তর কিন্তু গভীর যন্ত্রণায় আপন নিভৃতে ছটফট করতো অনবরত। কর্ম-জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে অতুলপ্রসাদ নিজেকে উজাড় করে দিয়ে তাঁর সার্থকতার ফসল তুলেছেন—কিন্তু ঘরের অতি গোপন কেন্দ্রস্থলে ছিল তাঁর 'ভালবাসার, প্রীতির জন্য বাধভাঙ্গা কান্না'—সেই কান্না একান্তভাবে আপন, একান্ত গোপন। কিন্তু প্রতিদিনের উদ্যমে আঘাত হানলেও অতুলপ্রসাদের চিত্ত ছিল অদমনীয়।

হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদের বিবাহকে কেন্দ্র করে উভয় দিকের আত্মীয় পরিজনদের অনমনীয়-অমানবিক-অসহযোগিতা এবং হৃদয়হীন আচরণ গভীরভাবে দীর্ঘদিন অনুভূত হয়েছিল। হেমকুসুম সে' সকল দিনের এবং বিশেষভাবে নিকট আত্মীয়দের ব্যবহারকে ভুলতে পারেননি। বিবাহের পর বিলেতে যে দারিদ্র্য ও অস্বচ্ছলতার মধ্যে প্রতিদিন কাটাতে হয়েছে এবং অর্থ ও সহানুভূতি না পাওয়ায় হেমকুসুমের সমস্ত অন্তরজুড়ে আত্মীয় পরিজনদের উপর বিতৃষ্ণা তথা বিরূপ মানসিকতা তিলে তিলে জমেছিল। তা'ছাড়া হেমন্তশশী চার চারটি সন্তান থাকা সত্ত্বেও পুনরায় বিবাহ করাকে হেমকুসুম কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি—বরং অন্যায় ও অশোভন মনোবিকারগ্রস্থ প্রবৃত্তি বলে অনুভব করতেন। এটা

হেমকুসুমের ব্যবহার এবং চিন্তা-প্রসূত কথাবার্তায় প্রায়ই অতুলপ্রসাদকে আক্রমণ করত। সেখানে অতুলপ্রসাদ নীরব, নিঃসঙ্গ। মা-র জন্য সেদিনের অভিমানকে প্রতিনিয়ত জয় করে মাতৃভক্ত সন্তান অতুলপ্রসাদ মা'র আহ্বানকে কিছুমাত্র অবজ্ঞা করতে পারলেন না। হেমন্তশশী যখন অতুলের কাছে থাকতে চান বলে জানালেন,অতুলপ্রসাদের হৃদয়তন্ত্রীতে সেই 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' আহ্বানকে অত্যন্ত জাগ্রত-আবেগে গ্রহণ করলেন—ছুটে গেলেন 'মা'কে আনতে। মা হেমন্তশশী লখনউতে এলেন, অতুলপ্রসাদ মাতৃসেবায় নিজেকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু হেমকুসুমের তা ইচ্ছে নয়—তিনি চান না, হেমন্তশশী তাঁর সংসারে, এইখানে এই লখনউতে একই বাড়িতে থাকেন। উভয়ের বিবাহের বিষয়ে হেমন্তশশীর অমত এবং বিরুদ্ধ মানসিকতা হেমকুসুমের ঘৃণাকে আরো বেশী উত্তেজিত করতো, প্রতিদিনের ঘটনায় আর তারই প্রকাশ ঘটত অতুলপ্রসাদের প্রতি-নিষ্করুণ আচরণে। অতুলপ্রসাদ যে পথিক পাগল। তাঁর কাছে মানুষের অবজ্ঞা স্থায়ী নয়। 'সবারে বাসরে ভালো'র বন্যায় একাকার। হেমন্তশশী যে মা, 'গর্ভধারিণী'; তাঁকে রাখবেন হৃদয়ে, প্রতিদিনের ইষ্টমন্ত্রের জপে। সেখানে কারো অংশ নেই দেবার। হেমকুসুমের লাগামহীন অসহযোগিতা এবং দুর্ব্যবহার অতুলপ্রসাদের হৃদয়কে দীর্ণ-বিদীর্ণ করেছে—কিন্তু 'মা' এই জপ থেকে একদিনের জন্যও বিচ্যুত করতে পারেনি অতুলপ্রসাদকে। ছিন্ন-ভিন্ন চেতনার মর্মে অতুলপ্রসাদ সেই মাতৃমন্ত্র ধ্যানের শক্তির রসে অভিষিক্ত। রোদন-ভরা জীবনের পথে দুর্নিবার চলার ছন্দে ও সুরে গ্রথিত হয়েছে তাঁর হৃদয়তন্ত্রী—যার ভেতর থেকে গেয়ে উঠছে জীবন-ভেদি, অন্তরস্পর্শী আকুলকরা জীবনবেদের সঙ্গীত, যার ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর দীপশিখায় অতুলপ্রসাদ অন্ধকার জীবনের দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একদিকে মা হেমন্তশশীর প্রতি দ্বিধাহীন অনুরাগ, অপরদিকে প্রিয়া হেমকুসুমের লাগামহীন বিদ্রোহ—এ'দুয়ের তীব্রতা অতুলপ্রসাদের কোমল প্রাণকে বার বার আঘাত হানত প্রতিদিনের ছোট ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অতুলপ্রসাদ শুধু নির্মোহ ব্যাকুলতায় ভেতরের কান্নাকে চেপে রেখে মানুষের মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে শান্ত হতেন, অবসন্ন হৃদয়কে কর্ম্মমুখর করে তুলতেন। মা'র প্রতি অতুলপ্রসাদের গভীর আনুগত্য এমনভাবে নানা প্রতিকূল পরিবেশে গভীর হয়েছিল যা পরবর্তী সময়ে একান্ত-নির্ভর সেই মা হেমন্তশশীর সীমাহীন প্রভাব পুত্র অতুলের জীবনের প্রবাহে দুর্বার গতি শেষ দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্য করা গেছে।

একদিকে মা হেমন্তশশী অপর দিকে স্ত্রী হেমকুসুম সমান্তরাল বেগে দাঁড়িয়ে অতুলপ্রসাদের জীবন-পরীক্ষায়। হেমকুসুম সুন্দরী-গুণান্বিতা-অমায়িক-বিনয়ী-পরোপকারী এক অর্থে রুচিশীলা অথচ জেদী প্রকৃতি।

মা ও বাবা আত্মীয় পরিজনরা যখন হেমকুসুমের সাথে অতুলপ্রসাদের বিবাহে অমত জানিয়েছিলেন তখন হেমকুসুমের চোখে-মুখে, ভাব-ভাবনায় এবং স্থির সংকল্পে একটা অমার্জনীয় তথা অবশ্য অবাধ্যকতার উত্তেজনা সর্বব্যাপক সর্বগ্রাসী হয়ে উঠেছিল। 'আমি আত্মহত্যা করবো অতুলকে না পেলে'—এই ভয়ানক ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে সেদিন হেমকুসুম তাঁর পরিচয় পারিবারিক জীবনে জানিয়ে দিয়েছিলেন। হেমকুসুমের সেই ইচ্ছা ফলবতী হয়েছে—অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হলেন বিদেশে; তারপর থেকে অবর্ণনীয় দুঃখ কষ্ট, সাংসারিক অসহযোগিতা এবং অস্বচ্ছলতা এবং আত্মীয় পরিজনদের অমার্জনীয় দুর্ব্যবহার, সব কিছু জড়িয়ে নানা ঘটনার তীব্রতায় উপ্ত হয়েও হেমকুসুম আজ সকলের সু-উচ্চ বাতায়নে প্রেম-বিহ্বল। কিন্তু সেই অমানবিক ব্যবহার ও আন্তরিকতার লেশহীন পরিবেশের কথা যখন হেমকুসুমের চিত্তকে আচ্ছন্ন করে তখন হেমকুসুম আর হেমকুসুমে নেই। তীব্র প্রতিশোধ আকাঙ্খায় উত্তেজিত সর্বাঙ্গ। চোখ-মুখে সমস্ত চেতনা তখন উত্তপ্ত। সেখানে কোন ক্ষমা নেই। নেই কোন মানিয়ে চলার ভীরু বিলাসিতা। হেমকুসুম তাই মাঝে মাঝে আপন সত্তায় আপন প্রচ্ছন্ন সকল কীট দংশন একই সঙ্গে অনুভব করেন, বিদ্রোহ তখন একমাত্র অবলম্বন; সেখানে প্রিয় অতুলপ্রসাদেরও রেহাই নেই। বাহ্যজ্ঞানশূন্যতার তীব্রতা এত বেশিভাবে প্রকাশ হত যে, হেমকুসুম ও অতুলপ্রসাদের মধুর সম্পর্কও পুড়ে ছাই হতে কিছুমাত্র সময় লাগত না। অন্যায় ও অশোভনতাকে হেমকুসুম কোনভাবেই আমল দিতেন না, সেখানে হিতাহিত জ্ঞান ও পদমর্যাদার কোন আবেদন কার্যকর হত না। অতুলপ্রসাদের আত্মীয় পরিজনেরা মামাতো বোনকে বিবাহ করার গ্লানি ভুলতে পারত না, কিন্তু সময়ে অসময়ে নানাবিধ বিষয়ে অতুলপ্রসাদের আনুকূল্য পেতে এতটুকু বিলম্ব করত না। 'আমাদের অতুলপ্রসাদ, আমাদের যত নষ্টের অশোভনতার কাণ্ডারী হেম, হেমকুসুম'। এ ধরনের উক্তি এবং ধারণা-সঞ্জাত ব্যবহার হেমকুসুমকে আরো, আরো বেশি হৃদয়হীন, ক্ষমাহীন প্রতিশোধ স্পৃহায় মত্ত করে তুলত—আর তার প্রতিক্রিয়ার প্রতিটি স্ফুলিংগ অতুলপ্রসাদের প্রতি বর্ষিত হত নির্বিচারে দ্বিধাহীন আচরণে। এমন পর্যায়ে সেই আচরণ উঠে যেত—যার ফলশ্রুতিতে উভয়ের দেখাশোনা বন্ধ, এমন কি বিচ্ছেদ-এর সকল পরিণত দিকগুলি অনিবার্যভাবে দেখা দিত।

হেমন্তশশীর অতুলপ্রসাদের কাছে স্থায়ীভাবে বাস করার প্রক্রিয়া হেমকুসুম কোনভাবেই মেনে নিতে পারছিলেন না। মা ছেলের কাছে, ছেলে মায়ের কাছে—এতো স্বাভাবিক। কিন্তু হেমকুসুম তা' চান না—আত্মীয়স্বজন পরিবেষ্টিত

অতুলপ্রসাদের মানসিকতায় তাঁর এই আঘাত গভীরভাবে উভয়ের স্নিগ্ধ ভাবাতুর পরিচ্ছন্নতাকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করছে অনবরত প্রতিটি বিষয়ে। আবার হেম-অতুলের অনিবার্য বিরোধকে ইন্ধন জুগিয়ে নানাভাবে গল্প-কাহিনীর জালে আবদ্ধ করে আরোও গভীরে আরো অনমনীয়তায় পুষ্টিদান করেছে অবাঞ্ছিত উভয়ের কাছের কিছু কিছু মানুষ। অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের ব্যবহারিক জীবনের নানা ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিলকে তাল করে উভয়ের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝির কারণহীন ঘটনা ও বিষয়ের অবতারণায় মধুর পরিচয়কে তিক্ত করে তুলতে সাহায্য করত—ঘোলাটে বিষক্রিয়ায় মানসিক যন্ত্রণা উভয়ের চিত্তকে টুক্‌রো টুক্‌রো করে বিক্ষিপ্তভাবে ছুঁড়ে ফেলত। সে এক অসহনীয়-অভাবনীয়-অবর্ণনীয়-অসহায়তা উভয়ের হৃদয়জুড়ে রাজত্ব করত। উভয়ে উভয়ের শত্রু, দেখা, নাম-শোনা সবটাই তখন অনভিপ্রেত।

এমনিভাবেই একদিকে অতুলপ্রসাদ তাঁর সারাজীবনের যা কিছু আনন্দ, যা কিছু পূর্ণতা—সবটুকু হেমকুসুমের জন্য উজাড় করে দিয়েও বিধাতার অদৃশ্যলিপিতে শূন্যতার, বেদনার জাগ্রত আর্তনাদের শিকার; অপরদিকে সর্বস্ব পণ করে নিজেকে যার কাছে যুক্ত করে সকল প্রত্যাশায় আর্তি জানিয়ে তপস্নাতা, সেই হেমকুসুমও বিড়ম্বিতা, অসহায়া হয়ে আত্মহননের ক্রোধাগ্নিতে পথহারা।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম উভয়ে উভয়ের সত্তার নিগূঢ় আকাঙ্খা হৃদয় জুড়ে প্রতিদিন বিন্দু বিন্দু ভরে নিয়েছিলেন যে প্রেম-সিন্ধুর কলস, তাই 'রাতারাতি করল কে রে ভরা বাগান ফাঁকা'? সেই শূন্যতার নিঃসঙ্গ-অসহায়তা জীবনে 'মেঘে ঢাকা তারার' ছলনায় অবসন্ন, ক্লান্ত।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রচারক ও প্রবক্তা—পিতা রামপ্রসাদের মৃত্যুর পর মা হেমন্তশশী নববিধানের উপাসনা চালিয়ে যেতেন—পুত্র অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের বিবাহকে তেমনভাবে আন্তরিক সমর্থন জানান নি—হেমকুসুম তাতে গভীরভাবে বিব্রত হতেন এবং অতুলপ্রসাদের নববিধানে মাখামাখিকে কিছুতেই হেমকুসুম মেনে নিতেন না।

হেমন্তশশী দয়াশীলা, আর্তমানুষের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল গভীর। অতুলপ্রসাদের উপর সেদিক থেকে মা'র প্রভাব এত—যা পত্নী হেমকুসুমের কাছে কুণ্ঠায়, বিরক্তির উষ্ণতা বর্ধিত করতে সাহায্য করত অনবরত।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ সুদূর লখনউতেও আন্দোলিত হল। সর্বত্র ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-মিছিল এবং অত্যাচারের প্রত্যাঘাত। ক্ষুদিরামের ফাঁসি-প্রফুল্ল চাকী-যতীন দাসের আত্মত্যাগ—আলিপুর বোমার মামলা—বারীন-উল্লাসকর সহ বহু তরুণ বাঙালির কারাবরণ—অরবিন্দের মুক্তি—সব মিলিয়ে বঙ্গের বাঙালির অন্তরে গভীর মর্মভেদী আর্তনাদ। কিন্তু প্রকাশ করার পথ খুঁজে পাচ্ছে না। তাই সভা-আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে তার বাহ্যিক কিছু প্রকাশ এখানে ওখানে বিচ্ছিন্নভাবে হয়। অতুলপ্রসাদও উত্তেজিত, মর্মাহত। কিন্তু তিনি কবি-সমাজসেবী-ব্যারিস্টার। তাই দেশের প্রতি তার কর্তব্য আছে—এই ভেবে অতুলপ্রসাদ গান গেয়ে গেয়ে মানুষের অন্তরকে স্বদেশভাবনায় সংহত করার প্রয়াস করলেন। বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়ার সময় যে গানটি আংশিক রচনা করেছিলেন এই অবসরে তাকে পরিপূর্ণ রূপ দিয়ে সর্বত্র সুযোগ পেলেই গাইতেন...

উঠ গো ভারতলক্ষ্মী
উঠ আদি-জগতজন পূজ্যা
দুঃখ-দৈন্য-সব নাশি, কর দূরিত ভারত লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, করো সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে।

আবার লিখলেন,

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় বসে।
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি
দুয়ারখানি দে রে তুলি।
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ পরশে—শীতের মেঘের পরশে।
থাকবে নিচে ধরার-ধূলি
ভুলব পরের বচনগুলি
বলব আমার আপন বুলি
মন-হরযে—আপন মনের হরযে।

অতুলপ্রসাদের এই গানটি পরবর্তী কয়েকদিনের মধ্যেই কারাগারের দেশ-সন্তানদের মুখে মুখে অন্তর-শক্তির প্রবল বেগের সৃষ্টি করল। অত্যাচার আর কারাগারের ভয় তাদের আর রইল না। একদিকে রবীন্দ্রনাথের গান আর মাঝে

মাঝে অতুলপ্রসাদের গান বিপ্লবীদের মুখে মুখে দেশ সন্তানের শক্তি বর্ধিত করল দুর্বার গতিতে।

লখনউতেও দেশ-চেতনার দীপশিখাটি জ্বালিয়ে দেবার প্রচ্ছন্ন দায়িত্ব এসে গেল স্বাভাবিকভাবে অতুলপ্রসাদের উপর। অতুলপ্রসাদ সেই কাজ অত্যন্ত গভীর মমত্ববোধে স্থানীয় মানুষের সেবায় রূপান্তরিত করলেন।

অনুন্নত বস্তিবাসীদের মধ্যে নিজেকে নিয়ে গেলেন—তাদের প্রতিদিনের জীবন-ধারায় সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন চিন্তার কাজ করতে লাগলেন।

নিজে এগিয়ে গিয়ে হরিজনদের সেবা করা তখনকার লখনউবাসীদের কাছে অভাবনীয় ব্যাপার। অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টার—নগরের অত্যন্ত মানী সম্ভ্রান্ত মানুষ—তাকে বস্তি অঞ্চলে সমাজসেবায় দেখতে পেয়ে সাধারণ মানুষের অন্তরে যে ভালবাসার স্থান পেয়েছেন তাই সেদিন তাকে লখনউ-এর মুকুটহীন রাজা করে তুলেছিল।

এদিকে ছোটখাটো নানা সাংসারিক ঘটনার সূত্রে হেমন্তশশীর প্রতি হেমকুসুমের ব্যবহার খুব একটা স্বাভাবিকভাবে গতি পায়নি। অনেকটা তাচ্ছিল্যের প্রচ্ছন্ন বেদনায় বিদ্ধ করত হেমন্তশশীকে। তাই পুত্র অতুলের কাছে থাকার যে আকাঙ্খা এতদিন মনে মনে পোষণ করে নিশ্চিন্ত হতেছিলেন—তা আস্তে আস্তে উবে যাচ্ছে। নানাভাবে হেমকুসুম হেমন্তশশীকে বিদ্রূপ করছেন। সে সবই হেমন্তশশী নীরবে সহ্য করে চলেছেন।

সম্পূর্ণ স্ত্রীর অমতে অতুলপ্রসাদ মাকে তার কাছে এনে রেখেছেন—এ যে একটা মানসিক পারিবারিক যন্ত্রণা। অতুলপ্রসাদ মার প্রতি হেমকুসুমের ব্যবহারে রেগে যেতেন। সেই বেদনা অন্তর জীবনকে দিনে দিনে নিঃস্ব করে তুলল অতুলপ্রসাদকে। আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব এদের নিয়েই অতুলপ্রসাদের জীবনের তরঙ্গ। কিন্তু হেমকুসুম একেবারেই তার বিপরীত—তিনি কোনভাবেই অতুলপ্রসাদের মা-আত্মীয় পরিজনদের সহ্য করতে পারছেন না—একটা জেদ গভীরভাবে হেমকুসুমের মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে তীব্রতায় পরিণত হত। অতুলপ্রসাদ অসহায়ের মত দিন অতিবাহিত করতেন। অথচ অতুলপ্রসাদের মন, তার কথা 'প্রেমে ভরা'—সেই প্রেম সর্বস্তরে। হেমকুসুম তা সহ্য করতে পারতেন না।

এমনি পরিস্থিতিতে হেমকুসুম তার জেদ পরিপূর্ণতায় অসুস্থও হয়ে যান।

হেমন্তশশী সব দেখেন, বোঝেন। কিন্তু অনেক কথা অতুলপ্রসাদকে বলেন না—একা একা বসে হজম করেন।

কিন্তু কেউ যাতে জানতে না পারে তার জন্য তিনি সজাগ থাকতেন। ছেলে

নামজাদা ব্যারিস্টার—মান্যগণ্য কত মানুষ প্রতিদিন ছেলের কাছে আসে। তাই ঘরের এই বেদনার কথা, যাতে তাঁদের কানে না যায় হেমন্তশশী সেদিকে গভীরভাবে নজর রাখতেন।

একটি মাত্র ছেলে—আমিও একা—তাই স্বইচ্ছায় আমি ছেলের সংসারের সব ভার নিজে বহন করে ছেলে-বউদের সংসারে শান্তি আনবো—কিন্তু কপালে আমার তা সহ্য হল না। বিধাতার কি ইচ্ছা—জানি না!—এসব কথা ভাবতে ভাবতে একদিন হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে ডেকে বললেন, আমায় পাঠিয়ে দে, যেমন করে হোক আমি একা একা থেকেই বাকীটা দিন কাটিয়ে দেবো। আর যা দেবার তাই দিস।

অতুলপ্রসাদ বিড়ম্বিত হলেন। 'মা'কে ছেড়ে অতুলপ্রসাদের থাকাটাই দুঃখজনক হবে। তাই মাকে বারণ করলেন। কিন্তু হেমন্তশশী বলেন, না অতুল, আমায় বাধা দিস না। আমি এখানে থাকলে তোদের সুখ হবে না। বলতে বলতে হেমন্তশশীর চোখ দুটো জলে ভেসে গেল।

হেমন্তশশী চলে গেলেন—তার যাবার সময় হেমকুসুম দরজায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে মা-ছেলের বেদনাবিদ্ধ হৃদয়ের কাতরতা দেখলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত, বিরক্ত—অনেকটা অবসন্ন। বাড়ী থেকে মা অপমান ভাবনায় চলে গেলেন—এই বেদনাই অতুলপ্রসাদকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করছে। সংসারে মন নেই, স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার আগ্রহও কমে এসেছে। নিজেকে শুধু কাজ আর কাজের মধ্যে ফেলে রাখছেন—মামলা-মকদ্দমার কাগজপত্তর—গান সুর—সেবার কাজ ইত্যাদিতে অবসর সময় কাটিয়ে দেন। বাড়ীতে যতক্ষণ থাকেন ভালে লাগে না—মা নেই, মা চলে গেলেন, মা অপমানে চলে গেলেন—এই সব কথা ভাবতে ভাবতে অতুলপ্রসাদ আর হেমকুসুমের মাঝে একটা দেয়াল যেন অদৃশ্যভাবে উভয়ের অজান্তে দাঁড়িয়ে গেল।

এদিকে লখনউ-এর বিভিন্ন স্তরের মানুষের প্রয়োজনে অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে ভীড় লেগেই আছে। হেমকুসুমের তা একেবারেই পছন্দ নয়। তিনি বিরক্তও হন।

হেমকুসুম অসুস্থতার কারণে প্রায় প্রতিদিন কখনো একা কখনো বা মহেশবাবুর সঙ্গে গোমতীর তীরে তীরে ঘুরতে যান। তিনিও মানসিক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করছেন। মুখে কিছু না বললেও আচরণে তা বুঝিয়ে দিতেন—অতুলপ্রসাদের কাজগুলি তার পছন্দ নয়।

এমন অনেক রাত্রি এসেছে—দু'জন দু'জনকে একেবারেই বিপরীতমুখী করে অনাহারে কাটিয়েছেন—কথা নেই, খাবার নেই, দু'জন দু'পথের—কেউ কারুর জন্য নয়।

অতুলপ্রসাদ স্থির-সংযত। তা সত্ত্বেও মাঝে মাঝে ভাবেন, কখনো বা কাঁদেন, একদিন তিনি বলেই ফেললেন,—

হেম, তোমাতে আমাতে আর একসঙ্গে থাকা সম্ভব হবে না। ভালবাসা নেই। নেই নির্ভরতা। তাই তোমার আমার আলাদা থাকা দরকার। তোমার যা খরচ লাগবে আমি দেব—। একটু থেমে বললেন,—মাকে চলে যেতে হল তোমার জন্য। আজ বুঝছি, আমাদের বিয়েটার ব্যাপারে তোমার ও আমার আত্মীয়দের কেন আপত্তি হয়েছিল—যাক্ সে সকল কথা... তোমাতে আমাতে যে অশান্তি দিন দিন বাড়ছে তা থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই।... আমার আত্মীয় পরিজনদের তুমি সহ্য করতে পার না—আমার কাছে যারা এখানে আসেন নানাকাজে তাও তোমার পছন্দ নয়। গানের ব্যাপারে আমার কাছে যারা আসেন—সেই সকল মেয়েদের *আসা যাওয়া তোমার পছন্দ নয়—এ নিয়ে তোমার মনে যে ঝড় উঠে তা আমি* জানি।...

হেমকুসুম বুদ্ধিমতী, শিক্ষিতা। সাময়িক কিছু মানসিক উত্তেজনায় দিগ্‌বিদিক শূন্যতার কোপানলে যে সকল কথা ও আচরণ করেছে তা যে সঙ্গত নয়, অমার্জিত—বুঝতে পারলেন—। তখন কিছুমাত্র বিলম্ব না করেই খানসামাদের হাত থেকে দিন রাত্রির আহারের সব ব্যবস্থা নিজের হাতে নিয়ে নিলেন—ভাল মন্দ, যা অতুলপ্রসাদ ভালবাসেন—তার জন্য নিজেই উদ্যোগ গ্রহণ করে তার 'অতুলের' কাছে নিয়ে যায়। পাশে বসে অত্যন্ত আন্তরিক পরিচ্ছন্ন আকুতিতে অতুলপ্রসাদের অতি নিকট সান্নিধ্যে যত্ন সহকারে খাবার পরিবেশন করেন—পোযাক-পরিচ্ছদ কাছে এনে দেন—হাত দুটো নিজের বুকের কাছে রেখে অতুলপ্রসাদের রচনা করা গান গেয়ে অতুলপ্রসাদের সেই 'হেম'কে ফিরিয়ে আনে হেমকুসুম। ঘরের সব স্তব্ধতা তখন উভয়ের অন্তর-ধারার উৎফুল্লতায় ভরে উঠে।

অতুলপ্রসাদ আবার হেমের কাছে এসে চোখে চোখ রেখে ডুবে যায় হেমের অন্তর থেকে হারিয়ে যাওয়া 'অরূপরতনের' খোঁজে। হঠাৎ অন্তরে প্রেমের মধুঝরা গন্ধে বিভোর হয়ে কি একটা অধরা আনন্দে হৃদয়-মন-সমস্তটাই যেন সুরের সন্ধানে ঘিরে রয়েছে চোখ দুটিতে। হঠাৎ গেয়ে উঠলেন—

কে গো তুমি আসিলে অতিথি মম কুটিরে?
কবে যেন দেখেছি তোমারে আমি

কুঞ্জ-কুসুম হাতে ফিরিতে যমুনা-তীরে।
ও দুটি নয়ন-মণি চিনি যে গো আমি চিনি
কাজল মধুপ-ছায়া দেখেছি ফুল-শিশিরে!
জানি ও উজলহাসি, বিষাদ-তামস-নাশী,
দেখেছি বঙ্কিম ধনু নীল-নীরদ-নীরে।
হৃদয় মাধুরি তব কী অতুল, অভিনব!
দেখিনি হেন বিভব, হৃদয় আসে না ফিরে।
আমার কুসুম বীথি সফল করো অতিথি
লহো পূজা নিতি নিতি ভগন মনোমন্দিরে।

এদিকে সহকর্মী ব্যারিস্টার মমতাজ হোসেনের সহযোগিতায় বার কাউন্সিলের সভাপতি করা হল অতুলপ্রসাদকে।

অতুলপ্রসাদ চোখ বুঁজে পরম করুণাময় ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন এবং মা হেমন্তশশীকে দু'চোখের জলে অদৃশ্য অধরা চরণে প্রণাম জানালেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বাড়ীতে লোকজনের সমাগম লেগেই আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সভাপতি পদে অতুলপ্রসাদের নির্বাচন সে এক আনন্দঘন মুহূর্ত।

দুঃস্থ বস্তীবাসীর চিকিৎসা, নিঃস্ব অসহায় পিতার কন্যাদায় উত্‌রে দেওয়া থেকে আরম্ভ করে অতুলপ্রসাদের কত কাজ! কত লোকজনের সঙ্গে দেখা করা! এরই মধ্যে গান শেখাচ্ছেন—

কত গান তো হল গাওয়া,
আর মিছে কেন গাওয়াও?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে কেন মিছে চাওয়াও?
যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও?
যদি সন্ধ্যা হলে বেলা
নাহি মিলে তব বেলা,
পথভোলা মোর ভেলা

এ অকূলে কেন বাওয়াও?
যদি আমার দিবারাতি
কাটি যাবে বিনা সাথি
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথপানে শুধু চাওয়াও?
বড় ব্যথা তোমার চাওয়া;
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

এরই মধ্যে সরলা দেবী চৌধুরানী এলেন লখনউতে। অতুলপ্রসাদ ছুটে গেলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে—তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। অতুলপ্রসাদ অনুরোধ জানালেন, 'বন্দেমাতরম' গান গাইবার জন্য। সে এক পরমক্ষণ, আনন্দ-অমৃত ক্ষণ! সরলা দেবী উদাত্ত কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম' গাইলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯১১ সালে অতুলপ্রসাদ হেমকুসুম ও পুত্র দিলীপকুমারকে সঙ্গে নিয়ে লখনউ-এর একটি মামলার ব্যাপারে আবার বিলেতে যান। মা হেমন্তশশী তখন কলকাতায়। বিলেতে সেই সময় স্যর কে. ডি. গুপ্ত সপরিবারে। দিলীপকুমার মাতামহের কাছেই বেশী সময় থাকতেন এবং ইত্যবসরে অতুল-হেম দু'জন দুজনকে একান্তভাবে কাছে পেয়ে আনন্দিত-মুগ্ধ। সঙ্গীত আর ঘুরে বেড়ানোই ছিল একমাত্র নেশা। হেমকুসুম অতুলপ্রসাদকে কাছে পেয়েও যেন পুরোটা পেতেন না—এমন একটা অতৃপ্তির যন্ত্রণা মাঝে মধ্যে নানা কথাবার্তায় প্রকাশ পেত। অতুলপ্রসাদ তা শুনতেন—'ভোলো' মনের আউলে নিজেকে ছড়িয়ে দিতেন—যুক্ত হতেন আবার সেই জন্মগত সেবা ও কাজের আনন্দে। হেমকুসুমের আর্তি তাঁকে তেমনভাবে প্রভাবিত করতে পারত না।

জেদী হেমকুসুমের অন্তরে এই আঘাত তীব্রভাবে পুঞ্জ পুঞ্জ ক্ষোভের বীজকে বারবার উপ্ত করত।

বিলেত থেকে ফিরে (১৯১২) আসার পর পরই হেমকুসুমের ক্ষোভ-বীজ আগুনে পরিণত হল—অশান্তির ঘনঘটা উভয়ের অন্তরে দৈনন্দিন জীবনের ছোটোখাটো ঘটনায় এত তীব্র হয়ে উঠত যে উপাসনায় উপস্থিত স্থানীয় বন্ধু-বান্ধবরা বিব্রত হতেন এবং অশান্তির অবসানের জন্য চেষ্টা করতেন।

অতুলপ্রসাদের কাছে নিয়মিত যাঁরা আসতেন, তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—সৌম্যকান্তির দ্যুতিতে উজ্জ্বল এবং ইংরাজী সাহিত্যে পণ্ডিত—অতি অল্প সময়ের মধ্যে হেমকুসুমের স্নেহ-ভাজন হয়ে উঠলেন। অতুলপ্রসাদ মহেশচন্দ্রকে দিলীপকুমারের গৃহশিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। মহেশচন্দ্র অল্প সময়ের মধ্যে অতুল-গৃহের একজন শুভানুধ্যায়ী হয়ে উঠলেন। মহেশচন্দ্র হেমকুসুমকে 'বৌঠান' বলে ডাকতেন। হেমকুসুমও মহেশচন্দ্রকে ছোট ভাইয়ের মত আদর-যত্ন করতেন।

মহেশচন্দ্রকে কাছে পেয়ে অতুলপ্রসাদ তাঁর সারাদিনের কাজ—ব্যারিস্টারী, সাহিত্য সভা, সেবা-কাজ প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে বেশী সময় দিতে পারতেন। সে' সময় লখনউতে অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করে বুদ্ধিবাদীদের একটি আড্ডা গড়ে উঠেছিল—যার মাধ্যমে উত্তর-প্রদেশের ইন্‌টেলেকচুয়ালরা প্রায়শঃই একত্রিত হতেন। উর্দু কবি ব্রিজনারায়ণ চাকস্ত, বিষণ নারায়ণ দত্, ব্রহ্মানন্দ সিনহা, হামিদ আলি খাঁ, অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুশরণ চৌধুরী, শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলচন্দ্র দে, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ বল, বিদ্যাপতি ভট্টাচার্য, সুধীরকুমার সেন, রাজনারায়ণ শুক্লা, সি-ওয়াই-চিন্তামণি আরো অনেকে প্রায় প্রতিটি সাহিত্য সভায় উপস্থিত থাকতেন। সাহিত্য-আসরে রবীন্দ্রনাথ-বঙ্কিমচন্দ্র এবং তাঁদের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা বেশী হত। অতুলপ্রসাদ নিজে গান রচনা করতেন ও গাইতেন। তাঁর গান সম্পর্কেও বিশদ আলোচনা চলত। অতুলপ্রসাদ নিজের রচনা লিখে রাখতেন না—শ্রোতারা অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে শুনে চিরকুটে লিখে রাখতেন। এমনি একটি সাহিত্য-আসরে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

সাধে কি মা তোরে ডাকি!
সাথের সাথী সব গিয়েছে, বিজন পথে একা রাখি।
মা তোরে আমি চাইনি বলে সবাই ফেলে গেছে চলে,
বাঁধব বলে বসে আছি হাতভরা মোর রৈল রাখী।
আনতে সাধের হরিণ ধরে, হারিয়েছি মা যা ছিল ঘরে,
আজ সুখের মায়া সোনার কায়া
খুব আমারে দেছে ফাঁকি।
নয়নে আজ এসেছে জল, খুঁজে পাইনে এখন আঁচল.
চিরদিনের বলে যে আঁচলে, নিঃশেষিয়ে মুছব আঁখি।
তুই বুঝি মা দয়া করে, আমার সকল পুঁজি নিলি হরে,

যদি একে একে মন নিলি মা,
আমায় কেন রাখলি বাকি।

দু'চোখ ভাসানো অতুলপ্রসাদের এই আকুতি গভীরভাবে তাঁর সজন-বন্ধুদের আবিষ্ট করেছিল। গানটি সাহিত্যবাসরে উপস্থিত সুজনবৃন্দ অনেকেই প্রায়ই নানা অনুষ্ঠানে গাইতেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ সে সম্পর্কে ছিলেন একেবারেই উদাসীন। তাই তাঁর সম্পাদিত 'গীতিগুঞ্জে' এই গানটি সংকলিত দেখা যায়নি। গানটি অপ্রকাশিত থেকে যায়। এইভাবেই অতুলপ্রসাদের অনেক গান হারিয়ে গেছে যার হদিস তিনিও দিতে পারেন নি।

উর্দু কবি হামিদ আলি খাঁ অতুলপ্রসাদের প্রিয় বন্ধু। হামিদ আলি বন্ধু অতুলপ্রসাদকে 'মুসায়েরা' তে নিয়ে যান—সেখানে মুখে মুখে কবিতা গানের সুরে পরিবেশন দৃশ্য অতুলপ্রসাদকে গভীরভাবে মুগ্ধ করেছিল। এই ধরনের 'মুসায়েরা'র আসরে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত থাকতেন। 'মুসায়েরা' অনেক রাত্রিতে শেষ হত—ক্লান্ত অথচ উদ্‌বোধিত অতুলপ্রসাদ ঘরে ফিরতেন—কানে ও প্রাণে সেই 'মুসায়েরা'র ধ্বনি গুন্ গুন্ করত। বেশি রাতের অতুলপ্রসাদের ঘরে ফেরা—হেমকুসুমের পছন্দ নয়—তিনি তাতে শুধু বিরক্ত হতেন না—গঞ্জনাও দিতেন। অতুলপ্রসাদ অবসন্ন-স্নিগ্ধচ্ছন্ন নয়নে প্রীতির ছটায় তা' ফিরিয়ে দিতেন।

গান পাগল মজলিসী অতুলপ্রসাদ। হেমকুসুমও গান-বাজনা ভালবাসেন, চর্চা করেন। কিন্তু তা অনেকটা তাঁর মেজাজের উপর নির্ভরশীল। অতুলপ্রসাদের দিন-ক্ষণ নেই। কোন তালিম আয়োজনের প্রয়োজন হয় না। গানের আসর—গান শুনতে চান—জানামাত্রই অতুলপ্রসাদের হৃদয়বীণার সুর-তরঙ্গের লহরী জেগে উঠে। গানের সমজদারদের অতুলপ্রসাদ সব উজাড় করে দিয়ে গানের সুরে তাদের একাকার করে তৃপ্ত হন। মাঝে মাঝে ওস্তাদ মুন্নে খাঁ অতুলপ্রসাদের বাড়ী এসে আতরের ফোয়ারায় তানপুরায় কলগুঞ্জনে বিভোর হতেন—আসতেন **হারমোনিয়াম বাদক ঠাকুর নবাব আলী, সেতারী বরকৎ আলি, ওস্তাদ আহমেদ খলীফ খাঁ, দেবেন্দ্রনাথ সেন**। শুধু গান আর গান—কত রাত্রি অতুলপ্রসাদ নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন সুরোলোকের সুরবালাদের সান্নিধ্যে। মজলিসী মানুষ অতুলপ্রসাদ—মানুষের পরশে ধন্য অতুলপ্রসাদ, আড্ডা-প্রিয় অতুলপ্রসাদ—সারাদিনের বৈষয়িক নানাবিধ জটিল কাজের ফাঁকে নিজের মধ্যে নিজেকে খুঁজে নিতেন। সেই খোঁজার বিরাম নেই অতুলপ্রসাদের জীবনে।

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসী থাকে?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডেকে সে আজ ডাকে।

ঘরের চাবি যখন বন্ধ, তখন নিঃসঙ্গ অতুলপ্রসাদ একলা প্রাণের আকুতিতে বিভোর—সেখানে শুধু গান আর গান, নিবেদনে নিঃশেষ হবার চরম আকাঙ্খা।

আকাশ, বল-রে আমায় বল, আমার আঁখি-জল
তাদের মতো জীবনখানি করবে কি শ্যামল—
আমায় বল্ রে!
আমি তাদের মতো আমার বঁধূর সনে মধুর খেলা
খেলব কি দিনের শেষে?
ও আকাশ, বল্ আমারে।

সুরের ভেলায় গানের কথায় অতৃপ্ত প্রাণ নিজের খোঁজে দিশেহারা। নিজেকে ছড়িয়ে ছড়িয়ে একাকারের মধ্যে আপন কান্নার আলোড়ন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

পয়সার অভাবে দুঃস্থ-দুঃস্থাদের চিকিৎসা হয় না—ছুটলেন অতুলপ্রসাদ, রোগীর পাশে বসে হৃদয়ের সব মমতা ঢেলে দিয়ে দু'হাতে আদর করেন এবং সবার অজান্তে রোগীর বিছানার বালিশের নিচে টাকা গুঁজে দিয়ে চলে যান। কৃপাপ্রার্থী অনাথ বিধবাদের জন্য ব্যথাতুর প্রাণ কাশীতে একটি বিধবা আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

সেসময় লখনউ-এর গোমতী নদীর বন্যা। নিঃস্ব দরিদ্র অসংখ্য মানুষের কুঁড়েঘর বন্যায় ভেসে যায়। বৃহৎ-প্রাণ, কোমল-প্রাণ অতুলপ্রসাদ ছুটে গেলেন সেই সব অসহায় মানুষদের পাশে—পড়ে যাওয়া বাড়ীঘর থেকে তাঁদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাবার জন্য নিযুক্ত ছাত্রদের নেতৃত্ব দিলেন দিন রাত। ঘরের কথা, হেমকুসুমের কথা ভুলে গেলেন—বন্যার্তদের কাপড়-জামা-খাবার সংগ্রহ করা এবং গৃহহারাদের পৌঁছে দেওয়া। বিশ্রাম নেই—রাত-দিন শুধু সেবা কাজে অবিরাম ছুটাছুটি। এ সব কাজে অতুলপ্রসাদ পথে নামলেন—সাহায্যের জন্য! রাস্তায় দাঁড়িয়ে গান গেয়ে গেয়ে অর্থ সংগ্রহ করলেন অতুলপ্রসাদ।

ওরে পুরজন, দাও কিছু ধন
প্লাবন পীড়িত জনে,
তব দেশবাসী, করে হাহাকার
অন্ন-গেহ-বিহনে।
শিল্পী ও চাষি কত গেছে ভাসি
দারুণ এ শ্রাবণে,
আশ্রয়হীন বস্ত্রবিহীন

মৃত্যু মাগিছে মনে।
(আর সইতে নারে, বলে হা বিধাতা)
কাঁদিছে জননী কোলের বাছানি
যায় বুঝি অনশনে।
কে আছে মা, ঘরে, দাও স্নেহভরে,
বাঁচাও শিশুরে প্রাণে।
(ওগো স্নেহময়ী, ওগো শিশুর মাতা)
তব ভাইবোনে হরিবে শমনে,
সহিবে বলো কেমনে?
দাও কিছু দাও, বিপন্নে বাঁচাও
সুখী করো নারায়ণে।।

কীর্তনের সুরে নয়নের ধারায় শব্দগুলি সিক্ত করে চারণ কবি পথে পথে আর্তি জানিয়ে পথিক অতুলপ্রসাদ যে অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতার সাথে বর্ণনা করা হয়েছে। লখনউ-এর আপামর জন-সাধারণ, ছোট বড় সকলের হৃদয়-রাজা অতুলপ্রসাদ, ভাইদাদা-ভাইসাহেব, সেন সাহেব—সব পথ সেই বাউল, দীনের দীন অতুলপ্রসাদের দিকে ছুটে চলেছে। রিক্সাওয়ালার গানে, ভিখারী আখতারউদ্দিন তার একমাত্র অবলম্বন বেহালার সুরে—সেই অতুলপ্রসাদের আর্তিভরা উদীপ্ত সঙ্গীতের মূর্ছনা। 'ওহে পুরবাসী, করো দুঃখীর সেবা' এমন করে এর আগে কেউ মানুষের জন্য মানুষের কাছে নেমে আসেনি লখনউ শহরে।

শুধু বন্যাপীড়িতদের জন্য নয়—নিরক্ষর বস্তীবাসীদের অক্ষরজ্ঞান দেবার কাজে, দুঃস্থ ছাত্রদের পড়াশোনায় সাহায্য দেবার কাজে, ভ্রাতৃবিরোধ-গৃহবিবাদ নিরপেক্ষ ভূমিকায় মিটমাট করার কাজে, শিক্ষা সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচার কাজে সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থা গ্রহণের নিরন্তর কর্ম্মমুখর অতুলপ্রসাদ। সারাটা জীবন অসহায় ও শোকার্তদের পাশে থাকার অঙ্গীকার পালন করেছেন, সঙ্গী হয়ে সম-ব্যথায় কেঁদেছেন—কিন্তু তাঁর নিজস্ব নিঃসঙ্গতায় অতুলপ্রসাদ নিতান্ত একা, একান্তভাবে একা

সেবাব্রতী অতুলপ্রসাদকে লখনউ-এর সর্বস্তরের মানুষ একান্তভাবে আপন করে চায়—অজাতশত্রুর নিবিড় সান্নিধ্য চায়। সময়ে-অসময়ে অতুল-নীড় সবার জন্য খোলা—। স্বামী-স্ত্রীর নিজস্ব কথাবার্তাও অনেকদিন পুরোপুরি শেষ হতে না হতেই অতুলপ্রসাদকে বাজপাখীর মত ছিনিয়ে নিয়ে জন-অরণ্যের মধ্যে ছুটে যেতে

হয়েছে বাইরে—সকলের আহ্বানে। হেমকুসুম তাতে অপ্রসন্ন-ক্ষুব্ধ-বেদনাতুরা। আপন প্রিয়জনের উপর অধিকার কতটুকু—এই প্রশ্ন যখন তাঁর চিত্তকে কুঁকড়ে দিচ্ছে তখনই বিদ্রোহিনী বিদ্রোহ করেন—বিবাদের বহ্নিজ্বালায় পুড়তে থাকে সরলহৃদয়া মার্জিত-রুচি-সম্পন্নার সকল কোমল বৃত্তিনিচয়—ফেটে প্রকাশ পায় দোষারোপের সীমাহীন বাক্যবাণ। কথা বন্ধ হয়ে যায়—অসীম নীরবতায় উভয়ের বেশ কটা দিন ঘরের বার্বুচি ও খানসামাদের মাধ্যমে চলে।

আবার হঠাৎই বিষাদের কুয়াশা কেটে যায়—হেম অপেক্ষা করেন অতুলের জন্য। পিয়ানোতে অতুলের গানের সুর তোলেন-মধুযামিনী। লখনউ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের ৫ জন ভাইস-চেয়ারম্যানের একজন অতুলপ্রসাদ—এ যে কী আনন্দ হেমকুসুমের! তা' বোঝানো যায় না। সারাদিন-রাত অতিথি-অভ্যাগতদের পরিতুষ্টি করা—তারই মধ্যে অতুলপ্রসাদের পোশাকাদির জন্য মনঃসংযোগ করা।

আবার অন্যদিকে দেশবরেণ্যরা লখনউতে এলে অতুলপ্রসাদের কাছে আসেন—রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিষয়ে আলোচনা করেন। অতুলালয়ে তাই কর্মতৎপরতা তুঙ্গে। রাজনীতিতে অতুলপ্রসাদ উদারপন্থী—তবে স্পষ্ট কথা বলতে এতটুকু পিছপা হতেন না। জাতীয় নেতাদের অনেকের সাথেই অতুলপ্রসাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল—একদিকে **সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, শ্রীনিবাস আয়ঙ্গার, তেজবাহাদুর সপ্রু, সি-ওয়াই চিন্তামণি—অপরদিকে লালা লাজপৎ রায়, মহম্মদ আলী, সোকৎ আলী, মদনমোহন মালব্য, সরোজিনী নাইডু, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী** প্রভৃতিগণের সাথে নানাবিষয়ে আলোচনা হত।

লোকমান্য তিলক বন্দী হলেন। দেশজুড়ে তার প্রতিবাদ ঝড় বইতে লাগল—অতুলপ্রসাদও বিপর্যস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘরে ফিরে হেমকুসুমকে তিলকের বন্দী হবার সংবাদ দিলেন। হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিনই অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে অতিথি। অতুলপ্রসাদ যথাযথভাবে হেমকুসুমের সহযোগিতায় বরেণ্যদ্বয়দের আপ্যায়ন করলেন—পরে অতুলপ্রসাদ আপন সত্তার ব্যাকুলতায় গেয়ে উঠলেন—

কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী!
ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী,
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙ্গালিনী;
দীনবেশ তব হেরিয়া জননী,

নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি
স্বার্থ-মোহে মোরা সদাই হতজ্ঞান,
আপন দোষে মোরা হারাই নিজ মান।
ভায়েরে ঘৃণা করি, করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপা-ভিখারি।
আপন ধন পদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতি-পূজা জানাই তোমায়;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায়
যে পদ ধৌত করে জাহ্নবী-বারি।

গানটি গাইতে গাইতে অতুলপ্রসাদ নিজেকে এমনভাবে নিবিষ্ট করেছিলেন যে বিপিনচন্দ্র পাল এগিয়ে অতুলপ্রসাদের কাছে এসে বললেন,—ইন্‌টেলেকচুয়ালদের অন্তরে এর প্রভাব অবশ্য জাগবে।

সেদিন বারদুয়ারীতে বুদ্ধিজীবীদের জমায়েত করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। বিপিনচন্দ্র পাল বৈষ্ণবধর্মের রসতত্ত্ব ও ভাবতত্ত্ব সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভাষণের পর উপস্থিত শ্রোতাদের কাছ থেকে ভারতের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি এবং গান্ধীজীর ভূমিকা সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পালের অভিমত জানতে চান। বিপিনচন্দ্র পাল সময়ের অভাবে ঐ দিনই তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন, প্রশ্নের উত্তর দেন নি। তবে গান্ধীজীর ভূমিকায় ভারতের রাজনীতির পট-পরিবর্তনের কথা বলেন।

গান্ধীজী সম্পর্কে শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা তখন থেকে খুবই গভীরভাবে অতুলপ্রসাদের চিত্তকে প্রভাবিত করছিল। লখনউ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিকল্পনায় অতুলপ্রসাদ লখনউবাসীর বিশেষ করে দরিদ্র-বস্তীবাসীদের জীবন-যাত্রার প্রতি গভীরভাবে মনসংযোগ করেছিলেন। মুচি-মেথর-সমাজে, অনুন্নত শ্রেণীর পল্লীতে নিজে গিয়ে নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তা পরিষ্কার, জল পরিশোধনের ব্যবস্থা—সর্বোপরি একটি 'সুস্থজীবন' অতিবাহনের পরিবেশের জন্য, যা যা প্রয়োজন—অতুলপ্রসাদ তাতে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এমন ধারার কাজ ও সেবা ইতোপূর্বে লখনউ তথা ভারতের কোন শহরে কোন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায় নি। 'হরিজন সেবার' কথা তখনও ভারতবর্ষে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি—কেউ তেমন করে ভাবেও নি। মাতা হেমন্তশশীর আদর্শে এবং পিতা রামপ্রসাদ সেনের কর্মপ্রবর্তনায় এবং সর্বোপরি মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের সর্ব-মানুষের সেবার জাগ্রত-প্রেরণা সেদিন অতুলপ্রসাদকে ব্যারিস্টারীর বৈভব অতিক্রম করে অবহেলিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করেছিল। বহু

রাত-দিন অতুলপ্রসাদ তাঁদের সাথে থেকে থেকে তাঁদের বাসস্থান—স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থা তদারকি করতেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন গান্ধীজীর চরম সার্থকতা **অহিংস সত্যাগ্রহের**। সর্বত্র তাঁর নাম, তাঁর আদর্শ অনুসরণের ব্যাকুলতা। ভারতে প্রত্যাবর্তন করার পর গান্ধীজী একদিকে কংগ্রেস রাজনীতির প্রবক্তা হয়ে সর্বত্র জন-জাগরণের কথা বলছেন, অপর দিকে অনুন্নত অবহেলিত হরিজনদের সেবার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন। সারা ভারতের বিভিন্ন স্থানে গান্ধীজীর উপস্থিতি এক অভাবনীয় সাড়া ও জাগরণের প্রভাব পরিলক্ষিত। লখনউতে গান্ধীজী এলেন, অতুলপ্রসাদ ব্যগ্র চিত্তে সম্মানের সঙ্গে তাঁকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে এলেন। **লখনউ আসার আগে গান্ধীজী অতুলপ্রসাদের হরিজন সেবার কথা শুনেছিলেন, ভারতে এর আগে কেউ তেমনভাবে সেই কাজ করেনি;** তাই গান্ধীজীও গভীর আন্তরিকতায় এবং শ্রদ্ধায় অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের আতিথ্য স্বীকার করলেন। অতুল-আলয় থেকেই গান্ধীজী লখনউ-এর হরিজন পল্লী ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন এবং বক্তৃতার কাজ করেছিলেন। অতুল-আলয়ে থাকাকালীন গান্ধীজী অসুস্থ হন। হেমকুসুম গান্ধীজীর সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নেন। অতি নিষ্ঠা ও শ্রমে গান্ধীজীর আরোগ্য-যজ্ঞে নিজেকে নিযুক্ত করেছেন গভীর আন্তরিকতায়। গান্ধীজী সুস্থ হলেন—অতুলপ্রসাদ-হেমকুসুম বিধাতার চরণে নিজেদের আকুতি জানিয়ে তৃপ্ত হলেন। একদিন সন্ধ্যায় লখনউ-এর গণ্যমান্য সর্বস্তরের ও ধর্মের মানুষরা এলেন অতুল-ভবনে গান্ধীজীর সাথে দেখা করতে। হেমকুসুম সেসময় গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে পিয়ানো বাজিয়ে রবীন্দ্রনাথের একটি গান গাইলেন—

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব!

সুখে-দুখে-শোকে -আঁধারে-আলোকে চরণে চাহিয়া রহিব।।
কেন এ সংসারে পাঠা'লে আমারে তুমিই জান তা প্রভু গো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।।
যদি বনে কভু পথ হারাই, প্রভু, তোমারি নাম লয়ে ডাকিব
বড়োই প্রাণ যবে আকুল হইবে চরণ হৃদয়ে লইব।।
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব, তোমারি কার্য যা সাধিব
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে, বিরাম আর কোথা পাইব।।

গান্ধীজী মুগ্ধ, অভিভূত—কিছুক্ষণ নীরবে থেকে তিনি বললেন, সুর ও শব্দের ধ্বনিতে কিছু কিছু বুঝেছি। উপস্থিত আর সকলেই গান্ধীজীকে লক্ষ্য করছিলেন।

হেমকুসুমের সেবায় তিনি আনন্দিত। পুলকিত হৃদয়ে তিনি অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুম উভয়ের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, 'Selfless survice itself is worship!'

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন, সময়টা ১৯১৩। বাঙলা তথা ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে পরাধীন ভারতে এ এক চমকপ্রদ ঘটনা। সমগ্র জাতি গর্বিত, সাহিত্য-মনস্ক মানুষ পুলকিত। অতুলপ্রসাদের ভাব-গুরু রবীন্দ্রনাথের এই বিশ্বজয়ী সম্মানের শ্লাঘা এত বেশী জেগেছিল তাঁর চিত্তে, যা' তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্য একটি গান রচনা করলেন—যা তিনি প্রতিদিন, প্রতি সন্ধ্যায় জপ করতেন, উদাত্তকণ্ঠে কখনো বা আনন্দঘন হৃদয়-সঞ্জাত ব্যাকুলতায় নিজের মধ্যেই গুন্ গুন্ করে গেয়ে তৃপ্তি লাভ করতেন। একান্ত নিজস্ব মন্ত্রের পূজা, একান্ত আপন মন্ত্রে গুরু বন্দনা—

মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাঙলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা

তারপর যুক্ত করলেন—

বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে!
গরব কোথায় রাখি গো?
তোমার চরণতীর্থে আজি—
জগৎ করে যাওয়া আসা!

একটি ভাষা, মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে এমন গান, এমন হৃদয় উজাড় করা মমতার অঞ্জলি এর আগে কেউ শুনেছেন কিনা জানা নেই। অতুলপ্রসাদ প্রতিদিনের গুরু পূজা—মাতৃভাষার বন্দনা, নিজের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে গাইতেন- বেদমন্ত্রের, ঊষা বন্দনার মতই অনুরাগ ও ভক্তিসিক্ত আকুতিতে। প্রকাশ্যে এই গানের তেমন একটা প্রচলন ছিল না। এ যে অতুলপ্রসাদের আপন-সত্তার উৎসারিত বীজমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন অতুলপ্রসাদ নোবেল পুরস্কারের গৌরবান্বিত মুহূর্তকে গানের মধ্য দিয়ে চিরকালের জন্য ধরে রেখেছেন—কিন্তু তখনও পর্যন্ত নিজে তা শোনেননি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলন অতুলপ্রসাদ

সময়টা ১৯১৪।

রবীন্দ্রনাথ তীর্থপরিক্রমা সেরে রামগড় পাহাড়ে বিশ্রাম যাপন করবেন— অতুলপ্রসাদের কাছে আমন্ত্রণপত্র এল সেই রামগড়ে চলে আসার। সে কি পুলক! সে কি অবিশ্বাস্য বিশ্বাস-অভাবনীয় আনন্দের দিশাহারা চিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সেই রামগড়ের মুহূর্তের জন্য। অতুলপ্রসাদ ছুটলেন—গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতুলপ্রসাদের উপস্থিতি যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে বর্ষার পূর্বাভাষের স্নিগ্ধতা। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে শুধু ভালবাসতেন না, সহমর্মি বন্ধুর 'সান্নিধ্য লাভের কাঙালপনা' কবির জীবনে বেশ কিছুটা অংশ জুড়েছিল। অতুলপ্রসাদ ব্যারিস্টার, সমাজসেবী—লখনউ-এর মুকুটহীন সম্রাট, কিন্তু তিনি যে হৃদয়ের কুসুম শোভায় গানের অঞ্জলি নিয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাই হৃদয় হৃদয়কে জড়াতে চায়, রবীন্দ্রনাথ তাঁর কনিষ্ঠ প্রিয়জন, আত্মার আত্মীয় অতুলকে ডেকে নিলেন রামগড়ে একান্তভাবে সাংসারিক দেনা-পাওনার বাইরে প্রতিদিনকার ব্যবহৃত শব্দের কোলাহল মুক্ত প্রকৃতির কোলে। সীমাহীন পুলকিত আনন্দে অতুলপ্রসাদ সাড়া দিলেন, সর্বস্ব অঞ্জলিবদ্ধ করে রামগড়ে এলেন। 'হৈমন্তী' নিবাসে রবীন্দ্রনাথ। বদরিক আশ্রম থেকে ফিরে এই "হৈমন্তী" বিশ্রামাবাসে রবীন্দ্রনাথ, পুত্র-পুত্রবধূ, দীনেন্দ্রনাথ, সি. এফ. এন্‌ড্রুজ—আর লখনউ-এর অতুলপ্রসাদসহ আরো অনেকে। গল্প সম্রাটের নেতৃত্বের আসরে প্রায় প্রতিদিনই গানের জমজমাট—রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ আর দীনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই রামগড়ে প্রায় প্রতিদিন নূতন নূতন গান রচনা করছেন; তাতে সুর দিচ্ছেন—দীনেন্দ্রনাথ গাইছেন। নূতন নূতন গান ও সুর, সুর ও গান যেন অতুলপ্রসাদকে আগ্রহের চূড়ান্ত পর্যায়ে তৃষাতুর করে রাখতো সারাক্ষণ, পিয়াস মেটে না। নূতন গান শেষ হতে না হতেই আবার পুরনো গানের সংযোজন, শুধু গান আর গান। অতুলপ্রসাদের হৃদয় যেন ভরে উঠল। রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে কাঙাল হয়ে অতুলের কাছে গান শুনছেন, 'আমার আশা মেটাও, অতুল'। এ যে পরম সুযোগ, হাতছাড়া করতে নেই। অতুল গানের ঝুলি খুলে দিয়ে গাইতেন অসংখ্য গান-গান আর গান; বনমালি যতক্ষণ না খাবারের কথা বলেন।

অতুলপ্রসাদের অনুনয়ে রবীন্দ্রনাথ সদ্যরচিত গান-সুরে ভিজিয়ে গাইলেন—

এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর!
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষুদুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর সুন্দর হে সুন্দর।।

এই তোমারি পরশরাগে চিত্ত হল রঞ্জিত,
এই তোমারি মিলনসুধা, রইল প্রাণে সঞ্চিত
তোমার মাঝে এমনি ক'রে নবীন করি লও যে মোরে
এই জনমে ঘটালে মোর জন্ম-জন্মান্তর সুন্দর হে সুন্দর।।

রবীন্দ্রনাথ এই গানটি যখন রচনা করে গুন্‌গুন্ করে নিজেই গাইছিলেন তখন রামগড়ের পাহাড়ের ঊষালোকে রঞ্জিত-প্রকৃতির প্রফুল্লতায় গানের শব্দ ও সুর মিশে এক অনির্বচনীয় পরিমণ্ডলের আস্বাদন সেদিন অতুলপ্রসাদ পেয়েছিলেন যার জন্য বার বার রবীন্দ্রনাথকে সুন্দর হে সুন্দর, জীবন্ত জীবনের আলিঙ্গনে মুগ্ধ। গেয়ে গেয়েও তৃপ্তি নেই, আবার গাও—আবার গাও—আকুল হয়ে শুধু বলা 'সুন্দর হে, সুন্দর'। অতুলপ্রসাদের গলা খুবই মিষ্টি তার সাথে যুক্ত হতো গানের ভাবের আন্তরিকতা, সুর ও শব্দের বিভোরতা। রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদ বারবার গান আর গান গেয়ে যখন ক্লান্ত হতেন তখন দীনেন্দ্রনাথ সেই সুরটেনে নিলে সুরের মদিরায় লুটোপুটি যেতেন রবীন্দ্রনাথ এবং অতুলপ্রসাদ। ঘরের বাইরের উন্মুক্ত আকাশের নিচে বসে রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদ-দীনেন্দ্রনাথ শুধু গানের সংলাপ, গানের মেজাজে বৈঠক। সেসময় শিল্পী মুকুল দে ও রামগড়ে উপস্থিত। রামগড়ে রবীন্দ্রনাথ প্রসন্ন, তৃপ্ত অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে। অতুলপ্রসাদের উপস্থিতিতেই রবীন্দ্রনাথ যে কয়টি গান রচনা করেছিলেন তার সবকটি নিজে কখনও বা দীনেন্দ্রনাথ গেয়েছিলেন অতুলপ্রসাদের আন্তরিকতার অনির্বচনীয় সুখ-সঙ্গে।

"এই তো তোমার আলোকধেনু"; "গান গেয়ে কে জানায় আপন বেদন"; "এরে ভিখারী সাজায়ে কী রঙ্গ তুমি করিলে"; "সন্ধ্যা হল গো ওমা, সন্ধ্যা হল বুকে ধরো"; "চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমায়।" প্রত্যেকটি গানের ফোয়ারায় অভিসিঞ্চিত অতুলপ্রসাদ।

রামগড়ে অতুলপ্রসাদসহ যে আনন্দ, আরাম লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ তার কথা এন্ড্রুজকে লেখা পত্রে "My life is full. It is no longer broken and Fragmentary........ At last I am supremely happy."

সময়টা বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পূর্ব মুহূর্ত। প্রায় প্রতিদিনই রবীন্দ্রনাথ কি একটা উৎকণ্ঠায় বিবশ থাকতেন। সেই সময়ের রচনা 'বলাকা' কাব্যের 'সর্বনেশে', 'আহ্বান', 'শঙ্খ' কবিতা। অতুলপ্রসাদকে কাছে পেয়ে সেই বিবশতাকে অতিক্রম করে একান্ত সুরের আকাশে হৃদয়-প্রাণকে ভাসিয়ে দিতেন রবীন্দ্রনাথ। সারা পৃথিবীময় একটা নির্দয় ভাঙাচোরার আয়োজন হঠাৎ অভাবনীয়ভাবে দেখা দিল, যার প্রভাব কবিকে গভীরভাবে ভাবিয়েছিল।

রামগড় পাহাড়ের আসর আস্তে আস্তে ভেঙে গেল। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে লখনউতে নিমন্ত্রণ করে দু'চার দিন অতুল-নীড়ে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে ফিরে গেলেন। লখনউতে একটি বক্তৃতাও দিতে হবে—এ আবদার অতুলপ্রসাদের কাছ থেকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ খুবই আনন্দিত। প্রসন্নচিত্তে সম্মতি জানালেন। রবীন্দ্রনাথ রামগড় পাহাড়ের বিশ্রাম-আবাস ত্যাগ করে কলকাতার পথে অতুলপ্রসাদের আহ্বানে একদিনের জন্য লখনউ এলেন এন্‌ড্রুজ সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে। অতুলপ্রসাদের অন্তর-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ তাঁর অতিথি। অতুল-নীড় নবসাজে শোভিত, গানের ঝর্নায় প্রতিটি মুহূর্ত গভীরতম নিবিড়তায় স্নিগ্ধ। গান গাওয়া আর গান শোনা—সেখানে আর কোন কথা নয়। নয় কোন দৈনন্দিন জীবনের ঘেরাপেটায় প্রাণহীন সমস্যা।

লখনউ প্রবাসী বাঙালীরা এই প্রথম ক্ষণিকের জন্য দেখলেন ভারত-গৌরব রবীন্দ্রনাথকে। অবাঙালীরা ছুটে এলেন—এলেন গোরকনাথ মিশ্র, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা—এলেন বিশ্বেশ্বর প্রসাদ। হেমকুসুমও রবীন্দ্র-সন্দর্শনে কবির সাথে সাথে স্বামীর পাশে পাশে। রবীন্দ্র-মুগ্ধতায় ও সেবায় হেমকুসুম আন্তরিকতার সঙ্গে কবি ও এন্‌ড্রুজ দু'জনকে আপ্যায়ন করেছেন। সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে কবির নামে টেলিগ্রাম আসে, তাই পরদিনই রবীন্দ্রনাথ লখনউ ত্যাগ করলেন। এর কয়েকদিনের মধ্যে মহামতি গোপালকৃষ্ণ গোখলের প্রয়াণ সমগ্র ভারতের জাতীয় জীবনের ভিত নড়ে উঠল, প্রত্যক্ষ সংগ্রামে গোখলের অবদান অত্যন্ত গভীর ছিল। অতুলপ্রসাদ গোখলের চিন্তাধারার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদিন এই গোখলে অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' এবং অতুলপ্রসাদের নিজের রচনা "উঠ গো ভারতলক্ষ্মী" গান দুটি শুনে মুগ্ধতার তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়েছিলেন।

গোখলের স্মরণসভায় অতুলপ্রসাদ সেই 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গানটির দুটি পঙ্‌ক্তি গেয়েই শোকস্তব্ধ হৃদয়ে অসাড় হয়ে বসে পড়লেন।

অতুলপ্রসাদের যোগাযোগ ছিল গোখলের সঙ্গে। তাই তাঁর প্রয়াণে অতুলপ্রসাদ আত্মীয় বিয়োগ-বেদনায় মুহ্যমান।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ-এর কানিং কলেজের অধ্যাপক উপেন্দ্রনাথ বলের বিবাহ উপলক্ষ্যে অমল হোম লখনউ এসেছিলেন। উপেন্দ্রনাথ বলের উদ্যোগে অমল হোম অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। পাঁচ মাথার মোড়ে ব্যাঙ্কস রোডের প্রকাণ্ড

'হাতাওয়ালা ফুলবাগান শোভিত বাড়ী'। অতুলপ্রসাদ সবেমাত্র কোর্ট থেকে ফিরলেন, পোশাকও ছাড়া হয়নি। উপেনবাবু অমল হোমের পিতৃপরিচয় দিয়ে অমল হোমের সাথে পরিচয় করালেন। অতুলপ্রসাদ আনন্দ-মুগ্ধ চিত্তে আগত দুইজনকে সোজা 'খানা কামরায়' নিয়ে গেলেন। 'খানা-কামরায়' সজ্জিত চেয়ারগুলিতে কয়েকজন বসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ পরিচয় করিয়ে দিলেন। মির্জা সামিউল্লা বেগ এবং অধ্যাপক আবদার রহিম। মির্জা সামিউল্লা পরে হায়দ্রাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হয়েছিলেন। অধ্যাপক রহিম কলকাতার রাজনৈতিক মহলে বিশেষ পরিচিত। তিনি 'প্যান ইসলামিজম'-এর বিরুদ্ধবাদী 'কমরেড' পত্রিকার সাব-এডিটর, কাজে ইস্তফা দিয়ে লখনউতে এসে শিয়া-স্কুলে হেডমাস্টারি করছেন। অধ্যাপক রহিম বাঙালি, মৌলবী আবদুল করিমের ছেলে। শৈশব থেকেই তিনি আলিগড়ের বাসিন্দা। লখনউতে এসে অবধি রহিম অতুলপ্রসাদের কাছে, পাশে। বাঙলায় কথাবার্তা এমন কি অতুলপ্রসাদের কাছে বাঙলা গানের শিক্ষা গ্রহণ রহিমের নিত্যদিনের একটি অনিবার্য কাজ।

অমল হোম অতুলপ্রসাদকে দেখে দেখে প্রায় আবিষ্ট। অনেক কথা শুনেছেন, ওঁর গান শৈশব থেকে শুনে আসছেন আজ সেই মানুষটিকে সাক্ষাৎ দেখতে পেয়ে হৃদয়ের ব্যাকুলতা কিছুতেই বাধা প্রাপ্ত হচ্ছে না। বললেন, একটা গান শুনবো। অতুলপ্রসাদ অমল হোমের দিকে প্রসন্নদৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। রহিমের দিকে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের "বিশ্বসাথে যোগে সেথায় বিহারো— সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারও" গানের ভাষা ও সুরের আমেজ উপস্থিত সকলকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল, অতুলপ্রসাদ গাইতে গাইতে হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলেন, অধ্যাপক রহিম থেমে যাওয়া থেকে শুরু করলেন, তার পর দু'জনে এবং সবাই সম্মিলিত কণ্ঠে গেয়ে উঠলেন—

... *গোপনে প্রেম রয় না ঘরে*
আলোর মতো ছড়িয়ে পড়ে—
সবার তুমি আনন্দঘন হে প্রিয়
আনন্দ সেই আমারও।।

অতুলপ্রসাদের প্রভাবে রহিম সাহেবের ভুলে যাওয়া মাতৃভাষা রবীন্দ্র সাহিত্যের ও গানের সাহায্যে পুনরায়ত্ত হ'ল। রাত্রির আহার সেখানেই সেদিন সারা হল। অমায়িক ও মুগ্ধ ব্যবহারে অমল হোম অতুলপ্রসাদের একান্ত অনুগত ভক্ত হয়ে গেলেন।

এমনি একদিন অতুলপ্রসাদ খাঁটি লখনৌয়ের পোশাকে সজ্জিত হয়ে সাদা

মসলিনের শেরওয়ানী চুড়িদার পায়জামা, 'চিকন' কাজের বাঁকা টুপি পরে, সাদা রঙের বনেদী ওয়েলার ঘোড়া চালিত 'ভিক্টোরিয়া' ফিটন চালিয়ে লালবাগের উপেন্দ্রনাথ বল মহাশয়ের বাড়ী এসে অমল হোমকে তুলে নেন এবং গোমতীর দিকে নিকটবর্তী বাট্‌লার গঞ্জের কাছে একটি নির্জন স্থানে দু'জনে বসেছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদের হৃদয়ের বেদনাক্ষুব্ধ সকরুণ ছবিটি নিরাসক্ত অনুরাগে অচল অটল গাম্ভীর্যকে ভেদ করে প্রকাশ লাভ করল। অভাবনীয় আন্তরিক ব্যথাতুর কণ্ঠে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

—মিছে তুই ভাবিস মন!
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!

একটু থেমে...

পাখিরা বনে বনে গাহে গান আপন-মনে;
নাই-বা যদি কেহ শোনে, গেয়ে যা গান অকারণ।
ফুলটি ফোটে যবে ভাবে কি কাল কী হবে?
না-হয় তাদের মতো শুকিয়ে যাবি গন্ধ করি বিতরণ।
তুই গান গেয়ে যা, গান গেয়ে যা আজীবন!

অমল হোমের দিকে সজল নয়নে তাকিয়ে আবার গাইলেন

মনোদুখ্ চাপি মনে হেসে নে সবার সনে,
যখন ব্যথার ব্যথীর পাবি দেখা জানাস প্রাণের বেদন।
আজি তোর যার বিরহে নয়নে অশ্রুবহে হয়তো তাহার পাবি দেখা
গানটি হলে সমাপন।

প্রাণস্পর্শী বেদনার ফল্গুধারায় অমল হোমের সমস্ত মন সিক্ত হয়ে উঠল। এই গানটি অতুলপ্রসাদ তার 'গীতিগুঞ্জের' ভূমিকায় যুক্ত করেছেন।

এরপরও কয়েকটি গান গাইলেন অতুলপ্রসাদ অমল হোমের কাছে। অমল হোম সেদিন কোন মন্তব্য করতে পারেননি। কিন্তু হৃদয়ের অতি গোপনস্থলে অতুলপ্রসাদের বেদনার আর্তি বহন করে নিলেন কলকাতার অতি নিকট বন্ধুদের জন্য, যাঁদের কাছে অতুলপ্রসাদের গানের সম্ভার তখনও পর্যন্ত তেমনভাবে ভরে উঠেনি।

অমল হোম কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় সুকিয়া স্ট্রীটে 'ভারতী' কার্যালয়ে তখন যে সাহিত্যবাসর বসত, তাতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অমল হোম এবং আরো অনেকে আসতেন। অমল হোম সাহিত্যবাসরে অতুলপ্রসাদের গানের খুব তারিফ করলেন এবং

লখনউতেই থাকাকালীন অতুলপ্রসাদের কয়েকটি গান লিখে রেখেছিলেন—সেগুলি পরপর পাঠ করলেন। ছন্দের রাজা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত গানের ভাষায় মুগ্ধ। অমল হোমকে অনুরোধ করলেন আরো গান পাঠিয়ে দেবার জন্য অতুলপ্রসাদকে পত্র দিতে। অমল হোম সেইমত লিখলেন, ...'সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত আপনার গানের অনুরাগী—তাঁরই তাগিদে জানাই, আপনার নতুন গান যা হচ্ছে আমাকে পাঠিয়ে দিন'। ছান্দসিক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে অতুলপ্রসাদের গান ভাল লেগেছে জানতে পেরে অতুলপ্রসাদ পরম আনন্দিত ও গৌরবান্বিত। অমল হোমের কাছে সে সম্পর্কে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্রের উত্তর দিলেন, কিন্তু সেসময় কোন গান পাঠালেন না। তিনি লিখলেন,

... সুর ছাড়া আমার গানগুলি বড়ই ছন্দহীন, ছন্দের রাজার কাছে তা' কি করিয়া পাঠাইব? এবার যখন কলিকাতায় আসিব তখন একদিন সত্যেন্দ্রবাবুকে ও আপনার বন্ধুদের গান গাহিয়া শুনাইব। আমাকে ক্ষমা করিবেন।...

এর কিছুদিন পরে অপ্রত্যাশিতভাবে অমল হোমের হাতে এল সুরম্য মরক্কো চামড়া-বাঁধানো একটি ছোট খাতা আগাগোড়া অতুলপ্রসাদের স্বহস্তে লেখা স্বরচিত সংগীতে ঠাসা। সুকুমার রায়ের পত্নী, অতুলপ্রসাদের মাসতুতো বোন সুপ্রভা রায়ের কাছে অত্যন্ত যত্নে সংরক্ষিত খাতাটি আবিষ্কার করার সে কি আনন্দ অমল হোমের! সুপ্রভা দেবী তাঁর স্বাভাবিক স্বর মাধুর্যে ও স্নিগ্ধ সুর-তাল-লয়ে অতুলপ্রসাদের গানগুলি পরম রমনীয় করে পরিবেশন করতেন যার কয়েকটি অমল হোম সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কাছে দিয়েছিলেন! সত্যেন্দ্রনাথ গানগুলি পাঠ করেন এবং অমল হোমের কাছে সুরায়িত ছন্দে শুনে খুবই আনন্দ লাভ করলেন।

অতুলপ্রসাদ কলকাতা এলেন। কলকাতায় অতুলপ্রসাদ মেসোমশাই ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যের বাড়ীতে উঠলেন। সেখানেই অমল হোম অতুলপ্রসাদের দেখা পেলেন। কথামত একদিন সন্ধ্যায় 'ভারতী' কার্যালয়ে সাহিত্য-বৈঠকে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-অতুলপ্রসাদ মুখোমুখি। উভয়ে উভয়ের প্রশংসায় বাণীমুখর। উভয়েই লাজুক—নিজ নিজ গুণের ও কৃতির কথা শুনতে কেমন যেন লাগছে! অতুলপ্রসাদ পূর্ব কথামত অনেকগুলি গান শোনালেন যা' শুনে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তৃপ্ত ও পুলকিত।

কলকাতায় থাকাকালীনই সমবয়সী মাসী সুবালা, ভাগ্নী-ভাইঝি, কনক, সাহানা, ঊষা, মীরা, রেণুকা—আত্মীয় পরিজন ভাইদাদার কাছে গান শোনা, গান লিখে নেওয়া—সে এক আনন্দঘন হৃদয় জড়ানো মরসুম। দীর্ঘদিন এমন আত্মীয় আন্তরিকতা অতুলপ্রসাদ পাননি। অতুলপ্রসাদও প্রাণ উজাড় করা সংগীতে দিন-

রাত একাকার করে দিতেন। এদিকে আবার ভগ্নিপতি ডাঃ দ্বিজেন মৈত্রের উদ্যোগে সাহিত্যবৈঠক—মেয়ো হাসপাতালের ছাদে নিভৃত চন্দ্রালোকে রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের মিলন। গল্প-কবিতা গান ও সমসাময়িক সাহিত্য-চর্চা। যে কটা দিন কলকাতায় অতুলপ্রসাদ, প্রতিটি দিন-মুহূর্ত যেন বিলিয়ে ছড়িয়ে দেবার আয়োজনে বিভোর।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউতে বড় মুসলমান বন্ধু মমতাজ হোসেন ও আলি আউসড় দু'জনের সহযোগিতায় এবং নিজস্ব চারিত্রিক শোভনতায় ও কুশলতায় অতুলপ্রসাদ অল্পদিনের মধ্যেই আইনব্যবসায় কৃতিত্ব ও সমৃদ্ধি লাভ করেছিলেন। বিপিন বসু (ঝাউলালপুল), রামলাল চক্রবর্তী, নগেন ঘোষাল (গোলগঞ্জ); ডাঃ মহেন্দ্র ওহদেদার প্রভৃতির সহযোগিতায় অতুলপ্রসাদের জীবনের শীর্ষস্থান উজ্জ্বলতর হ'ল। ব্যারিস্টারীর সফলতায় বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব, জাস্টিস গোকরনাথ মিশ্র, ব্যারিস্টার হেমন্ত ঘোষ, বীরেন রায়, ব্যারিস্টার সুধীন দাস, মুবাশ্যির কিদওয়াই প্রভৃতির সক্রিয় অবদানে অতুলপ্রসাদকে এগিয়ে যেতে সহযোগিতা করেছে। অতুলপ্রসাদ **'আউধ আইনজ্ঞ সভার'** কুলপতি হলেন। বিভিন্ন বিচারের রায় ও চিন্তাধারার পবিত্রতা ও বিশুদ্ধ আচরণে মাঝে মধ্যে ব্যারিস্টার ও বিচারকদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হত। অতুলপ্রসাদকে তা' মেটাবার জন্য নেতৃত্ব দিতে হত। তার ফলে আদালতের নৈতিকতা বেশ সুনাম অর্জন করেছিল। একদিকে অর্থাগম অপর দিকে পারিবারিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতার জন্য অবিরাম কাজ করা—শরীরের ওপর, বিশেষ করে রক্তের চাপ বেড়ে যেত। লখনউ কোর্টে সাধারণ মামলার সঙ্গে নবাব ও তালুকদারের বিবাদ মামলার ব্যাপারে অতুলপ্রসাদের চেষ্টা চলত 'নিজেদের' মধ্যে বসে শান্তমনে মিটমাট করে নেওয়া। মিটেও যেত। কিন্তু যেগুলি মিটত না, অনিবার্যভাবে তা কোর্টে যেত। অতুলপ্রসাদকে বাধ্য হয়ে বিবদমান পক্ষের যে কোন একটি দিকে থাকতে হত। অতুলপ্রসাদ যে পক্ষে সওয়াল করতেন অপরপক্ষ বুঝতে পারতেন তাদের জয়ী হওয়া সম্ভব নয়।

প্রচলিত প্রথায় তখন অপর পক্ষ গোপনে প্রচুর অর্থ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে অতুলপ্রসাদকে মামলা থেকে সরে দাঁড়াবার প্রস্তাব পাঠাতেন। দৃঢ়-অনড়-স্বচ্ছ চরিত্র অতুলপ্রসাদ এতটুকু সময় নিতেন না সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে—বরং আরো বেশী উৎসাহে মক্কেলের জন্য লড়তেন এবং জয় হাতের মুঠোয় এনে নিরাসক্ত চিত্তে তা' সমর্পণ করতেন। এমনি এক পরাজিত প্রতিপক্ষ তীব্র ক্ষোভে

ক্ষিপ্ত হয়ে অতুলপ্রসাদের প্রতি প্রতিশোধ নিতে এতটুকু দ্বিধা করল না। অতুলপ্রসাদকে অপমান-অশোভন ভঙ্গিমায় অপদস্থ করার মতলবে দিক্‌বিদিক হারিয়ে স্থির করল, —অতুলপ্রসাদের স্ত্রী হেমকুসুমকে কয়েকদিনের জন্য বাড়ী থেকে অন্যত্র লুকিয়ে রাখা। তাতে সমাজের মধ্যে অতুলপ্রসাদের বদনাম হবে—এবং তাতে সুনামে আঘাত লাগবে। এ ধরনের প্রতিশোধ স্পৃহার কথা অতুলপ্রসাদের শুভানুধ্যায়ীদের কোন একজন হেমকুসুমকে পূর্বাহ্নে জানিয়ে দেন। হেমকুসুম বিষয়টি শোনামাত্র স্তম্ভিত, কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে অতুলপ্রসাদের উপর ক্রোধাগ্নিতে দিশেহারা। মানসিক দুর্বৃত্তায়নে সমস্ত দেহ-মন তখন জ্বলছে—বিদ্যুৎগতিতে হেমকুসুম একটি ঘরের মাঝখানে অতুলপ্রসাদের সমস্ত ব্যারিস্টারী পোশাক-পরিচ্ছদ একত্র করে কেরোসিন ঢেলে তাতে আগুন লাগিয়ে দিলেন।

অতুলপ্রসাদ তখন এক বন্ধুর পারিবারিক উৎসবে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে ঘরে ঢুকেই দেখতে পেলেন, তাঁর সমুদয় কোট পাতলুন স্তূপীকৃত হয়ে আগুনে জ্বলছে। নির্বাক বিস্ময়ে অতুলপ্রসাদ ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। মূল ষড়যন্ত্রের কথা শুনলেন—কিন্তু হেমকুসুমের এ ধরনের আচরণে অতুলপ্রসাদ শুধু ক্ষুব্ধ নন, ঘৃণা ও বেদনায় নিজেকে কোনভাবেই ঘরে ফেরাতে পারছিলেন না—সেই মুহূর্তে দাদা সত্যপ্রসাদের বাড়ীতে চলে গেলেন। ক্লান্ত অবসন্ন চিত্তের বেদনায় অতুলপ্রসাদ সেদিন রাতেই লিখলেন এবং নিজে কান্নায় ভেঙে রেগে গেয়ে উঠলেন,

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে

জানলার ধারে দাঁড়িয়ে বেদনায় 'তপ্ত হৃদয়ে' খোলা উন্মুক্ত আকাশে মেঘের খেলায় মন প্রাণ শীতল হয়ে গেল। বেদনার আর্তিভরা চিত্ত মুহূর্তের মধ্যে পট পরিবর্তন হয়ে ছন্দের ও ভাষায় নূতন ভাব-বিন্যাস আকর্ষিত হয়ে গাইলেন—

যাব না, যাব না, যাব না ঘরে
বাহির করেছে পাগল মোরে।
বনের বিজনে মৃদুল বায়,
দুলে দুলে ফুল বলে আমায়,
'ঘরের বাহিরে ফুটিবি আয়
পুলক-ভরে'।
আকাশের দু'তীরে দু'বেলা
আলো কালো করে হোলি খেলা;
আমারও পরাণে লেগেছে রঙ

কালোর ’পরে
নীল সরে হেমতরী-’পরে
হাসে নববিধু লাজ-ভরে।
‘এসো বঁধু’ ব’লে ডাকে মোরে
মোহন স্বরে।।

অপ্রত্যাশিত বেদনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে বেদনার আর্তি ছড়িয়ে দিলেন বিশ্বাত্মার চরণে—বিশ্বপ্রকৃতির উদার অনন্ত প্রকাশের আন্তরিকতায় পরিশুদ্ধ হবার জন্য।

সেদিন সারারাত ঘুম নেই। দাদার পাশে শুয়ে অনন্ত ভাবনায় অস্থির চিত্তকে শান্ত করতে করতে অবশেষে স্থির করলেন—ঘরে আর নয়। কলকাতায় যাবেন, সেখানেই ব্যারিস্টারী প্র্যাকটিস করবেন।

প্রভাতেই সিদ্ধান্তের কাজ শুরু করলেন। অভিমানী অতুলপ্রসাদ কলকাতায় যাবার কথা হেমকুসুমকে জানালেন না। স্ত্রী-পুত্রের ভার মহেশচন্দ্রের উপর ছেড়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় চলে গেলেন।

সময়টা ১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে। কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করলেন। কলকাতায় পার্ক স্ট্রিট ও ওয়েলেস্‌লি স্ট্রিটের মোড়ে ওয়েলেস্‌লি ম্যানসনস’এ থাকাকালে অতুলপ্রসাদ প্রায়ই মা হেমন্তশশীর সাথে দেখা করেন—পুত্রকে কাছে পেয়ে হেমন্তশশীও নিদারুণ দুঃখের মধ্যে সান্ত্বনার স্নিগ্ধ শিখায় আলোকিত হন। অতুলপ্রসাদের কলকাতার জীবন একান্তভাবে নিঃসঙ্গ। তবুও কলকাতার বাঙলাভাষা ও সাহিত্যের কেন্দ্রভূমিতে থাকার জন্য মনের একাকীত্বের শূন্যতা ভরাট হয়ে যেত প্রতিদিনের নানাবিধ সাহিত্য মজলিসে যোগদানের মধ্য দিয়ে।

অমল হোম কয়েকদিন আগে কয়েকজন বন্ধু নিয়ে **‘মনডে ক্লাব’** প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম থেকেই এই ক্লাবের সদস্য ছিলেন অজিতকুমার, সুকুমার রায়, গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র, অধ্যাপক কালিদাস নাগ, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্র সেন, সুবিনয় রায়, প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনময় রায়, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, হিরণকুমার সান্যাল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র শর্মা, অধ্যাপক নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। প্রত্যেক সোমবার ‘মনডে ক্লাবের’ অধিবেশন হত কোন একজন সদস্যের বাড়িতে। সদস্যদের মধ্যেই কেউ একজন নির্দিষ্ট কোন বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ বা আলোচনা

করতেন। সদস্যমণ্ডলীর বাইরেও নিমন্ত্রণ করা হত একাধিক ব্যক্তিকে। এসেছেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ এই 'মনডে ক্লাবে' তাঁর সদ্য রচিত 'পয়লা নম্বর' গল্পটি পাঠ করেন।

অতুলপ্রসাদ 'মনডে ক্লাব' যোগদান করলেন। ফ্লাটের ড্রয়িংরুমে ক্লাবের অধিবেশনের জন্য মস্ত বড় একজোড়া তক্তপোশ রাখা ছিল—তার উপর পাতা হল পুরু গালিচা। অতুলপ্রসাদের মাসতুতো ভাই শিশিরকুমার দত্ত ছিলেন ক্লাবের সম্পাদক। সুকুমার রায় 'মনডে ক্লাবের' পরিচিতিতে লিখলেন—

আমাদের শান্তিনিকেতন
—আরে না-তা না, আমাদের Monday সম্মিলন!
আমাদের হল্লারই কুপন!
তার উড়ো চিঠির তাড়া
মোদের ঘোরায় পাড়া পাড়া।
কভু পশুশালে হাসপাতালে আজব আমন্ত্রণ।

ডাঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মহাশয়ের গঙ্গার উপর মেয়ো হাসপাতাল ভবনের বিরাট ছাদে, আবার অধ্যাপক কালিদাস নাগের মামা আলিপুর চিড়িয়াখানার সুপারিনটেনডেন্ট রায় বাহাদুর বিজয়কৃষ্ণ বসুর কোয়ার্টার্সে—সর্বত্র অতুলপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। ক্লাবের স্টীমার পার্টি। কলকাতা থেকে কোলাঘাট। সকালে চড়ে বিকেলে নামা, রাত্রিতে কোলাঘাটের সেচ-বিভাগের বাংলোয় রাত্রিবাস। স্টীমারে আসতে লুচি মাংস খেতে খেতে অতুলপ্রসাদের গান আর গান। সারা রাত কেউ ঘুমোয় নি।

স্টীমার পার্টিতে যাবার আগের রাত্রিতে লেখা অতুলপ্রসাদ গাইলেন,

জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরাণী
শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি
এসো গো মম অন্তরে ধীরে মৃদু মন্থরে
বিদ্যুৎ-প্রবেশে তব শঙ্কা মানি।
বলো গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ও কী অঞ্চলে?
দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি?
তব চরণ-রণঝনা করিবে কি গো বঞ্চনা।
কুহক-কল-কণ্ঠে এ কী বাণী গায়!
কী সুধা তব সংগীতে, কী শোভা তনুভঙ্গিতে;
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কী মোহ আনি'?

অতুলপ্রসাদ আর একটি গানও গেয়েছিলেন—

মেঘ বলেছে 'যাব যাব', রাত বলেছে যাই
সাগর বলে 'কুল মিলেছে' আমি তো আর নাই।
দুঃখ বলে রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্নরূপে
আমি বলি 'মিলাই আমি আর কিছু না চাই'
ভুবন বলে, 'তোমার তরে আছে বরণমালা'
গগন বলে, 'তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা'।
প্রেম বলে যে 'যুগে যুগে তোমার লাগি আছি জেগে'
মরণ বলে, 'আমি তোমার জীবনতরী বাই'।।

গানটি শেষ হবার পর হিরণ সান্যাল বললেন, অতুলবাবু, আপনার কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের এ গান আমাদের চিত্তলোকে গানের রেশ দীর্ঘদিন থাকবে।

উপস্থিত অনেকেই বুঝতে পারেনি—অতুলপ্রসাদের গাওয়া পরের গানটি রবীন্দ্রনাথের।

চন্দ্রালোকিত বিনিদ্র রজনীতে সদ্য তোলা রূপনারায়ণের ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খাবার পর পুনরায় ওই খালে নৌ-বিহারে গানের জলসা।

'মনডে ক্লাবে' সংগীত চর্চা ও সাহিত্য চর্চা যুগপৎ অনুষ্ঠিত হত। অতুলপ্রসাদ একবার অমল হোমের একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'Oscar Wilde—The Man and his work' আলোচনায় অস্কারের ট্রায়ালের কাহিনী শোনালেন—সেসময় অতুলপ্রসাদ এবং চিত্তরঞ্জন দাশ বিলেতে। ট্রায়ালে Sir Edward Carson যখন জেরা করছিলেন, অস্কার তার উত্তরে যা যা বলেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেই কথাগুলি সে সময়ের ভাব ও কথার জীবন্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে Ballard of the Reading থেকে শোনালেন।

অমল হোম মাঝে মধ্যে অতুলপ্রসাদের কাছে যেতেন হাইকোর্টের বার লাইব্রেরীতে। একদিন অমল হোম অতুলপ্রসাদের ফ্ল্যাটের দরজায় কড়া নাড়লেন। দরজা খুলে গেল, সামনে দাঁড়িয়ে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ। অমল হোম বিব্রত হলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন অমল হোমকে চিনতেন—বললেন ভেতরে এসো—অতুল কাপড় ছাড়তে গিয়েছেন, এখনই আসবেন।

আশ্বস্ত অমল হোম ভেতরে বসলেন—চাও এল। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন নিজে থেকেই বললেন, সারাদিন কাজের চাপে ফাইলের মধ্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে। আজ একটা ছাড়া পেয়ে অতুলকে হাইকোর্ট থেকে ধরে এনেছি একটু গান শুনব বলে; অনেকদিন ওর গান শুনিনি। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ তখন বাংলার গভর্নরের খাস পরিষদের অন্যতম সদস্য।

অতুলপ্রসাদ পর পর কয়েকটি গান গেয়ে শোনালেন। তার মধ্যে

প্রেমময়ে রাখিয়ো সদাই দোঁহে স্মরণে!
যে নব পথে যাত্রা করিলে আজি,
সবার আশিস লয়ে চলিয়ো নির্ভয়ে মনে।
সংসারের পথে হাঁটা, কত ফুল, কত কাঁটা;
সকলি তাঁহারি দান-ভুলো না কভু দু'জন;
জীবনের সুখে দুখে থেকো সদা হাসিমুখে
সাধিয়ো আপন হিত সবার হিত-সাধনে।
মিলনে লভিয়ো শক্তি, প্রেমেতে লভিয়ো মুক্তি;
পূজার কুসুম হয়ে রহিয়ো তাঁর চরণে।

গানের কলি শেষ। কিন্তু সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন এবং অমল হোম বিমুগ্ধ ভাবাবেশে অন্তরের নিবিড়তায় ধ্যানস্থ। কোন সাড়া শব্দ নেই সমস্ত ঘর জুড়ে—অসীম নিস্তব্ধতায় তিন জন তাঁর চরণে সমর্পিত। ভৃত্য নবাব আলি ঘরে ঢুকে তিন জনের সমাধিস্থরূপ দেখে কাশি দিয়ে সচেতন করে দিলেন এবং টেবিলে কিছু খাবার রেখে গেলেন।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্নের তৃপ্তি হয়নি—তাই অতুলপ্রসাদকে অনুরোধ করলেন আসন্ন লখনউতে কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য রচিত গান শোনাবার জন্য। অতুলপ্রসাদ বললেন, পুরোটা ঠিক হয়নি। সুরও তেমন করে আরোপিত হয়নি।

যা হয়েছে তাই শোনাও।

অতুলপ্রসাদ আর যাই হোক, কেউ তাঁর মনের গান শুনতে চাইলে আনন্দ অনুভব করতেন। গান গেয়ে খুশি করতে তাঁর ভাল লাগত।

উদাত্ত কণ্ঠে অমল হোমের কাছে এসে বসে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

বল বল সবে, শত বীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত-সভায়
শ্রেষ্ঠ আসন লবে...

শুনতে শুনতে সিংহ সাহেবের মুখ প্রদীপ্ত হয়ে উঠল; চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, চেয়ারের হাতায় তাল দিয়ে দিয়ে গানের সুরে মেতে উঠলেন—দু' দুবার অতুলপ্রসাদকে গানটি গাওয়ালেন।

কলকাতায় থাকাকালীন অতুলপ্রসাদের 'ওয়েলেসলি ম্যানসনস' এ 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত সি. ওয়াই. চিন্তামণি; বোম্বাই থেকে সরোজিনী নাইডুর ভাই হারীন্দ্রনাথ ও তাঁর ভগ্নী মৃণালিনী এসেছিলেন। হারীন্দ্রনাথ ভাল কবিতা

লিখতেন—অতুলপ্রসাদকে শোনালেন। অতুলপ্রসাদ প্রসন্ন হয়ে বলেন, চমৎকার হয়েছে, খুব সুন্দর হয়েছে। দেখো তুমি একদিন তোমার দিদিকে ছাড়িয়ে যাবে।

মাঝে-মধ্যে অতুলপ্রসাদ মামলার ব্যাপারে কলকাতার বাইরে যেতেন—সময়মত ফ্ল্যাটে না ফিরলে গভীর চিন্তায় থাকতেন বৃদ্ধ খিদ্‌মৎগার নবাব আলি। এমনি একটি মামলার ব্যাপারে মফঃস্বলে গিয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ। ফেরার কথা ছিল পরদিন সকালে। কিন্তু বলে যাওয়া সময়ে অতুলপ্রসাদ এসে পৌঁছননি। সকাল পেরিয়ে বিকেল হল। নবাব আলি যথাবিহিতভাবে টেবিলে খাবার সাজিয়ে টেবিলের পাশে সারাদিন অভুক্ত থেকে মনিবের জন্য অপেক্ষা করছে। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে, নবাব আলি বিষণ্ণভাবে ঘরের বাইরে এসে বার বার উদাস নয়নে খুঁজছে—। অতুলপ্রসাদ এলেন— সেই সন্ধ্যায়। নবাব আলি অনুযোগ করলেন—দ্রুত এগিয়ে গিয়ে টেবিলে রাখা খাবার সরিয়ে গরম চা করে এনে দিলেন। সারাটা দিন মনিবের খাওয়া হয়নি, সে নিজেও খায়নি।

কলকাতায় থাকাকালীন অতুলপ্রসাদ শান্তিনিকেতনে গেলেন। শান্তি-নিকেতন, জীবনের পরম সন্ধানে—যশ নয়-অর্থ নয়-প্রতিপত্তি নয়-শুধু হৃদয়ে হৃদয়ে ভাব বিনিময়, আত্মায় আত্মায় মাখামাখি; গুরু-শিষ্যে সে কী গভীর প্রেম-সম্ভাষণ! অতুলপ্রসাদের কাছে তীর্থ—শোভনা সরস্বতী যেন বিচিত্র ঢংয়ে ও রংয়ে আপন সুরলোকের বীণাখানি সাজিয়ে রেখেছেন প্রকৃতির বিমুগ্ধতায়। অবর্ণনীয়, অনিন্দ্য আন্তরিক-রসে রসায়িত শান্তিনিকেতনের বাতাস। এখানকার প্রতিটি গাছ-পালা যেন কথা কয়—অতুলপ্রসাদের আগমনকে পাতায়-পাতায়, ডালে-ডালে যেন উৎসুক-স্নেহাশীষ স্নিগ্ধতায় ভরে তুলেছে গানে আর খুশির আনন্দে।

সারাদিন গান আর গান। বিরাম শুধু নীরবতায়। তারপর আবার গান।

রবীন্দ্রনাথ গীতিমাল্যের জন্য রচিত গানটি গাইলেন—

মোর সন্ধ্যায় তুমি সুন্দরবেশে এসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার
মোর অন্ধকারের অন্তরে তুমি হেসেছ,
তোমায় করি গো নমস্কার
এই নম্র নীরব সৌম্য গভীর আকাশে
তোমায় করি গো নমস্কার...

গানটির প্রতীক সন্ধ্যা—কিন্তু অন্তরের প্রিয় বন্ধু প্রিয়জন অতুলপ্রসাদকে শুনিয়ে রবীন্দ্রনাথ পুলকিত। সলজ্জ ও কুণ্ঠিত অথচ তৃপ্ত অতুলপ্রসাদ তার উত্তর দিলেন ঃ

ওগো আমার নবীন সাথী,
ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে
তোমার ওই করুণ গানে।
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কী লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে।
লয়ে তব মোহন বরণ
আমার শুকনো ডালে রাখলে চরণ;
আজ আমার জীবন-মরণ
কোথা আছে কে বা জানে।
ঝ'রে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালোবাসা,
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
আমার প্রাণে কোন্ পরাণে?

মিশ্র পিলু রাগে—মাতিয়ে তুললেন শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের। গানের কয়েকটি কলি আশ্রমের প্রতিটি স্পন্দনে প্রতিধ্বনিত হল বেশ কিছুদিন। মুগ্ধ কবি—হাস্যোজ্জ্বল ভঙ্গিতে অতুলপ্রসাদকে জড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। এ দৃশ্য অনির্বচনীয়।

কোর্টে যাবার সময় জনকোলাহলে হঠাৎ মনের ভেতর থেকে মোচড় দিয়ে সুরের মায়ায় একটি গান গুন্‌গুনিয়ে উঠল—অতুলপ্রসাদ আপন মনে গানটি গাইলেন—। পরে আপন তৃপ্তির রসে স্নিগ্ধ আনন্দে তা নিজের মধ্যেই সযত্নে তুলে রেখেছিলেন। আজ উপযুক্ত মুহূর্ত ও পরিবেশ [illegible] পেয়ে পরিবেশন করলেন।

অতুলপ্রসাদ শান্তিনিকেতন থেকে ফিরে অবশেষে দাদা সত্যপ্রসাদ সেনের সাথে দার্জিলিং গেলেন হাওয়া পরিবর্তনে মানসিক সুস্থতার জন্য।

দার্জিলিং-এর পথে শিলিগুড়ি থেকে টয় ট্রেনে চেপে প্রকৃতির কোলে কোলে যে মুগ্ধতা তাতে পাগলা মন আকৃষ্ট করল অতুলপ্রসাদকে। তিনি আপন মনে গুন গুন করে গাইলেন—

এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকুল?

সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল?
গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহাভুল?
বড়ো সাধ ছিল মনে ভরিব আঁচল বনে;
ভুলিব চরণে ব্যথা, নয়নে বেদন-দুল।

টয় ট্রেনে যেতে যেতে চোখের পাতা বুঁজে আসছে আবার ঝাঁকুনিতে চোখ ঈষৎ খুলে যায়—হঠাৎ তারই মধ্যে প্রকৃতির দৃশ্যে অতুলপ্রসাদ চমকিত—ঘুম উড়ে যায়—তখন গেয়ে উঠেন,

কে হে তুমি সুন্দর,
অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!
কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগকূজিতকুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর।
কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনককিরীট-মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর।
কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে
কভু পীত-জ্যোৎস্না-বসন শ্যাম
মুরতি অতি সুন্দর।

দার্জিলিং-এ থাকাকালীন লখনউ ছেড়ে কলকাতায় আসার মধ্যে যে মানসিক যন্ত্রণার উৎস তার কথা অতুলপ্রসাদ ভুলতে পারছেন না। —হেম-হেমকুসুমও কেমন হয়ে গেল। কেন এমন ব্যবহার আমার উপর! ও যে আমার সব, আমার প্রেমের, আমার আনন্দের আমার ভাল-মন্দের প্রবাহিনী; ও যে আমার সুভাষিনী-সুহাসিনী। কিন্তু কেন এমনভাবে আমাকে কষ্ট দেয়—ও তো কষ্ট পায়, নিশ্চয় পায়! ও যে আমার কামনার, আমার ভাবনার উৎস। —এমনি ভাবনায় কত বিনিদ্র রজনী অতুলপ্রসাদ বিবশ হয়ে বিছানায় ছট্‌ফট্‌ করেছেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এদিকে লখনউ-এর ব্যাঙ্কস রোডের বাংলো যেন আর্ত-পুরী। হেমকুসুমের কিছু ভাল লাগে না। প্রতিদিন খানসামা খাবার করে—নতুন নতুন পরিকল্পনায় মেমসাহেবের জন্য ব্যবস্থা করে। কিন্তু হেমকুসুমের তাতে রুচি নেই, ফিরেও তাকান না। কোথায় যেন একটা মোচড় প্রায়ই অনুভব করেন আর অবসন্ন হৃদয়ে শূন্য চাউনিতে নীরব হয়ে যান। সবাই আছে—খানসামা-দাস-দাসী-চৌকিদার কিন্তু সব থেকেও কিছু নেই। সবটাই যেন ফাঁকা, কী একটা অভাব কিছুতেই বুঝতে পারছেন না হেমকুসুম। এমনিভাবে কিছুদিন থাকার পর হেমকুসুম শিশিরকুমার দত্তকে সঙ্গে করে পুত্র দিলীপকুমার সহ কলকাতায় চলে এলেন। অতুলপ্রসাদ লখনউ ছাড়ার পর কোন পত্র হেমকুসুমকে দেন নি। অথচ একদিন এই হেমকুসুমকে চোখের আড়াল করতে কিছুতেই চাইতেন না—কাতর নরম চোখে তাকে ধরে রাখতেন সর্বত্র। সেই বিলেতে বিবাহের পরবর্তী ঘটনায় প্রতিটি মুহূর্তে হেমকুসুম অভাবনীয় কষ্ট স্বীকার করে শিশুপুত্রদের ও স্বামীকে জড়িয়ে রেখেছিলেন—সেই প্রিয় অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের জন্য মা-বোন-আত্মীয় পরিজন সবাইকে ত্যাগ করেছিলেন—এ সব কথা ভাবতে ভাবতে হেমকুসুম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কেমন যেন নিজের থেকে আলগা হয়ে যান।

কলকাতায় দুদিন থাকার পর, যখন জানতে পারলেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায় নেই, দার্জিলিং-এ—তখন তিনি পুত্র দিলীপকুমারকে নিয়ে দার্জিলিং-এ চলে গেলেন এবং আলাদা একটি হোটেলে উঠলেন। শিশিরবাবুও সঙ্গে ছিলেন। শিশিরবাবু হেমকুসুমকে অনুরোধ করেছিলেন, একসঙ্গে অতুলপ্রসাদের হোটেলে থাকতে। হেমকুসুম কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন—অভিমানিনী অভিমানের সুরে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

এদিকে অতুলপ্রসাদ যখন শুনলেন, হেমকুসুম পুত্র দিলীপকে সাথে করে দার্জিলিং-এ, তখন স্বাভাবিকভাবেই সকল বেড়া ভেঙে ছুটে যেতে চাইলেন পুত্র দিলীপকে দেখার জন্য—কিন্তু পারলেন না—পারলেন না হেমকুসুমের কথা ভেবে। মানসিক যন্ত্রণায় ক্ষিপ্রতার সাথে অতুলপ্রসাদ একবার ঘরে, আবার অনন্ত আকাশের কোলে এক ঝাঁক বরফের আস্তরণে নিজেকে কুয়াশায় আবৃত করে রাখলেন। —দিলীপকে কেন আমার কাছে আসতে দেবে না শিশির! ও তো আমারও ছেলে!—

শিশিরকুমার অতুলপ্রসাদের আর্তি, পিতার বেদনা বুঝতে পারলেন। কিছু বললেন না। শুধু হেমকুসুমের ও অতুলপ্রসাদের অভিমানের তাড়নায় তাড়িত পুত্র দিলীপকুমারের অসহায়ত্বের কথা চিন্তা করতে করতে বেরিয়ে পড়লেন।

শিশিরকুমার হেমকুসুমকে অত্যন্ত আন্তরিকভাবে পুত্র দিলীপকুমারকে অতুলপ্রসাদের কাছে পাঠাবার কথা জানিয়েছিলেন। হেমকুসুম তাতে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন—অশান্ত চিত্তের উন্মাদনায় বিভ্রান্ত হয়ে সেদিন শিশিরকুমারের কথা কিছুমাত্র আমল দেননি। অভিমানের তপ্ত আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে অঙ্গারের অপরিশুদ্ধতায় মোহগ্রস্ত হেমকুসুম। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য, ক্ষমা-প্রেম-আন্তরিকতা সর্বোপরি পিতৃত্বের নিষ্কলুষ চেতনাকেও কিছুমাত্র স্বীকার করতে চাইলেন না।

এরই মধ্যে একদিন শিশিরকুমার অতি সন্তর্পণে গোপনে পুত্র দিলীপকে অতুলপ্রসাদের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন—এ ঘটনা হেমকুসুম বরদাস্ত করতে পারেননি। শিশিরকুমার তাতে বিব্রত হয়েছিলেন—কুণ্ঠিত হৃদয়ে পিতা অতুলপ্রসাদের হৃদয় থেকে পুত্র দিলীপকুমারকে ছিনিয়ে নিয়ে হেমকুসুমের কাছে আবার রেখে এলেন।

অসহায় অতুলপ্রসাদ আর্তনাদ করে উঠলেন, রাগে ও বেদনায় কাঁপতে কাঁপতে নিজেকে ছুঁড়ে দিলেন অনিয়ন্ত্রিত বিছানায়। সারা রাত যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করতে করতে আপন হৃদয়ে বিধাতার অভাবনীয় পিতৃত্বের দান থেকে বঞ্চিত হয়ে শুধু সেই পরমের কাছে নিজেকে নিবেদন করলেন—তাতেও যে কান্নার শেষ নেই।

সেই রাত্রিতে অতুলপ্রসাদ দুঃখের প্রতিটি পল প্রতিটি অনুভূতিতে হৃদয় সিক্ত করে চোখের বন্যায় তাঁর চরণ ধুয়ে মোহ উত্তরণে গাইলেন।

আমায় রাখতে যদি আপন ঘরে,
বিশ্ব-ঘরে পেতাম না ঠাঁই।
দুজন যদি হত আপন,
হত না মোর আপন সবাই।
নিত্য আমি অনিত্যেরে
আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে—
তাই হে চির, তোমারে চাই।

সবাই যেচে দিত যখন
গরব করে নিই নি তখন,
পরে আমায় কাঙাল পেয়ে
বলত সবাই 'নাই গো নাই'।
তোমার চরণ পেয়ে হরি,

আজকে আমি হেসে মরি!
কী ছাই নিয়ে ছিলাম আমি,
হায় রে, কী ধন চাহি নাই!

পাশের ঘরেই শিশিরকুমার শুয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদের আর্ত-হৃদয়ের কান্নায় নিজেও ঠিক থাকতে পারলেন না, কাছে এসে অতুলপ্রসাদকে জড়িয়ে ধরলেন—

অতুলপ্রসাদ তখনও গাইছেন,

নিত্য আমি অনিত্যরে
আঁকড়ে ছিলাম রুদ্ধ ঘরে,
কেড়ে নিলে দয়া করে
তাই হে চির, তোমারে চাই।...

বিহ্বল শিশিরকুমারও কাঁদছেন—সান্ত্বনার ভাষা নেই।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কলকাতায় ফিরে অতুলপ্রসাদ দাদা সত্যপ্রসাদকে সাথে করে লাকসাম হয়ে ঢাকা জন্মভূমি বেড়াতে গিয়েছিলেন। শিয়ালদহ থেকে চট্টগ্রাম মেলে প্রথম ক্লাসে সত্যদা ও অতুলপ্রসাদ। সকালে শিয়ালদহ ছেড়ে চট্টগ্রাম মেল ছুটছে। জানালার ধারে বসে অতুলপ্রসাদ নিজেকে সেই চেনা বাতাস, চেনা নারকেল-সুপারির বাগানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে প্রায় মায়াচ্ছন্ন। সেখানে কারো আজ আর অংশ নেই—সর্বাঙ্গ দিয়ে মাতৃভূমি জন্মভূমির ভাল-মন্দতে মিশে যাবার আকুলতা। সে কি আনন্দ! একদিন বিলেত প্রবাসে দেশজননী ও গর্ভজননীর বিরহ বেদনা অতুলপ্রসাদকে আতুর ঘরের বেদনায় বিবশ করেছিল—আজ স্বদেশ-জননীর কোলের মধ্যে নাচানাচি দাপাদাপিতে মন-প্রাণ দোলায় দোলায় মুগ্ধ; ক্লান্তি নেই, নেই এতটুকু হারাবার অবসাদ, তাই সেই ছোট পরিসর পরিবেশেই অতুলপ্রসাদ গাইলেন,

প্রবাসী, চল রে দেশে চল্;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল!
যখন ছিলি এতটুকু,
সেথাই পেলি মায়ের-সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক;
সেথাই পেলি সাথির সনে বাল্যখেলার সুখ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয়-শতদল।—
প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্।

হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা!
শিউলি বেলি কদম চাঁপা এমন কোথায় বল্।—
প্রবাসী, চল্‌রে দেশে চল্।
মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গাছের গান
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।—
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

অনেকটা নৃত্যের ঢংয়ে বাউল সুরে অতুলপ্রসাদ উদাত্তকণ্ঠে গেয়ে চলেছেন। পোড়াদহে ট্রেন থামার পর নিজে স্টেশনে নেমে চারিদিকে খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে গাইলেন,

প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল।।

ই. বি. আর.-এর স্টেশনবাবুরা অতুলপ্রসাদের গান শুনেছেন, কিন্তু মানুষটিকে দেখেননি। টিকিট মাস্টারের জিজ্ঞাসায় সত্যদাদার কাছ থেকে অতুলপ্রসাদের পরিচয় পেয়ে সে কি আনন্দ! গানের মেলা বসে গেল। অনেকেই বলছেন, 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মীর কবি!'

আনন্দের প্রস্রবণে স্মৃতির বেদনাও কম নয়! তাই বেশীদিন ঢাকায় রইলেন না। ইচ্ছা ছিল, ঢাকা থেকে রংপুরে যাবেন। কিন্তু শরীর ক্লান্ত, কিছুটা মানসিক অবসাদে তেমন করে উৎসাহ পেলেন না। ঢাকায় থাকতেই শৈশবের বন্ধুদের খোঁজ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। সেলিম মহম্মদ আর গোলাম চৌধুরীর খোঁজ পেলেও অতুলপ্রসাদ তাঁদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন নি।

অবশেষে সত্যদাদার তাগিদে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় ফিরে এলেন। কলকাতায় লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উদ্যোগে অতুলপ্রসাদ বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাতা সারদাদেবীর কাছে যান। শরৎ মহারাজের ইচ্ছায় এবং মাতা ঠাকুরানীর করুণায় অতুলপ্রসাদ সেদিন বাগবাজারের শ্রীমায়ের বাড়ীতে বেশ কিছুক্ষণ কাটিয়েছিলেন। অনেকেই এসেছেন, মায়ের চরণে প্রণাম করে আশীর্বাদ গ্রহণ করছেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ স্থির-ধীর অপলক দৃষ্টিতে মা সারদাকে দেখছেন। এ যে শুধু দেখা নয়—দেখতে দেখতে তলিয়ে গেলেন,

মাতা ঠাকুরানীর চরণ দুটো হৃদয়ের নিভৃতস্থানে নয়নাশ্রু দিয়ে ধৌত করে দিলেন। বালকের মত ভেতরে ভেতরে কান্নায় কান্নায় কেমন যেন একটা আবেশ মা-ছেলেতে জড়িয়ে গেল। অতুলপ্রসাদ সেখানে একান্তভাবে নিঃস্ব; একান্ত নির্ভর মা'র প্রত্যক্ষ অনুভবে দিশেহারা। শরৎ মহারাজ অতুলপ্রসাদকে মায়ের সামনে বসতে বললেন। নীরব, নিশ্চল অতুলপ্রসাদ শুধু চেয়ে চেয়ে সব কথা জানিয়ে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে বিদ্যুৎ গতিতে বেরিয়ে এলেন। সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন শরৎ মহারাজকে বললেন, অতুলের শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। সময় সুযোগ পাইতো আর একদিন আসব।

এই বলে সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আর অতুলপ্রসাদ বাইরে এসে রাস্তা ধরলেন। যাবার পথে গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীর সামনে কিছুক্ষণ অতুলপ্রসাদ দাঁড়ালেন, ইতিহাসের পাতা যেন আস্তে আস্তে খুলে এল। কাহিনীর পর কাহিনীর জাল বুনে সে এক রোমাঞ্চকর অনুভূতির স্নিগ্ধতায় পরিচ্ছন্ন হয়ে গেল সকল ক্লেদযুক্ত অন্তর। ঝলকে আবার তারই মধ্যে ফুটে উঠল সেই শান্ত, পদ্মশোভিত অমৃত স্নেহঝরা মুখখানি—যেখানে তিনি সব হারিয়ে 'কাঙাল হয়ে শুধু মাতৃ চরণে যুক্ত হয়ে ধন্য হতে চান।' এ যে মা-বিশ্বজননীর সাক্ষাৎ প্রতিমূর্তি—যাঁর চরণে বিশ্ব যাওয়া আসা করছে অনবরত।

রাত্রিতে অতুলপ্রসাদ ঘরে ফিরলেন। সেদিন সাহিত্য আসরে যাবার কথা ছিল, কিন্তু গেলেন না। বাড়ীতেই একা একা নিঃসঙ্গ নীরবতায় আপন চেতনালোকের প্রদীপটি জ্বালিয়ে নিজেকে দেখতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু বার বার সবটা কেমন যেন গুলিয়ে গিয়ে সেই সদাপ্রসন্ন অন্তরভেদী করুণার মাতৃমূর্তিটি ভেসে আসছে—। আপন সত্ত্বার ব্যাকুলতায় অতুলপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন—

তোর কাছে আসব মা গো,
শিশুর মতো;
সব আবরণ ফেলব দূরে
হৃদয় জুড়ে আছে যত।
দৈন্য যে মা, মনের মাঝে
ঘুচবে না তা মিথ্যা সাজে;
সব আভরণ করব খালি,
দেখবি 'মা গো', মনের কালি;
শূন্য যে মোর প্রেমের থালি
তাই চরণে করব নত।

মারবি মা গো, যতই মোরে,
ডাকব আমি ততই তোরে।
ধরব যখন জড়িয়ে হাত
দেখব কেমন করবি আঘাত—
তখন মা তুই, পাবি ব্যথা
ব্যথা দিতে অবিরত।

মার্জার ভক্তির আকুলতায় অতুলপ্রসাদ মাতৃচরণে আপন বেদনা, অসার্থকতা সব যুক্ত করে প্রীতি জানালেন। পরম শান্তির অবিচ্ছিন্ন তৃপ্তিতে চোখ-মুখ রাঙা হয়ে উঠল—ক্লান্তিহীন অবসাদহীন নিরাসক্ত চেতনার দ্বারে এসে অতুলপ্রসাদ পরম নির্ভয়ে আবার গাইলেন—

শূন্য যে মোর প্রেমের থালি
তাই চরণে করব নত।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের অনুমতি নিয়ে অতুলপ্রসাদ সুন্দরবনে বেড়াতে গেলেন ফরেস্ট অফিসার এক বন্ধুর সঙ্গে। একা, কিন্তু অন্তর জমিনে অসংখ্য অনুভূতির ফসল তুলে মনের আনন্দে আছেন। প্রকৃতির উদার মাধুর্য অতুলপ্রসাদকে যেন কোলে তুলে নিয়ে পরম নির্ভয়ে একাকার হয়ে গেলেন। আরাম কেদারায় বসে প্রকৃতিকে উদ্দেশ্য করে গান গাইলেন,

ওরে বন, তোর বিজনে সংগোপনে কোন্ উদাসী থাকে?
আমার মনের বনের উদাসীরে ডাকে সে আজ ডাকে।
নিজে সে নীরব হয়ে রয়
শোনে সে ফুল যে কথা কয়;
তরুর হিয়া আলিঙ্গিয়া লতার অনুনয়,
শোনে সে লতার অনুনয়।
পাখিদের প্রগল্‌ভতা দেয় কি ব্যথা তাকে?
কেউ তারে পায় নাকো ডাকি,
থাকে সে সদাই একাকী;
কোন্ একাকী করল তারে এমন একাকী?
তারে বৃথা খোঁজে চন্দ্র তপন পাতার ফাঁকে ফাঁকে।
আজি মন বিবাগী চঞ্চল,

বিরহে চক্ষু ছল্‌ছল্‌
সদাই ভজনে—ওই বিজনে আমায় নিয়ে চল!
ওরে মোর পাগ্‌লা পরান, পাবি কি তুই তাকে?

কোন কোন দিন লঞ্চে করে অতুলপ্রসাদ ঘুরে আসেন সুন্দরবনের অত্যন্ত নিভৃত সাগর কোলে বনানীর অন্তর ভেদ করে। মনটা উদাস হয়, সারারাত লঞ্চে কাটিয়ে দেন—সে সময় চাঁদের আলোতে প্রকৃতিকে দেখে হৃদয় তরঙ্গে সুরের নাচনে গেয়ে উঠেন,

আজি এ নিশি, সখী, সহিতে নারি
কেবলই পড়িছে মনে যমুনা-বারি
এমন সোনার তরী ভেসেছিল নভোপরি—
নাহিক শ্যামের তরী নাহি বাঁশরি।
ছিল গো সেদিন, সখী হেন যামিনী
আছে ফুল নাহি মধু, আছে আশা নাহি বঁধু,
আছে নিশা, নাহি শুধু অভিসারী।
মিলনমধুর নিশি আসিবে না আর;
আজি এ চাঁদিনীধরা বিরহ বেদনা-ভরা,
আকাশের গ্রহ তারা শ্যাম-ভিখারী।

কলকাতায় ফিরে এলেন। বর্ষার সন্ধ্যা। শ্রী খগেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে তার বালিগঞ্জ ডোভার লেনের বাড়ীতে একটি গানের আসর হল। অতুলপ্রসাদকে নিয়ে এলেন খগেন্দ্রনাথ। সেই বর্ষার আসরে হঠাৎ হেমকুসুমের মুখখানা ভেসে এল—তিনি কাতর কণ্ঠে গাইলেন,

ভাঙ্গা দেউলে মোর কে আইলে আলো হাতে?
বলে দিল কে পত্র এ কালো রাতে?
এ যে কাঁটার বন, হেথা কী প্রলোভন
ঘর ছেড়ে বলে কী আশাতে?
মোর সাঁজের গান মোর করুণ তান,
শুনিলে কি তুমি দূর হতে?
তব নয়নে জল, ফুলে-ভরা আঁচল
তুমি দিবে কি মোর সাথে?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এদিকে হেমকুসুমও পুত্র দিলীপকুমারকে নিয়ে দার্জিলিং থেকে কলকাতায় চলে এলেন ল্যান্সডাউন রোডের একটি ভাড়া বাড়ীতে। দিলীপকুমারকে নিকটের একটি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন মহেশবাবু, যার উপর সব ভার দিয়ে অতুলপ্রসাদ লখনউ ছেড়ে ছিলেন। মহেশবাবু সেই থেকে হেমকুসুমের সব প্রয়োজনীয় কাজের যোগান দিতেন এবং দিলীপকুমারকে পড়াতেন।

হেমকুসুম ক্লান্ত, অবসন্ন। যে কাজ তিনি লখনউতে ঘটিয়েছেন তার জন্য অনুতপ্ত। কিন্তু সেই অনুতাপ প্রকাশ করার পথ খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যের ব্যাকুলতা মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে আবার পথহারা। আপন অন্তরের সব সোহাগ যাঁর জন্য উন্মুখ, প্রতি মুহূর্তে যাঁর সর্বাংগে একাকার হবার আর্তি, তাঁর কাছ থেকে হেমকুসুম বিচ্ছিন্ন। প্রতিরাত্রির প্রতিটি নিবিড়তায় যাঁর জন্য অপেক্ষা, যাঁর পরম আনন্দে চিত্ত-মন পুলকিত শিহরণে ধন্য হয়, সেই অতুলপ্রসাদ থেকে আজ, অনেক অনেক দূরে। কাছে থেকেও বহু যোজন দূরে, যেন অপরিচিতের অন্ধকারে উভয়ে উভয়ের কাছে একক। দিবসের সকল আকাঙ্খা যাঁর জন্য উদ্‌বোধিত হয়, রাত্রির একান্ত নিবেদনে, যেখানে সব দেবার জন্য উন্মুখ, সেই প্রেমিক সেই প্রেম যেন অবাঞ্ছিত।

হেমকুসুম যখন একা থাকেন তখন নিজের মধ্যেই কান্নায় কান্নায় আবার কেমন যেন অসাড় গভীর হতাশায় নীরব হয়ে যান। লোকজন, আত্মীয়-পরিজন তখন আর ভালো লাগে না। শুধু একা একা, একাকীত্বের অসীম নিস্তব্ধতায় নিজেকে জিজ্ঞাসা করেন, সেই অজানা কোন লোকে, যেখান থেকে অতুলপ্রসাদেরই গানের মূর্ছনায় চেতনা ফিরে পান। সমস্ত দেহপল্লবের ছন্দময় রক্ত সঞ্চালনে নূতন করে জীবনের কথা, জীবনের আশা-আকাঙ্খার বাসা বাঁধার সংকল্পে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এখন শুধু নিবেদন আর অনুশোচনা। পিয়ানো বাজিয়ে অতুলপ্রসাদেরই গান গেয়ে উঠেন—

কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা।
আমি পথের ভিখারি নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতো
অন্তর পাতি রহি গো!
শুধু তব ধন করি আশ
আমি পরিয়াছি দীন বাস;
শুধু তোমারি লাগিয়া গাহিয়া গান
মর্মের কথা কহি গো—

অতুলপ্রসাদ সেন

অতুলপ্রসাদের হস্তলিপি
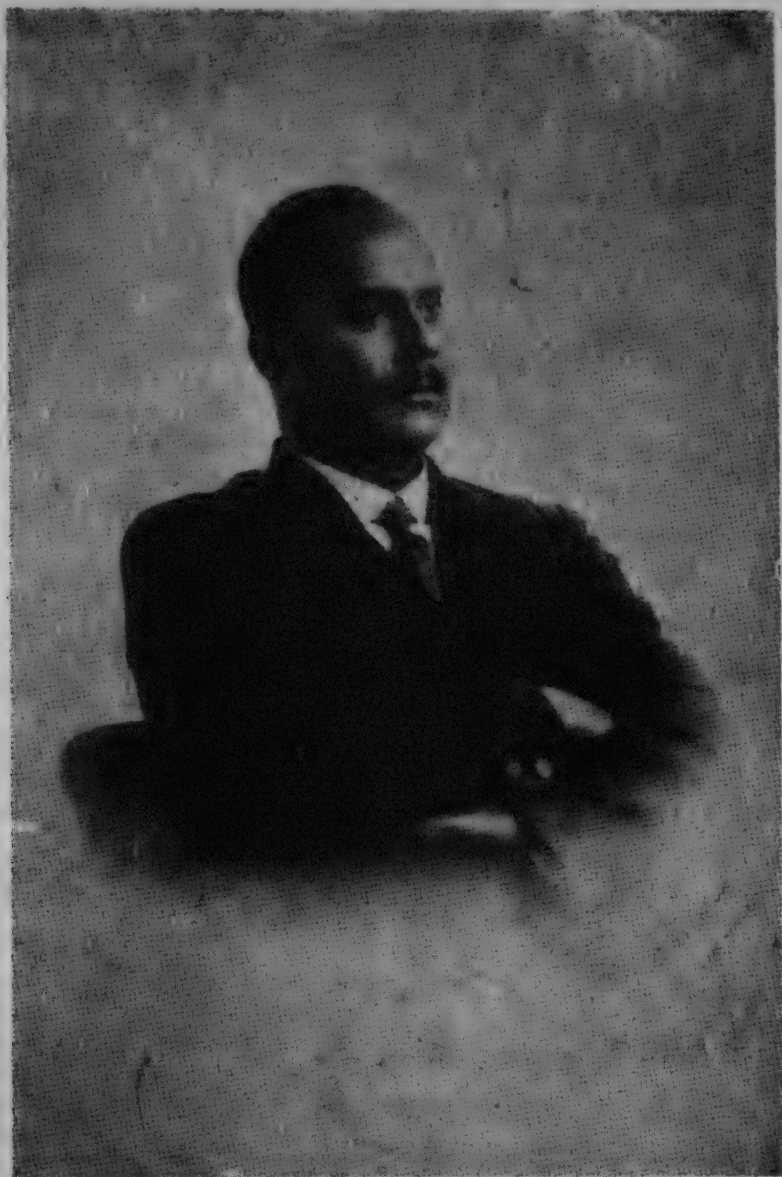
মম সঞ্চিত পাপ পুণ্য,
দেখো, সকলি করেছি শূন্য;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে তাই
রিক্ত হৃদয় বহি গো।

শেষ দুটি পঙ্‌ক্তি হেমকুসুম বারবার পিয়ানোর স্বরাঘাতে গেয়ে গেয়ে চোখের বন্যায় নিজেকে নিবেদন করছেন। আবার প্রাণ মাতিয়ে বেদনাসিক্ত কণ্ঠে হেমকুসুম গাইলেন,

ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল,
যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে—
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে বঁধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে—
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়
যে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির রাতে।

অতুলপ্রসাদের এই গানটি হেমকুসুম খাতার পাতা থেকে তুলে আপন সুরে গাইলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ তা জানতেন না। এমনি কত রাত্রির অভিসার বিফল হয়েছে, কত বেদনার রাত্রি গ্রাস করে নিয়েছে উভয়ের নিবিড় সান্নিধ্য ব্যাকুলতা। আজ শুধু কান্না আর কান্না। সেখানে সমবেদনা জানাবারও কেউ নেই। হেমকুসুম মাঝে মধ্যে নিজেকে সংবরণ করতে না পেরে তারই অতুলপ্রসাদের গানের সুরে নিজেকে আচ্ছন্ন করে নিজের মধ্যেই লয় পেতে চায়। এই লয় শেষ নয়, এ যে সব পাবার জন্য অহংকারের লয়—এত বড় প্রাপ্তির মুহূর্তের রসাস্বাদ আকণ্ঠ পান করার সে কি কাতরতা!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯১৬ সাল। লখনউতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। লখনউ-এর

স্থানীয় দায়িত্বশীল প্রভাব প্রতিপত্তিসম্পন্ন মানুষরা—মির্জা সামীউল্লা বেগ, গোকরনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব কিংকর্তব্যবিমূঢ়। এত বড় আয়োজনে মুকুটহীন সেনসাহেব না থাকলে কে সামলাবে! কে এত বড় অনুষ্ঠানের সফলতার জন্য বিভিন্নভাবে পরিচালনা করবে? তা'ছাড়া গান্ধীজী আসবেন, আসবেন আরো তাবৎ তাবৎ বড় মাপের ভারত নেতা! সবাই চিন্তিত কী করেন, কী করবেন। স্থির করা হল, কলকাতায় গিয়ে অতুলপ্রসাদকে সব বুঝিয়ে সুজিয়ে লখনউতে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা। যেই স্থির, সেই কাজ। মির্জা সামীউল্লা সহ মিশ্রজী এবং শ্রীবাস্তব তিনজন কলকাতায় গেলেন। অতুলপ্রসাদ তাঁদের দেখে খুবই আনন্দিত। নানা কুশল বিনিময়ের পর সামীউল্লা বললেন,—সেন সাহেব, আপনি তো শুনেছেন ভারতীয় কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন আপনার লখনউতে অনুষ্ঠিত হবার কথা হয়েছে ডিসেম্বর মাসে। এ সময়ে আপনার অনুপস্থিতি এবং আপনাকে ছাড়া এ অধিবেশনের কথা আমরা ভাবতেই পারছি না। অনেকদিন তো হল কলকাতায় থাকলেন, এবার চলুন লখনউতে; বাকী সময়টা সেখানেই থাকবেন লখনউবাসীর সুখে দুঃখে সমব্যথী হয়ে। আমরা তাই আপনাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছি।...

অতুলপ্রসাদ নীরব। ভেতরে ভেতরে কান্নার রোল যেন জোর করে কিছু বলতে চায়—কিন্তু সেটা যে একান্তই নিজস্ব, একান্তই গোপন, যেখানে আর কারো প্রবেশ সম্ভব নয়, নিজের ভেতর থেকে আরো ভেতরে আরো অন্তর্লীন হয়ে যাবার।

হঠাৎ স্মিতহাস্যে অতুলপ্রসাদ আবার লখনউতেই যাবার কথা জানালেন। পুলকিত আনন্দে ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আগত তিনজন সেদিন তাদের প্রিয় সেনসাহেবকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বিদায় নিলেন।

কলকাতায় থাকাকালীন অতুলপ্রসাদ জেনেছিলেন লখনউতে এবার কংগ্রেসের অধিবেশন হবে। লখনউতে কংগ্রেসের অধিবেশনের উদ্দেশ্যে তিনি ইতোপূর্বে একটি গানও রচনা করেছিলেন এবং লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের উপস্থিতিতে তা নিজ কণ্ঠে শুনিয়েছিলেন। আজ সেই গানের পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে বার বার গুন্‌গুনিয়ে নিজের ভেতর বাজিয়ে নিচ্ছেন। ভারতের অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় পরাধীন ভারতের ক্লীবত্ব এবং অলসতা দূর করে ভারতবর্ষকে জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ স্থানে প্রতিষ্ঠিত করার যে সাধনা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, ধর্মে-সাহিত্যে-দর্শনে সর্বত্র একটা বিপুল আয়োজনের সাধনা চলেছে তার দিকে ভারতবাসীর দৃষ্টি-মনন ও শক্তিকে ধাবিত করার জন্য অতুলপ্রসাদ গানটি রচনা করেছিলেন।

বলো বলো বলো সবে, শত বীণা-বেণু রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে!

অতুলপ্রসাদ স্থির যখন করেছেন লখনউতে কংগ্রেস অধিবেশনে উপস্থিত থাকবেন, সেইমত তিনি কলকাতা ছাড়লেন। লখনউতে তিনি সামীউল্লা বেগের বাড়ীতে অতিথি। অতুলপ্রসাদের লখনউ আগমন সংবাদ প্রচারের সাথে সাথে লখনউ নগরীর নেতৃস্থানীয় মানুষজন অতুলপ্রসাদের কাছে এসে ভীড় করল। এরপরই শুরু হয়ে গেল অভাবনীয় উৎসাহ ও উদ্দীপনার তেজে অধিবেশনের কাজ; নেতা অতুলপ্রসাদ। পরামর্শ, ছোটখাট সঙ্ঘবদ্ধ সভা এবং আনুপূর্বিক ছবির মত নক্‌শা করে কাজের ভার দেওয়া ইত্যাদি কাজ দিন রাত চলছে—ক্লান্তি নেই, নেই কোন বিরোধ। যখনই কোন সমস্যায় কোন নেতৃত্ব থম্‌কে গেছেন—অতুলপ্রসাদ তা সচল করে দিয়েছেন।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি জগৎনারায়ণ মোল্লা। সভাপতি তাঁর সুবিধার জন্য চার জন সম্পাদক বেছে নেন—তার মধ্যে অতুলপ্রসাদ একজন। অতুলপ্রসাদ শুধু সম্পাদক নন, শৃঙ্খলা রক্ষার স্বেচ্ছাবাহিনীর অধিনায়কও সর্বসম্মতভাবে নির্বাচিত হলেন। অতুলপ্রসাদ তাতে খুশি, যুব সমাজের সাথে সাথে নিজেকে রাখতে পারবেন।

সমগ্র লখনউ নগরী নতুন সাজে অভিনন্দিত। লখনউ রেল স্টেশনের সম্মুখভাগে অধিবেশনের জন্য প্যাণ্ডেল তৈরী হয়েছে। প্যাণ্ডেলের দু'পাশে প্রতিনিধিদের এবং নেতৃবৃন্দের জন্য থাকার ব্যবস্থা অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজস্ব রুচি ও ব্যবস্থায় সকলের কাছে আকর্ষণীয় করেন।

কর্ম-চঞ্চল, কোমল-কঠোর নির্দেশ ও অনুরোধে অতুলপ্রসাদ-এর ভাবনা সমগ্র লখনউবাসীকে কংগ্রেসের অধিবেশনে সামিল করেছেন যা কখনও কংগ্রেসে এ যাবৎকাল সম্ভব হয়নি।

একে একে কংগ্রেস সভাপতি অম্বিকাচরণ মজুমদার, মহাত্মা গান্ধী, লোকমান্য তিলক, সরোজিনী নাইডু, বিপিন পাল, অমল হোম প্রভৃতি ভারত-ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি সারা ভারত তথা বিশ্বের চোখ নিবদ্ধ করেছে।

অতুলপ্রসাদ কংগ্রেস কম্পাউণ্ডের তাঁবুতে বাস করেন। ভলানটীয়ার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক অতুলপ্রসাদের পরনে যোধপুরী পায়জামার উপর খাঁকী রঙের ইউনিফর্ম কোর্ট, মাথায় রাজপুত পাগড়ী। বুকে কর্ড দিয়ে বাঁধা হুইস্‌ল, হাতে একটি ছড়ি। ধনী-দরিদ্র, মডারেট, একসট্রিমিস্ট, রাজা-নবাব, রইস, রায়ৎ, অধ্যাপক, স্কুলমাস্টার, উকিল, ব্যারিস্টার, হিন্দু-মুসলমান সকল শ্রেণীর মানুষ

অতুলপ্রসাদের উদ্যোগে কংগ্রেস অধিবেশনে এসেছেন। সবার যে প্রিয় অতুলপ্রসাদ। ওঁদের কাছে 'সেন সাহেব', 'ভাই সাহেবের' আহ্বান যে খোদার আহ্বান। অতুলপ্রসাদের সুরারোপিত সঙ্গীত একক কণ্ঠে 'ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

....

আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী;
যায় নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী—
এখনো অমৃতবাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে গৌরব কাহিনী।

....

বিদূষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি—
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
অনলে দহিয়া রাখে যারা মান,
পতি-পুত্র তরে সুখে ত্যজে প্রাণ,
আমরা তাঁদেরই সন্ততি।

....

ভোলে নি ভারত, ভোলে নি সে কথা—
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
সকল ভারত-নন্দনে।
ভুলি ধর্ম-দ্বেষ জাতি-অভিমান
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক প্রাণ
এক-জাতি-প্রেম বন্ধনে।

....

মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজ-কুল জন্মে নি মিছে।

দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে
আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য,
আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে

....

এসো হে কৃষক কুটির-নিবাসী,
এসো অনার্য গিরিবনবাসী,
এসো হে সংসারি, এসো হে সন্ন্যাসী,
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত,
পর-হিত-ব্রতে হইয়া দীক্ষিত
মিল' হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ খ্রীষ্টীয়ান,
মিল' হে মায়ের চরণে।।

মিশ্র খাম্বাজে গানের সুর ও ভাষায় মন্ত্রমুগ্ধতায় সমগ্র অধিবেশন যেন সকলের প্রাণে এক রোমাঞ্চ জাগিয়ে গেল। বিপিন পাল, লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলক, সরোজিনী নাইডু মঞ্চ থেকে নেমে অতুলপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে গেলেন।

কংগ্রেসের লখনউ অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ তাঁর জীবনের সকল শক্তি ও নিষ্ঠার প্রতিটি উৎস থেকে শ্রেষ্ঠতম সম্পদ আহরণ করে উৎসর্গ করেছিলেন—স্বদেশ প্রেমের আর্তি দিয়ে, লোকহিতৈষণার দুর্বার পরিশ্রমে।

কিন্তু রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ভারতবাসীর তথা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার যে রূপরেখা লখনউ কংগ্রেসে লিপিবদ্ধ হ'ল এবং নেতৃবৃন্দের যে মানসিকতা বিভিন্ন দিনের বিষয়ভিত্তিক আলোচনায় স্থান পেয়েছিল তাতে অতুলপ্রসাদ হতাশ হয়েছেন—কংগ্রেসের কর্মধারার প্রতি ভরসা হারিয়ে ফেললেন। এবং নিজের সাথে ভাবনা ও আদর্শের সংঘাতে দীর্ণ-বিদীর্ণ অতুলপ্রসাদ কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

বেশ কিছুদিন নীরবে থেকে অতুলপ্রসাদ লিবার‍্যাল ফেডারেশনে যোগদান করেছিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সারা ভারতে **'আওয়ার ডে'** ফান্ডের প্রচলন হয়। নানাবিধ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 'আওয়ার ডে'-এর জন্য টাকা তোলা হয়। অতুলপ্রসাদ সে কাজে খুবই অগ্রণী। সীতাপুরে সেই 'আওয়ার ডে' অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ সম্মিলিত কনসার্ট পার্টির মাধ্যমে স্বরচিত গান গেয়ে গেয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে যে গানটি তিনি রচনা করেন পরবর্তী সময়ে বাঙলার ঘরে ঘরে নানা অনুষ্ঠানে গাওয়া হত।

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির—নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান—হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান্;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়,
জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নাহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুনঃ আসিবে সুদিন—
ওই দেখো প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে—
সত্যের নাহি পরাজয়
সত্যের নাহি পরাজয়।

গানটি সম্মিলিত কণ্ঠে গীত হলেও পরবর্তী সময়ে বহু বাঙালির চিন্তা ও চেতনার বেলাভূমিতে সমাজকর্মে, সাংস্কৃতিক নানাবিধ অনুষ্ঠানে—রাজনৈতিক ভাবনায় আদর্শশক্তির সঞ্চার করেছিল। ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবোধের মূল ধারাটি এমনভাবে চারণ সঙ্গীতে খুবই কম শোনা যায়। বাঙলার বাঘ স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এই গানে মাতোয়ারা হতেন।

এই **'আওয়ার ডে'** উপলক্ষ্যে অতুলপ্রসাদ আরোও একটি গান রচনা

করেছিলেন—সেটিও তিনি ইমনকল্যাণ রাগে গেয়ে শুনিয়েছিলেন একটি বৈঠকে—

নমো বাণী বীণাপাণি, জগত-চিত্ত-সম্মোহিনী
নমো বাদ-সংগীত-মাতঃ ভারতী ভবতারিণী।
সৌরলোক গীতচালিত, দ্যুলোক ভূলোক গীতমুখরিত;
ষড় ঋতু ষড়রাগরঞ্জিত বন্দে চরণে বন্দিনী।
সুপ্ত স্মৃতি পুনঃ জীবিত, শান্ত তৃপ্ত তাপিত চিত,
সুখী জন সদা নন্দিত তব সংগীত ছন্দে।
প্রেমমুখর মুরলী-রন্ধ্র, সমরে ডমরু মরণমন্ত্র,
গীত আদি-বেদ-মন্ত্র তব সংগীত ছন্দে।
নমো ঈশ্বরনন্দিনী।

বাঙলা তথা ভারতমাতার প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ বাড়াবার জন্য একসময় জাতীয় নেতৃত্বে যাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন অতুলপ্রসাদ তাদের মধ্যে অন্যতম। অতুলপ্রসাদ শুধু গান গেয়ে নিজেকে সামাজিক জীবনের নানাবিধ সেবাকাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার একটাই উদ্দেশ্য—তা'হল ভারত ঐতিহ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেতনার উদ্‌বোধনে সাহায্য করা, আর সেই চেতনালোকে ভারতের শক্তিতে গৌরব অনুভব করা। অতুলপ্রসাদ দিন-রাত এই আদর্শবোধে উদ্‌বোধিত। তিনি সকলের প্রাণে ও তার জাগরণ হোক এটাই তাঁর একমাত্র আকাঙ্খা। লখনউ-এর হিন্দু-মুসলমান রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব দীর্ঘদিন ধরে বিরাজ করছিল। অতুলপ্রসাদের উদ্যোগে বিশেষ করে সমাজসেবামূলক কাজে হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে গভীরভাবে যুক্ত করে প্রমাণ করেছিলেন—মানুষের মধ্যে ভেদ শুধু নামে। ধর্ম কখনও বিভেদের কারণ হতে পারে না—ধর্ম সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিগত আচরণ, আর তার প্রকাশ আপন আপন রুচি ও সংস্কৃতির ধারার মধ্যে একে অপরের সান্নিধ্যে পুষ্টি লাভ করে। লখনউ-এর হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবোধকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়ে রাজনৈতিক কর্মধারাকে প্রসারিত করার গভীর প্রয়াসে ব্রতী ছিলেন অতুলপ্রসাদ। তাঁকে ঘিরে যাঁরা সকল সময় নানাবিধ কাজে যুক্ত থাকতেন তাদের অনেকেই ছিলেন লখনউ নগরীর নেতৃত্বস্থানীয় মুসলমান এবং অতি দীন কুঠিরবাসী দরিদ্র-রিক্সাওয়ালা-টাঙ্গাওয়ালা-ফেরিওয়ালা মুসলমানরা—যাদের কাছে অতুলপ্রসাদের একটিমাত্র পরিচয় 'ভাইদাদা'। এই ভাইদাদার প্রচেষ্টায় লখনউ-এর হিন্দু-মুসলমানের নেতৃত্বে Political Pact জাতীয় রাজনীতিতে, বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

লখনউ কংগ্রেসের কাজ শেষ হবার পর অতুলপ্রসাদ কলকাতায় এলেন—সেই 'মানডে ক্লাবে'ও মাঝে মধ্যে যাওয়া হচ্ছে—কিন্তু তাঁর মন বিভোর হয়ে টানছে সেই লখনউ—সেই ঠুংরী-দাদার সুর অভিষিক্ত আকাশ বাতাসের মোহময় আকর্ষণে।

সারাদিনের নানাবিধ কল-মুখর কাজের পর যখন একান্ত হয়ে অতুলপ্রসাদ বিশ্রাম করেন তখনই নিজেকে পান, নিজেকে খোঁজেন। সেখানে শুধু বিষাদের দীর্ঘশ্বাস সারাক্ষণ কুঁকড়ে মারছে—হেমকুসুমের নৈর্ব্যক্তিক হাতছানি অতুলপ্রসাদের অভিমানদ্যোতক হৃদয়কে প্রচণ্ড আঘাত করছে; কিন্তু কোথায় যেন 'আমি'র বাধা। সেই 'আমি'কে অতিক্রম করার জন্যই তো অতুলপ্রসাদের ব্যাকুলতা।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ নিজেকে আরো দূরে, আরো একান্ত কাজের মধ্যে জড়িয়ে রাখার জন্য কলকাতার প্র্যাকটিস ছেড়ে লখনউতেই পুনরায় স্থায়ীভাবে থাকা স্থির করলেন।

ইতোমধ্যে অতুলপ্রসাদ কংগ্রেস রাজনীতি ছেড়েছেন—কিন্তু গান্ধীজীর প্রতি ছিল তাঁর অসীম শ্রদ্ধা—তাঁর সমাজসেবা, হরিজনদের প্রতি কর্মধারা অতুলপ্রসাদের চিত্তভূমিতে এক গভীর শ্রদ্ধায় অঙ্কিত। তাই 'বঙ্গীয় হিতসাধন মণ্ডলী'র উদ্যোগে কলকাতায় অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া সোস্যাল সার্ভিস কনফারেন্স্-এ অতুলপ্রসাদ পরামর্শ দিয়েছিলেন গান্ধীজীকে সভাপতি করার। সেইমত গান্ধীজীকে সভাপতি করা হয়েছিল।

অতুলপ্রসাদ পুনরায় স্থায়ীভাবে থাকার জন্য লখনউ এলেন। সময়টা ১৯১৭ সাল।

আবার ব্যারিস্টারী কাজের ফাঁকে ফাঁকে সমাজসেবা—আর্তজনের পাশে পাশে নিজেকে সঙ্গ দেওয়া আর লখনউ নগরীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য পরিকল্পনা করা এবং সে কাজে যুক্ত হওয়া। খাবার-বিশ্রামের সময়টুকুও লখনউবাসীর কাছ থেকে পুরোপুরি পেতেন না। কিন্তু তাতে অতুলপ্রসাদ এতটুকু ক্ষুণ্ণ বা ক্লান্তি বোধ করতেন না।

অতুলপ্রসাদ মাঝে মাঝে কলকাতায় আসেন—কখনো হোটেলে, কখনো বন্ধুদের বাড়ীতে, ডাঃ দ্বিজেন মৈত্রের সঙ্গে হাসপাতালের কোয়ার্টারে, কখনো বা আত্মীয় 'ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্যে'র বাড়ীতে। গান-আড্ডা-মানডে ক্লাব-সাহিত্য আসর সহ নানা অনুষ্ঠানে যোগদান করে লখনউ চলে যান। হেমকুসুম দিলীপসহ কলকাতায়, ল্যান্সডাউন রোডে। দিলীপকে পড়ায় মহেশবাবুও ওদের বাড়ীতেই থাকেন।

অতুলপ্রসাদ সব জানেন। খরচ-পত্তর সব সময়মত পাঠান—কিন্তু কলকাতায় এলে দেখা করেন না।

এদিকে হেমকুসুমও অসুস্থ—শরীরে ও মনে। মাঝে মাঝে নানা কারণে—কখনো বা অকারণে লখনউ-সেই ঘর, সেই পিয়ানোর সামনে বসে আলাপ... সব যেন আজ শুধু হারিয়ে গেল। জিদ্ এত তীব্র যে, অসুস্থতার মধ্যেও পুত্র দিলীপ যখন বলে, ...মা, এবার বাবাকে খবর দেই—তোমার চিকিৎসা হবে—তখনও হেমকুসুম তীব্রভাবে বারণ করেন। অভিমান অত্যন্ত গভীর—অত্যন্ত নির্ম্মম—অত্যন্ত নিষ্ঠুরতা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

দিলীপ সব বোঝে—কিন্তু সে অসহায়। মা'র অসুস্থতায় সে দিশেহারা। মা'র অমতে তাই মহেশবাবুর পরামর্শে দিলীপ লখনউ যাবার কথা স্থির করল।

এমনি এক দুপুরে পুত্র দিলীপকুমার লখনউতে এলেন। পিতাকে বললেন, মা'র শরীর খুব খারাপ—খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন—দিন দিন শরীর ভেঙ্গে পড়ছে। মা'কে তোমার কাছে এখানে নিয়ে এস বাবা! মা খুবই অসহায় হয়ে পড়েছেন—বাবা, মা'কে এখানে নিয়ে এস।

অতুলপ্রসাদের অন্তরটা হাহাকারে কেঁদে উঠল—চোখদুটো জল ভরা মেঘে কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে গেল। 'তোমার কাছে নিয়ে এসো বাবা' এ যে আর্তনাদ! কী উত্তর দেবে অতুলপ্রসাদ! হেমকুসুম যে আমার, আমি যে হেমকুসুমের—কিন্তু বলা গেল না। কিছুটা আনমনা হয়ে অতুলপ্রসাদ পুত্র দিলীপকুমারকে কাছে টেনে এনে হেমকুসুমের স্বাস্থ্যের অবনতির সংবাদ নিলেন ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

দিলীপকুমার কাঁদো কাঁদো কণ্ঠে অভিমানের সুরে সব বলেন, আবার কিছু বলেন না—মা-বাবার বিরোধের জন্য কে দায়ী—কাকে দোষ দেবে, কাকে অভিযুক্ত করবে, কী অভিযোগ। সব যেন কেমন একই সঙ্গে ঘিরে ফেললো, সব বলতে গিয়েও বলতে পারলেন না। পুত্রের কণ্ঠে জড়তার প্রকাশ অতুলপ্রসাদের চিত্তকে যেন আরো আরো উৎকণ্ঠায় দিশেহারা করে তুলল।

'মাকে এখানে তোমার কাছে নিয়ে এসো বাবা' দিলীপকুমারের কথাগুলি বার বার বেজে উঠল অতুলপ্রসাদের শ্রান্ত বিরহী মনে।

বললেন, টাকা দিচ্ছি, মহেশ কাকাকে বলে মাকে সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে এস।

... তুমি নিজে চল বাবা, মাকে তুমি সঙ্গে করে নিয়ে আসবে—চল বাবা—দিলীপকুমারের এই আবদার যেন হিমালয়ের গা বেয়ে অজস্রধারায় সকল অভিমানের পাষাণ ধ্বসে পড়লো—আবার চোখদুটো ঘোলা হয়ে গেল—মনে

মনে বলছেন—নিশ্চয়, আমিই যাবো, ও যে আমার হেম, আমার হেম। আমি ছাড়া আর কে যাবে ওকে আনতে!

কিন্তু লখনউতে যে অনেক পূর্ব নির্ধারিত কাজ রয়েছে। কর্তব্য আর বিরহাকুল চিত্তের দ্বন্দ্ব গভীরভাবে অতুলপ্রসাদকে আক্রান্ত করল। হৃৎপিণ্ডটা যেন ওলোটপালোট হয়ে যায়—চোখ-নাক সিক্ত হয়ে শুধু পুত্রের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে চায়—

... 'যাহার সৌরভে মাতি ফিরিতেছ বনে বনে
যার লাগি শত কাঁটা বিঁধেছে তব চরণে
নব প্রেম-বিকশিত সে ফুল তোমারই মন।

...

নিজেকে সামলে নিয়ে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বললেন, এখানে সবেমাত্র এসেছি—অনেক কাজ অপেক্ষা করছে দিলীপ, কোর্টে ছুটি নেই। তুমিই তোমার মাকে এখানে নিয়ে এস।

এই বলে অতুলপ্রসাদ পুত্রের হাতে বেশ কিছু টাকা দিলেন, বললেন, কলকাতার হিসেব চুকিয়ে দিয়ে প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটে তোমরা চলে এস। এখানে এলে ভাল করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সহজ হবে।

পুত্র দিলীপকুমার কলকাতায় চলে গেলেন।

সেই দিলীপকুমার চলে যাবার পর রাত্রিতে অতুলপ্রসাদ একাকী বসে আছেন। বার বার 'তুমি নিজে চল বাবা, তুমি মাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।' কথাগুলি অতুলপ্রসাদকে তাড়া করছে—অতুলপ্রসাদ তাঁর স্বাভাবিক স্নিগ্ধ কোমল ভাবাবেগে কথাগুলির মধ্যে প্রিয়ার মুখখানি এঁকে এঁকে গাইলেন,

কার লাগি সজল আঁখি, ওগো সুহাসিনী?
হৃদয়ে তব কি ব্যথা নব, ওগো হৃদয়-বিলাসিনী?
প্রভাত-ফুলে তারই হাসি দেখিয়া কি মন উদাসী?
দেখালো কি তার আঁখি নিঠুর নিশীথিনী?
অঙ্গনে বিহঙ্গগীতি তারই কি আহ্বান স্মৃতি
কারে যাচি' মৌন আজি, ওগো সুভাষিণী?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ জুনিয়র ব্যারিস্টার হেমন্তকুমার ঘোষকে খুবই ভালবাসতেন। হেমন্তকুমারও অতুলপ্রসাদের পরামর্শ মত কাজ করে ব্যারিস্টারী জগতে প্রতিষ্ঠা

অর্জন করছেন। প্রতিটি মুহূর্ত অতুলপ্রসাদের নিবিড় সান্নিধ্যে হেমন্তকুমার থাকতেন। অতুলপ্রসাদও তার স্বাভাবিক স্বভাবে তার জুনিয়রদের সহযোগিতা করতেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এদিকে কলকাতা পৌঁছে দিলীপকুমার দ্রুত সব বিধিব্যবস্থা করে মাকে সঙ্গে করে লখনউ রওনা হলেন—পথ শুধু পথ; ফুরাতে চায় না, হেমকুসুমের যে আর সহ্য হয় না—কত কাল কত রাত্রি—আর নয়—কখন ভোর হবে—আমি মিলব—আমার অতুলপ্রসাদের বক্ষে লুটিয়ে পড়ে বলব, এই লও, আমার সব অভিমান অহংকারের বাধভাঙ্গা চোখের জল, ধুয়ে দিলাম তোমার ঐ স্তব্ধ চরণ দুটো—তুলে লও, আমরা এক হই। কত কেঁদেছি, কত অভিমানে হারিয়েছি কত সম্পদ-আর নয়-আর নয়-খোলো দ্বার, খোলো দ্বার। ভেতর থেকে প্রশ্ন আসে—কে? বার বার বলে 'আমি'। কিন্তু দ্বার খুলল না। আবার ক্লান্ত হয়ে অবসন্ন হয়ে ফিরে গিয়েছি—অভিমানে রক্ত টগ্‌বগ্ করে আমাকে দূরে অনেক দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে। আবার উঠেছি, আবার ছুটে গিয়ে বলেছি—খোলো, দোর খোলো আর যে পারছি না। ভেতর থেকে সেই একই প্রশ্ন—কে? আমিও চিৎকার করে বলেছি, আমি। সব স্তব্ধ হয়ে গেল। চারিদিক হঠাৎ নিশ্চুপ হয়ে গেল—কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। এবার আর নয়; নিজেকে নিঃশেষ করেই দোরে থেকে যাব—একদিন না একদিন বেরিয়ে সে আসবেই; তখন সর্বস্ব দিয়ে জড়িয়ে বলব, আমার সব লও—আমাকে তুলে ধরে তোমার ঐ বক্ষলগ্ন আলিঙ্গনে, আমার সব জ্বালা জুড়ায়ে দাও। এমনিভাবেই আবার দোরে এসে বললাম, খোলো দার, আবার সেই প্রশ্ন 'কে'? বললাম, 'তুমি'। নিমেষের মধ্যে দরজা খুলে গেল—দেখি এগিয়ে এসে সর্বাঙ্গ দিয়ে জড়িয়ে একাকার হয়ে ভিতরে নিয়ে গেলে—বিরোধের আর সূত্র নেই। উভয়ে এক, অনন্য। বাহির আর ভেতর এক হয়ে গেল।

সারাটা রাস্তা হেমকুসুম পুলকানন্দে ভাবতে ভাবতে অবশেষে লখনউ স্টেশন—সেই রাস্তা, সেই ব্যস্ত পরিবেশ, সেই সব পরিচিত মুখ, যেন অভাবনীয় এক বিমূর্ত আনন্দে উৎসারিত চোখ-মন কত কি করার জন্য ব্যাকুল। কেশরবাগে সেই বাড়ী, সেই ঘর—এই তো সেই পিয়ানো, সেই জলচৌকি—সব যেন একই রকম আছে—সেই বাগান, কত বিচিত্র প্রতিদিনের প্রস্ফুটিত ফুল, কত পরিচিত ঘর আর বাইরের গন্ধ—কে বলে আমি নেই, ছিলাম না। সবই যেন এই তো এখুনিই ছিলাম—কল্পনাও করা দুরূহ যে আমি ছিলাম না—এঘর ওঘর ঘুরে ঘুরে

সব কিছু একান্ত পরিচিত, একান্ত নিজস্বতার ছোঁয়ায় যেন এখনও স্পষ্ট, এখনও সজীব। 'কে বলে এই সকালে আমি ছিলাম না আমি নেই'—হেমকুসুম ঘরে ঢুকেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আজ যে সব হারিয়ে সব পাওয়া গেল—কিছু না হারালে পরমকে পাওয়া যায় না। অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্যে এসে হেমকুসুম সকল বেদনার অবসান ঘটিয়ে নবীন সাজে নবনীয়মান চেতনায় পুলকিত, আনন্দিত। সব পেয়েছি, আমি পূর্ণ, আমি পরিপূর্ণ, আমার সকল ব্যথার হল অবসান।

হেমকুসুমকে উৎফুল্লতা তাড়িত করছে অনবরত—অতুলপ্রসাদও কম উৎফুল্ল নন—কী যেন পাওয়া গেল, যার জন্য দীর্ঘপথ অতিক্রম করে পথের 'সীমানায়' এস মুখোমুখি দাঁড়িয়ে—শুধু চেয়ে চেয়ে দেখা আর দেখা। কথা নেই, এক প্রসন্ন ধ্যান-নীরবতা যেন ক্ষণিকের মধ্যে উভয়কে আচ্ছন্ন করল—সব, সব কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে—। শুধু চেয়ে থাকার অফুরন্ত সীমাহীন আনন্দের উৎস ধারায় উভয়ে অভিসিক্ত, নন্দিত। উভয়ের কুশল সংবাদে যেন ক্লান্তি নেই, নেই সময় ক্ষণ। বুক জোড়া আলিঙ্গনে সকল পিপাসার আর্তি যেন একমুহূর্তে একাকার হয়ে গেল—উভয়ের 'আমি' 'তুমি' হয়ে গেল।

মালপত্তর গুছিয়ে দিলীপকুমার ভেতরে এলেন। হেমকুসুম হেলান-চেয়ারে অতুলপ্রসাদের কাছে বসা। এত অনুরাগ ভরা আন্তরিকতায় আবিষ্ট উভয়ের হৃদয়, ঘরের পরিবেশকে মায়াময় করে তুলল। প্রতিটি আসবাবপত্রে তার ছোঁয়া ঘন হয়ে উঠল। ফিরে এল সাংসারিক মাধুর্য, ব্যস্ত হয়ে উঠল খানসামা নবাব আলি। অনেক বয়েস হয়েছে নবাব আলির, অনেক কিছু দেখেছে সে—কিন্তু অতুলপ্রসাদ আর হেমকুসুমের এমন নিবিড়তা আর কখনও দেখেনি—খোদার দরবারে প্রার্থনা—খোদা, এদের এমন করেই রেখ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ঐদিন রাত্রিতে অতুলপ্রসাদ একটি মামলার ব্যাপারে সীতাপুরে চলে গেলেন। সীতাপুরের ডাকবাংলোয় জুনিয়র হেমন্তকুমার সহ উঠেছিলেন। সারাদিন মক্কেলের সাথে মামলা সংক্রান্ত অলোচনায় উভয়ে ব্যস্ত। সন্ধ্যার পরও সেই মামলার আলোচনা—ভোজন পর্ব শেষ হবার পর অতুলপ্রসাদ ও হেমন্তকুমার পাশাপাশি দুটি চেয়ারে বারান্দায় বসে নিজেদের মধ্যে বৈষয়িক আলোচনায় রত। আকাশের রং দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে, মেঘ আর আকাশ আলাদা হয়ে গেল—ঠাণ্ডা হাওয়ায় সমস্ত পরিবেশ একটা মিষ্টি আমেজে আচ্ছন্ন হচ্ছে দ্রুত। মাঝে মাঝে সাদা পুঁতির মালার মত গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল—।

অতুলপ্রসাদ ও হেমন্তকুমার উভয়ের অবচেতন মন থেকে কথা বন্ধ হয়ে গেল—উঠে পড়লেন—বৃষ্টির ছোট ছোট ফোঁটা গায়ে, ভেতরে উপচে পড়ছে। উভয়ে ভেতরে চলে গেলেন। হেমন্তকুমার কী যেন বলতে যাবেন—দেখলেন, অতুলপ্রসাদ চিন্তামগ্ন, নিশ্চুপ তন্ময়তায় আবিষ্ট। কথা না বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন। বৃষ্টি বেশ জোরে সোরগোল পাকিয়ে ঠাণ্ডার আমেজ ছড়িয়ে দিল। হেমন্তবাবু শোবার ব্যবস্থা করবেন—তার আগে আবার অতুলপ্রসাদের ঘরে গেলেন বলতে, খোলা দরজাটা বন্ধ করতে। দেখলেন, ঘরের নিভৃত কোণে টেবিল ল্যাম্পের আলোয় নিচে উপুড় হয়ে বসে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত অস্বাভাবিক মনোযোগে কী লিখছেন আর মাঝে মাঝে গুনগুনিয়ে উঠছেন। হেমন্তকুমার অত্যন্ত সন্তর্পণে কিছুমাত্র বিব্রত না করে নিজেই খোলা দরজা বন্ধ করতে যাবেন সেই মুহূর্তে অতুলপ্রসাদ সটান উঠে দাঁড়িয়ে কাগজ কলম হাতে সজোরে গেয়ে উঠলেন,

বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে।
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে।
ডাকিছে দাদুরী মিলনতিয়াসে,
ঝিল্লী ডাকিছে উল্লাসে।
পল্লীর বঁধু বিরহী বঁধুরে
মধুর মিলনে সম্ভাষে।
আমারো যে সাধ বরষার রাত
কাটাই নাথের সাথে।—
নিদ্ নাহি আঁখিপাতে।
গগনে বাদল, নয়নে বাদল
জীবনে বাদল ছাইয়া;
এসো হে আমার বাদলের বঁধু
চাতকিনী আছে চাহিয়া।
কাঁদিছে রজনী তোমার লাগিয়া,
সজনী তোমার জাগিয়া।
কোন্ অভিমানে হে নিঠুর নাথ,
এখনো আমারে ত্যাগিয়া?
এ জীবন-ভার হয়েছে অবহ,
সঁপিব তোমার হাতে।
নিদ্ নাহি আঁখিপাতে।।

হেমন্তকুমার নিশ্চল, পাষাণবৎ, বিরহের আকুল কান্না শুনে। ক্লান্ত অতুলপ্রসাদ ধীরে ধীরে শয্যায় নিজেকে এলিয়ে দিলেন কোনমতে।

রাত্রি শেষে—ভোরেই অতুলপ্রসাদ, হেমন্তকুমার সীতাপুর ত্যাগ করলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ পৌঁছে অতুলপ্রসাদ কেশরবাগ বাড়ীতে প্রবেশ করেই দ্রুত আকণ্ঠ কণ্ঠে হেম, হেম বলে ডাকলেন। হেমকুসুমও সবেমাত্র শয্যাত্যাগ করে প্রাতরাশের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অতুলপ্রসাদের আহ্বান শুনে দ্রুত ছুটে কাছে গেলেন। অতুলপ্রসাদ হেমকে জড়িয়ে ধরে নিজে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন। হেম—একটা গান কাল বেঁধেছি। তোমাকে শোনাব!

হেমকুসুম অন্তর-শ্রদ্ধায় হৃদয়ের সকল পাপড়ি বিকশিত করে অতুলপ্রসাদের চিবুকে হাত বুলিয়ে বললেন, শোনাও—

অতুলপ্রসাদ আকুলকরা কণ্ঠে বেহাগ সুরে গাইলেন 'বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে... হেমকুসুমও গানটি নিজ কণ্ঠে তুলে নিলেন। একটু পরেই অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের সাথে দেখা করতে এসে এমনি মধুর পরিবেশের অভাবনীয় ছবিটি দেখে মুগ্ধ হলেন। অতুলপ্রসাদের অনুরোধে হেমকুসুম গানটি গেয়ে শোনালেন।

এর কয়েকদিনের মধ্যে মা হেমন্তশশী, বোন হিরণ-কিরণ ও প্রভা এলেন লখনউতে অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে। হিরণের স্বামী ডাঃ রামস্বামী আয়েঙ্গার, কিরণের স্বামী আনন্দমোহন বসুর পুত্র শরৎচন্দ্র বসু এবং প্রভার স্বামী শেষাদ্রি আয়েঙ্গার। জীবন-প্রতিষ্ঠায় তিন বোন উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত। দাদার সুনাম ও কৃতীর কথা তাদের শ্লাঘার বিষয়। এই প্রথম এক সঙ্গে তিন বোন মাকে সঙ্গে করে লখনউতে এল। অতুলপ্রসাদের সে কি আনন্দ! মাকে পেয়ে বাঁধভাঙ্গা আকুলতায় অতুলপ্রসাদ শুধু মুগ্ধ নন—আনন্দিত, তৃপ্ত। এটা খুবই স্বাভাবিক এবং তার জন্য অতুলপ্রসাদের লখনউ-এর সকল শুভানুধ্যায়ীরা একে একে মমতাময়ী অতুল-জননীকে শ্রদ্ধা জানাতে আসছেন—আসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে জজ সামীউল্লাও।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯১৮ সাল! মদনমোহন মালবীয়জীর সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন। মডারেট আর হোমরুলাররা মন্টেগু চেমসফোর্ডের স্কিম নিয়ে বিতর্ক। মিসেস বেসানট রাজী নন—তাঁর দল দ্বিধা বিভক্ত। বাংলার রাজনীতিবিদগণ—বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও চিত্তরঞ্জন দাশ প্রভিনসিয়াল অটোনমির

দাবী তুললেন। মোসলেম লীগের জিন্নাসাহেব মনস্থির করতে পারছেন না। শ্রীনিবাস শাস্ত্রী মডারেশন ও প্রুডেনস-এর কথা বলছেন। এমনি তপ্ত পরিবেশ; অতুলপ্রসাদ কংগ্রেস তাঁবু থেকে দূরে 'মেটকাফ হাউসে' উঠেছেন। প্রচণ্ড শীত, ঘরে দুখানি ক্যাম্প খাট—একটিতে অতুলপ্রসাদ আর আরেকটিতে শ্রীনিবাস শাস্ত্রী। সেদিন রাজনীতির তান্ডবতা অতুলপ্রসাদের চিত্তে ভারতীয় কংগ্রেসের পরিণতির পরবর্তী ছবি ফুটে উঠেছিল। তার পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সভাপতিত্বে '**ভারতীয় জাতীয় লিবার‍্যাল ফেডারেশন**' গঠিত হয়। অতুলপ্রসাদের আশৈশব সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর প্রভাব অত্যন্ত গভীর। এবার সেই লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য হলেন অতুলপ্রসাদ। ১৯১৯ সালে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী লখনউ এলেন—অতুলপ্রসাদ বিপুল উত্তেজনায় এবং শ্রদ্ধায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীকে স্বাগত জানালেন—লখনউ যেন নতুন করে রাজনীতির রথ চালাতে চায়। রাফায়াম ক্লাবে সভার আয়োজন হল। সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজী। সভায় রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ভাষণ দিচ্ছিলেন। ভাষণের শেষ পর্বে একটি মধ্যবয়স্ক যুবক সুরেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে 'ট্রেটর, ট্রেটর টু দি কানট্রী' বলে চিৎকার করে উঠলে সভায় উত্তেজনা সৃষ্টি হল। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতা বন্ধ করে যে 'ট্রেটর ট্রেটর' বলে চিৎকার করেছিল তাকে তিনি সমুখে আসতে বললেন। কিন্তু সেই যুবক ততক্ষণে সভাস্থল ত্যাগ করে আত্মগোপন করে চলে গেছে। এ ঘটনায় মালব্যজী-অতুলপ্রসাদ-জগৎনারায়ণ মোল্লা-বিশ্বেশ্বরনাথ গভীরভাবে লজ্জায় পীড়িত। অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত বিনয়ে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর বাড়ী নিয়ে গেলেন। সুরেন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের গৃহে এসে বিশ্রাম করলেন, অতুলজননী হেমন্তশশী এবং তিন বোন আর হেমকুসুম তাঁর পরিচর্যা করলেন, সুরেন্দ্রনাথ লখনউ ছাড়ার আগে অতুলপ্রসাদ তাঁর রাজনৈতিক গুরুর উদ্দেশ্যে কীর্তনের সুরে গাইলেন,

সে দিন কবে বা হবে?
জাতিকুল-অভিমান দ্বেষ-নিন্দা ভেদ-জ্ঞান
ভারতে আনিল মরণ-ভাই হে?
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারই সাধন—
হেন সাধন আর নাই হে।
এ-হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিত হে প্রেমসিন্ধু।
মোরা পূজিব তোমায়
সেবার কুসুম কুড়াইয়া, নিজের পূজা ঘুচাইয়া,
পরের দুঃখ ঘুচাইয়া, ভারতের আশা পূরাইয়া।

তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই-দয়া করো দীনবন্ধু।
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু।।

মুগ্ধ সুরেন্দ্রনাথ তারপর লখনউ ত্যাগ করলেন বিমল আনন্দের সুখ স্মৃতি নিয়ে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সাল ১৯১৯—অতুলপ্রসাদ সকালে কোর্টে যাবেন, তার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় তাঁর কাছে বাড়ীর ভৃত্য এসে খবর দিলেন একজন মৌলবী সাহেব আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন। মৌলবী সাহেব! কথাটা শুনে অতুলপ্রসাদ দ্রুত দেখা করতে এলেন 'আদাব আরজ' জানালেন। তারপর তাঁকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন অতুলপ্রসাদ। সময় নেই, এখুনি বেরুতে হবে, তাই দ্রুত কথাগুলি বলেন।

মৌলবীর পরিধানে ধুতি, গায়ে চাপকান, মাথায় উঁচু ফেজটুপী; চিবুকের কাছে অল্প অল্প দাড়ি। মৌলবী উজ্জ্বল নয়নে অতুলপ্রসাদকে দেখছেন আর মুচকি হাসছেন। অতুলপ্রসাদ বিব্রত বোধ করছেন, এর আগে লখনউতে এমন মৌলবী দেখেছেন কিনা বুঝতে পারছেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার কি দরকার আমায় বলুন। আমাকে এখুনি কোর্টে বেরুতে হবে। সময় একেবারেই নেই। অনুগ্রহ করে বলুন কি দরকার।

মৌলবী মাথার ফেজ খুলতে খুলতে বললেন, এবার আমি কে বলতো অতুলপ্রসাদ!

শরৎচন্দ্র! সে কি সৌভাগ্য আমার। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধায়! দাড়ি কবে থেকে? অতুলপ্রসাদ বেদম হাসিতে গড়িয়ে পড়েন আর কী! বাড়ীশুদ্ধ সবাই—চাকর দারোয়ান সবাই ছুটে আসছে—এমন করে সেন সাহেবকে হাসতে কেউ দেখেনি।

শরৎচন্দ্র অন্য একটি কাজে লখনউ গিয়েছিলেন—কয়েকটা দিন লখনউতে থেকেছেনও কিন্তু অতুলপ্রসাদের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর আতিথ্যগ্রহণ করতে পারেন নি। অতুলপ্রসাদ ও শরৎচন্দ্রের উভয়ের আবেগের সীমা ছিল না।

অতুলপ্রসাদ সুবিধাবাদী রাজনীতিকে বিশ্বাস করতেন না। আদর্শভ্রষ্টতা কোনভাবেই অতুলপ্রসাদকে আকর্ষণ করেনি। কংগ্রেস ছাড়ার পর অতুলপ্রসাদ লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য—সেই সভ্যরূপেই লখনউ-এর মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। কংগ্রেসের তখন রমরমা, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অতুলপ্রসাদের প্রতি সমর্থন ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই অতুলপ্রসাদ সেবার হেরে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ লিবার‍্যাল ফেডারেশনের সভ্য হলেও রাজনৈতিক চিন্তাধারায়

তিনি নিরপেক্ষ ছিলেন, যার ফলে কংগ্রেসের বিভিন্ন স্থানের অধিবেশনে তিনি যোগদান করেছিলেন। কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে অংশগ্রহণ করেননি সত্য, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বপূর্ণ কংগ্রেস সেবীদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছেন সর্বত্র।

সেবৎসর পাঞ্জাবের পুলিশী হাঙ্গামায় 'ট্রিবিউন' পত্রিকার সম্পাদক কালীনাথ রায়কে কারাদণ্ড পেতে হয়। এই জঙ্গী আইনের অত্যাচারে বিমর্ষ অতুলপ্রসাদ তার প্রতিবাদ সভা করেছিলেন লখনউতে। হান্টার কমিটির তদন্তে সত্য ঘটনা যখন প্রকাশিত হ'ল তখন তাঁর মনের অবস্থা খুবই স্বাভাবিকভাবে মানবতার দিকে ঝুঁকেছিল। মডারেট হ'লেও তিনি পুরোপুরি গোখলের রাজনৈতিক চিন্তার অনুগামী ছিলেন।

অতুলপ্রসাদ লখনউ-এর সর্ববাদীসম্মত অনুপ্রেরণা। সকল সম্প্রদায়ের কাজে তাঁর সহযোগিতা একান্তভাবে আদরণীয় ছিল সর্বত্র। 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র সদস্যদের গান শেখানো, খেলায় উৎসাহ দান, বাজনা শেখানো ও শরীর চর্চার প্রতি গভীরভাবে মনোনিবেশ করার প্রেরণা অতুলপ্রসাদ জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করে গেছেন।

লখনউ তথা, উত্তরপ্রদেশের মূল ভাষা উর্দু। বিলেত থেকে প্রথম লখনউতে ব্যাস্টারীতে যোগদান সময় থেকে অতুলপ্রসাদ নিজে উর্দু শেখার জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন—সেঅবধি উর্দু ভাষার প্রতি তাঁর গভীর মমতা। উর্দুতে 'মুসায়েরা' শোনা অতুলপ্রসাদের জীবনের অমূল্য সম্পদ। কিন্তু লখনউতে তখন হিন্দী ভাষা প্রসার তেমন একটা ছিল না। অতুলপ্রসাদের কাছে সেই হিন্দীভাষা প্রসারের ও চর্চার আর্জি জানিয়ে গোপালচন্দ্র সিন্‌হা নামে একটি যুবক এলেন। অতুলপ্রসাদ যুবকটির কথা উপলব্ধি করে **'হিন্দীসভা'** স্থাপিত করলেন এবং একটি **'হিন্দী গ্রন্থাগার'**ও করলেন। গোপালচন্দ্র সিন্‌হার উৎসাহ ও কঠোর পরিশ্রমে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ হলেন, **তিনি সেই সভার সভাপতি আর যুবক গোপালচন্দ্র সিন্‌হা হলেন সম্পাদক**। প্রতি সপ্তাহে হিন্দীসভার বৈঠক হ'ত, গল্প-কবিতা পাঠ হ'ত। অতুলপ্রসাদও উপস্থিত থাকতেন এবং বাংলা কবিতা পাঠ করে শোনাতেন। হিন্দীভাষা প্রচার ও প্রসার কাজে অতুলপ্রসাদ গভীরভাবে যুক্ত হলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২০ সাল।

নানা কারণে বহির্বঙ্গে বাঙালির মাতৃভাষা অবহেলিত। বাঙালি ছেলেরা একত্রে বেড়াবার সময় নিজেদের মধ্যে কথাবার্তায় বা রহস্যালাপ ক'রত হিন্দীতে।

বাড়ীতেও বাক্যবিনিময় হিন্দীতেই হ'ত। অনেকটা ব্যতিক্রম ছিল উত্তরপ্রদেশের কাশী। কাশী ধর্মপীঠ ও জ্ঞানপীঠ—সেকারণে বহু বাঙালীর আকর্ষণ গভীর। সাহিত্যিক-কবি-দার্শনিক-শিক্ষাবিদ-ঐতিহাসিক প্রায় সর্বস্তরের বাঙালিরা এই কাশীতে আসতেন, বসবাস করতেন। তারই সুযোগে বাঙলা সাহিত্যের সমারোহ নিয়ে আলাদা আলোচনায় বাঙলাভাষার সহজ রূপটি স্বাভাবিকভাবে কাশীর বাঙালির চিত্তলোকে গভীরভাবে চর্চা হ'ত। **তার ফলে একটি সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল যার কেন্দ্রমণি ছিলেন রস সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।** প্রায়ই এই মজলিসের আসর ব'সত নাট্যকার ও উপন্যাসিক মনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। **কবি কিরণচাঁদ দরবেশ, রবীন্দ্রভক্ত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ইতিহাসের অধ্যাপক বৃন্দাবন ভট্টাচার্য, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় মজলিসে নিয়মিত আনাগোনা করতেন।** বাঙলাদেশেও তখন প্রবাসী-ভারতবর্ষ-মানসী ও মর্মবাণী-ভারতী-নারায়ণ-সবুজপত্র প্রভৃতি মাসিকপত্রের সমারোহ। জনচিত্তজয়ী কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কাশীতে। তিনিও সাহিত্য মজলিসে আসতেন, সাহিত্য আলোচনার সাথে সাথে বৈঠকী মেজাজে গল্পগুজব চ'লত দীর্ঘসময় ধরে। এই মজলিসের একটি স্থায়ী কিছু করার উপলব্ধিতে একটি মাসিকপত্র প্রকাশের পরিকল্পনা কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামকরণে রূপ পেল '**প্রবাসজ্যোতি**'। তার সংবাদ জানতে পেরে শরৎচন্দ্র তার স্থায়িত্বের জন্য কাশীর সুরেশ চক্রবর্তীকে লখনউতে অতুলপ্রসাদ সেনের কাছে যেতে এবং পরামর্শ নিতে নির্দেশ দিলেন। শরৎচন্দ্রের নির্দেশমত সুরেশ চক্রবর্তী লখনউতে গেলেন নামজাদা ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেনের কাছে। এর আগে সুরেশ চক্রবর্তী অতুলপ্রসাদের নাম শুনেছেন কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় পাননি।

বয়সে নবীন, বাংলা সাহিত্যের উৎসাহী দরদী কর্মী লেখক সুরেশ চক্রবর্তী লখনউতে পৌঁছলেন। সামান্য টাঙাওয়ালা থেকে উচ্চকোটির লখনউবাসী সবাই 'সেন সাহেব'কে চেনেন-জানেন। অতুলপ্রসাদের কয়েকটি গান তখন অনেক বাঙালির মুখে মুখে ঘুরত—কিন্তু এর বেশী কোন পরিচয় বিশ শতকের প্রথম দিকে তেমন ছিল না। ব্যারিস্টার-নামী দামী মানুষ-কেমন হবে, কেমন করে আমায় দেখবেন ইত্যাদি ভাবনায় সুরেশবাবু বেশ চিন্তিত। তা'ছাড়া কাশী ছেড়ে লখনউ—সম্পূর্ণ নূতন পরিমণ্ডল-রাস্তাঘাট-আদবকায়দা-লোকজন সবই কেমন যেন আলাদা, অন্য মেজাজের। লখনউ যদিও উত্তরপ্রদেশের কিন্তু কাশীর মত সহজ সরল পরিমণ্ডল নয়। এখানকার মানুষ-জন বেশ একটা বোধ্যভাবে ঘোরাফেরা করে। এমনি রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে সুরেশবাবু অপ্রত্যাশিত একজন পরিচিতের সাক্ষাৎ

পেলেন, তিনি বললেন, আরে সুরেশ না! তুই এখানে লখনউতে? সুরেশ চক্রবর্তী বেশ ঘাবড়ে গেলেন—ভদ্রলোককে পেয়ে উল্লসিত হলেন না। নাম কালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—পুলিশের একজন ইনফরমার। এক ঝলকে সুরেশবাবুর মনে এই গুপ্তচরের কীর্তিকলাপ ভেসে উঠল। শচীন্দ্র সান্যাল-রাজেন লাহিড়ী-মন্মথ গুপ্ত-শচীন বক্সী—যাদের ধরিয়ে দিয়ে এই কালীকৃষ্ণ আজ বড় মাপের ইংরেজ-ভক্ত। গোয়েন্দা কাজ করা ছাড়াও সাহিত্য-হাটের ছোট বড় সংবাদ কালীকৃষ্ণের নখদর্পণে।

সুরেশবাবু বললেন, আমি এখানে এ. পি. সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

—ও, এ. পি. সেন, তা ভাল, কাল সকালেই তোমাকে নিয়ে এ. পি. সেনের বাড়ীতে যাব—কালীকৃষ্ণ দ্রুত স্বাভাবিকভাবেই বললেন। পরদিন কেশরবাগের ব্যাঙ্কস রোডের অতুলপ্রসাদ সেনের বাড়ীতে সুরেশ চক্রবর্তী কালীকৃষ্ণের সাথে গেলেন। রাস্তার উপর ফটক দিয়ে ভেতরে অল্প অল্প গাছের সমাবেশ ফাঁকা একটি বাংলো। ঝাড়ন হাতে একজন বেয়ারা সামনে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি চাই! সুরেশবাবু—সেন সাহেবকে দরকার। কথাটি শোনার পর বেয়ারা জানালো, সাহেব এখন গোসলখানায়। অন্তত আধঘন্টা দেবী হবে। তারপর দপ্তরখানায় এসে বসলে সেনসাহেবের সাথে দেখা হবে।

বেয়ারাকে অনুসরণ করে সুরেশবাবু ও কালীকৃষ্ণবাবু বারান্দার পশ্চিমদিকের একটি ঘরের বেঞ্চিতে এসে বসলেন, অপেক্ষা করছেন।

অতর্কিতে কানে এল মধুর কণ্ঠের মৃদু গুঞ্জন, ধীরে ধীরে গুঞ্জন রূপায়িত হ'ল ধ্বনিতে—জল ঝরার তরঙ্গে কানে এসে ধাক্কা দিল—

হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?
আমার মনের মাঝে ভবের কাজে মালিক হয়ে রবে—কবে?
আমার সকল সুখে সকল দুখে
তোমার চরণ ধরব বুকে,
কণ্ঠ আমার সকল কথায়
তোমার কথাই ক'বে!

কিনব যাহা ভবের হাটে
আনব তোমার চরণ-বাটে;
তোমার কাছে হে মহাজন,
সবই বাঁধা রবে—কবে?

স্বার্থ-প্রাচীর ক'রে খাড়া
গড়ব যবে আপন কারা
বজ্র হয়ে তুমি তারে
ভাঙবে ভীষণ রবে।

পায়ে যখন ঠেলবে সবাই,
তোমার পায়ে পাইব ঠাঁই!
জগতের সকল আপন হতে
আপন হবে কবে?

শেষে ফিরব যখন সন্ধ্যাবেলা
সাঙ্গ ক'রে ভবের খেলা,
জননী হয়ে আমায়
কোল বাড়ায়ে লবে।
হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে?

গানের কথায় ও সুরের মাধুর্যে মন্ত্রমুগ্ধের মত অন্তর্লীন আবেশে যখন আচ্ছন্ন সুরেশবাবু—ঠিক সেসময় ঘরের পশ্চিমদিক দিয়ে একজন এসে দু'খানি চেয়ার এনে বলল, 'সাহেব আসছেন'।

একটি মন্থর পদধ্বনিতে দীর্ঘকায়, নাতিস্থূল, পাশ্চাত্য পোশাকে সজ্জিত স্বভাব-গম্ভীর কেশবিরল মানুষটি প্রবেশ করতেই সুরেশবাবু ও কালীকৃষ্ণবাবু দাঁড়িয়ে নমস্কার জানালেন। অতুলপ্রসাদও হাত জোড় করে প্রত্যাভিনন্দন করলেন। কালীকৃষ্ণকে দেখেই অতুলপ্রসাদ বিস্ময়ে অথচ স্মিতহাস্যে বললেন, সে কি আপনি এ সময়ে?

অতুলপ্রসাদের প্রশ্নের উত্তরে কালীকৃষ্ণবাবু সুরেশবাবুকে দেখিয়ে বললেন—উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

ও তা ভাল, কোথা থেকে এসেছেন, অতুলপ্রসাদ মধুর আন্তরিক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন।

সুরেশবাবু তার পরিচয় জানালেন। এও জানালেন প্রস্তাবিত মাসিক পত্রিকা 'প্রবাসজ্যোতি'র বিষয়ে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরামর্শ অনুসারে লখনউতে আসা। এই কথা বলে 'প্রবাসজ্যোতি'র অনুষ্ঠান-পত্রটি অতুলপ্রসাদের হাতে দিলেন।

'প্রবাসজ্যোতি' দু'বার উচ্চারণ করতে করতে অতুলপ্রসাদের চোখ-মুখ উজ্জ্বল

হয়ে উঠল। প্রবাসে এমনি একটি বাংলা পত্রিকার কথা তিনি দীর্ঘদিন থেকে ভেবে আসছেন। অনুষ্ঠানপত্রটি বার বার পাতা উলটে উলটে চোখ বুলোতে লাগলেন।

বাঃ—খুব ভাল কথা, আমায় কি করতে হবে! অতুলপ্রসাদ সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করলেন।

লখনউ থেকে 'প্রবাসজ্যোতি'র জন্য কিছু গ্রাহক সংগ্রহ করতে চাই। এ-বিষয়ে কিভাবে অগ্রসর হওয়া যায়? আমি ত শহরে নবাগত, কারো সঙ্গেই তো জানাশোনা নেই। আপনার সুপরামর্শই আমার ভরসা—সম্পাদকীয় ভঙ্গিতে গরগর করে সুরেশবাবু বলে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ সুরেশবাবুর কথা শুনে নিকটের একটি টেবিলের ড্রয়ার থেকে লেখবার প্যাড বের করে দু'খানা চিঠি লিখলেন—চিঠি দুটি খামে ভরে খামের উপর দুটি নাম লিখে বললেন, এঁদের সঙ্গে দেখা করুন, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

পত্র দুটি যথা সময়ে সুরেশবাবু পত্রে উল্লিখিত ব্যক্তিদের হাতে যথাবিহিতভাবে দিয়েছিলেন—আশাতীত গ্রাহক সংগ্রহ করে সুরেশবাবু অতুলপ্রসাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন। সুরেশবাবু গ্রাহক সংগ্রহের সব বৃত্তান্ত বললেন। অতুলপ্রসাদ খুবই খুশী হয়েছেন। তিনি বললেন, আমাকেও গ্রাহক করে 'প্রবাসজ্যোতি' পাঠাবেন।

এ'কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে সুরেশবাবুর মনে পড়ে গেল লখনউ আসার আগে শরৎচন্দ্র বলে দিয়েছিলেন—'ওঁর কাছ থেকে লেখাটেকা চেয়ে নেবে'।

অতুলপ্রসাদ সম্পর্কে সুরেশবাবুর কোন ধারণা ছিল না। তাই সুরেশবাবুর কথার উত্তরে অতুলপ্রসাদ সলজ্জে বললেন, 'আমি ত ভাই বড় একটা লিখি না। তবে গান-টান কিছু লেখা আছে খাতায়। যদি আপনাদের ভাল লাগে এর থেকে বেছে নিতে পারেন।'

এই বলে অতুলপ্রসাদ ড্রয়ার থেকে ধুলো ঝেড়ে একখানা পুরনো 'একসারসাইজ বুক' সুরেশবাবুর সামনে দিলেন। খাতাটির পাতাগুলি প্রায় আলগা হয়ে গেছে। অক্ষরগুলিও অনেকটা ম্লান। সুরেশবাবু পর পর গানগুলি পড়ে যেতে লাগলেন। অতুলপ্রসাদ পাশে তার মামলা সংক্রান্ত কাগজ-পত্তর নাড়াচাড়া করছেন। কিছুক্ষণ পর সুরেশবাবু একখানা সাদা কাগজে দুটি গান নকল করে খাতাটি তাঁকে ফেরৎ দিলেন। সুরেশবাবুর হাতের প্রতিলিপি করা কাগজখানি চেয়ে নিয়ে তার উপর নিমেষমাত্র দৃষ্টিপাত করে সেখানি অতুলপ্রসাদ সুরেশবাবুকে প্রত্যার্পণ করলেন।

গান দুটি (১) *মোদের গরব, মোদের আশা*
(২) *হরি হে, তুমি আমার সকল হবে কবে......*

আনন্দ-চিত্তে সুরেশ চক্রবর্তী লখনউ থেকে উত্তরপ্রদেশের অন্যান্য শহরে 'প্রবাস-জ্যোতির' প্রচার কাজ সমাপ্ত করে কাশীতে ফিরে গেলেন। কাশীতে পৌঁছে সমস্ত ঘটনা জানালেন কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

নবাবী কায়দার এবং ঐতিহ্যের শহর লখনউ। উত্তরপ্রদেশের আর দশটি শহরের তুলনায় লখনউ স্বতন্ত্র—সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানসিকতায় তার ব্যবহারিক জীবন। নবাবী তালুকদারী আধিপত্যের বিচরণভূমিতে লর্ড ক্যানিং পশ্চিমী হাওয়া এনেছিলেন। লর্ড ক্যানিং এর মৃত্যুর পর তার স্মৃতিরক্ষার জন্য তালুকদাররা ক্যানিং ইনস্টিটিউট নামে বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

পরবর্তী সময়ে ১৯২০ সালে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা হয় এবং ১৯২১ সালে গোমতী নদীর পারে নবাব নাসিবুদ্দিন হায়দারের বিলাস-কুঞ্জ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হ'ল। এই পরিবর্তন পরিবর্ধনের জন্য অতুলপ্রসাদ একবারে দশ হাজার টাকা দান করেন।

লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলর হয়েছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। **বিশ্ববিদ্যালয় কর্মসমিতির একুশ জন সদস্যের মধ্যে একজন নির্বাচিত সদস্য অতুলপ্রসাদ। শুধু সদস্য নন প্রধান পরামর্শদাতাও।**

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম শিক্ষা দেবার কাজ শুরু হ'ল ১৯২১ সালের ১৭ই জুলাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হলেন—**ধুর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত, অসিতকুমার হালদার।**

উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী পার্লামেন্ট রিলিজিয়নসে থিয়োসফিস্টদের মুখপাত্র হয়ে ১৮৯৩ সালে শিকাগোতে গিয়েছিলেন। ভাল বক্তা। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাণিজ্য-বিদ্যা' বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করার মূলে ছিলেন বিচারপতি গোকরনাথ মিশ্র এবং ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে এই বিভাগটি পরবর্তী সময়ে প্রভূত সুনাম অর্জন করে, যার প্রভাবে ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও বাণিজ্যবিদ্যা বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত হয়।

সারাদেশ থেকে সুনির্বাচিত অধ্যাপকদের সামিল করার গভীরতম প্রচেষ্টা অতুলপ্রসাদ ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করলেন। শিক্ষক-নির্বাচনী কমিটিতে এবং অনেক

ডিপার্টমেন্টে অতুলপ্রসাদ ছিলেন অন্যতম সদস্য। বিশেষ করে আইন বিভাগের নির্বাচনে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অধ্যাপকদের কাছে অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন 'অতুলদা'—**'সেন সাহেব'**।

ইতোমধ্যে কাশী থেকে **প্রস্তাবিত 'প্রবাসজ্যোতি' প্রকাশিত হল—প্রকাশিত পত্রিকায় 'আ মরি বাংলা ভাষা' উৎকীর্ণ করে বহির্বঙ্গের বাঙালির আত্মরক্ষার বীজ মন্ত্রটি জানিয়ে দেওয়া হ'ল। যার প্রভাব পরবর্তী সময়ে বাঙালির চিত্তলোকে সুদূরপ্রসারী শক্তি ও সংহতি দান করেছিল।**

১৯২২ সালে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় একটি মামলার বিষয়ে পাটনায় গিয়েছিলেন। পাটনার কাজ শেষ করে বিশ্বনাথ দর্শনে কাশী গেলেন। কাশীতে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এসেছেন শুনে অতুলপ্রসাদ লোক মারফৎ 'বাঙলার বাঘ'কে নবাবী লখনউ শহরে আমন্ত্রণ জানালেন। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনে মনেও একটা গোপন ইচ্ছা ছিল—এতদূর এসেছেন, অতুলপ্রসাকে দেখে যাবো না! বাঙলার তথা বাঙলা ভাষার পথিক সাধককে একবার দেখে যেতে পারলে মনটা খুশিতে ভরে যাবে। এমনটা ভাবতে ভাবতেই অতুলপ্রসাদের আহ্বান এল—মিনতি এল—একবার যদি আসেন।

স্যর আশুতোষ লখনউ গেলেন, এবং অতুলপ্রসাদের বাংলোয় উঠলেন। কুইন্স কলেজের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভাবনীয় সংবর্ধনায় লখনউ-এর সকল বিদ্বজ্জনের উপস্থিতি এক গুরুত্ব লাভ করল। অতুলপ্রসাদ বিনম্র শ্রদ্ধায় পুষ্পমাল্যে স্যর আশুতোষকে ভূষিত করলেন। স্যর আশুতোষ বাঙালিদের এই প্রতিষ্ঠান দেখে আনন্দিত, গৌরবান্বিত। স্যর আশুতোষের অনুরোধে একটি গান অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে শুনবার আকাঙ্খা প্রকাশ করলে অতুলপ্রসাদ তাঁর সুধাঝরা কণ্ঠে সুরের তন্ময়তায় গাইলেন,

মোদের গরব, মোদের আশা
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।
কী জাদু বাংলা গানে—
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
এমন কোথা আর আছে গো!
গেয়ে গান নাচে বাউল,
গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।

ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা
আনল দেশে ভক্তিধারা—
মরি হায় হায় রে—
আছে কই এমন ভাষা,
এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?
বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন
হেম মধু বঙ্কিম নবীন—
আরও কত মধুপ গো!
ওই ফুলেরি মধুর রসে
বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীণে
আনল মালা জগৎ জিনে!—
গরব কোথায় রাখি গো?—
তোমার চরণ-তীর্থে আজি
জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে
ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' বলে;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি'
সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

গান শেষ হতেই স্যর আশুতোষ আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে অতুলপ্রসাদকে দু'হাতে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে আনন্দাশ্রু বর্ষণ করতে করতে আশীর্বাদ করে বললেন, ধন্য অতুলপ্রসাদ, ধন্য বাঙালি সমাজ, বাংলার এতদূরে থেকেও বাংলা ভাষার এত আদর, এত অন্তর-নিঃসৃত অমৃত ধারায় আমাকে এমন শীতল করে দিল যে মে মাসের প্রখর তাপ যেন শরমে পালিয়ে গেল।

এর পরদিন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বহুকাল থেকে জীবিকা ও ধর্ম আচরণের জন্য এবং হিমালয়ের দেব-দেউলের আকর্ষণে বাঙালি আপন জন্মভূমি ত্যাগ করে বাংলার বাইরে স্থায়ীভাবে বসবাস করে চলেছে। অন্নভূমিতে এসে বাঙালি তাঁর স্বভাব-জাত সাংস্কৃতিক বোধকে কখনও ক্ষুণ্ণ হতে দেয়নি—বরং যে দেশে জীবিকার জন্য রয়েছে সেখানকার ভাষা

ও সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে নানাবিধ কল্যাণ ও সেবা-ব্রতে এগিয়ে গিয়েছে—যার জন্য একদিন বাঙালির কদর ও আদর অনিবার্যভাবে বহির্বঙ্গে বর্ধিত ও সমাদৃত হয়েছিল। 'সর্বহিতায়' আদর্শে এতটুকু কার্পণ্য না রেখে অন্নভূমির শ্রীবৃদ্ধির জন্য যুক্ত হয়েছে। উত্তরপ্রদেশের প্রায় সর্বত্র বাঙালির এই ধরনের কর্মধারার পরিচয় নানা বিষয়ে পাওয়া যায়। অতুলপ্রসাদ সেদিক থেকে বহির্বঙ্গের বাঙালির প্রেরণা, বাঙালির শ্লাঘার মানুষ।

কাশীর বাঙালিদের মধ্যেও সেই 'সর্বজন সুখায়', 'সর্বকল্যাণ বোধায়' ভাবনায় কাজের পরিচয় সর্বত্র। তবে কাশীর বাঙালিদের জন্য আপন ভাষা বাঙলা ও বাঙলা সাহিত্যের যে পরিমণ্ডল—কবি-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার-অধ্যাপক প্রভৃতি দিয়ে ব্যাপ্ত ছিল এমনটা আর কোথাও ছিল না।

পরবর্তী সময়ে নানা কারণে বহির্বঙ্গের বাঙালির চিন্তাধারায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতায় ঘাটতি গভীরভাবে কিছু সচেতন বাঙালি মনীষার হৃদয়কে বিব্রত করেছিল। সেই সূত্রেই মাতৃভাষা ও মাতৃ সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য দূর করা তথা বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের একটা ভাবনা কিছু চিন্তাশীল মনে দোল খাচ্ছিল। তারই একটা সংহত রূপের প্রয়াস আকাঙ্খায় উত্তরপ্রদেশের কানপুরের 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ' গৃহে এর বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন লখনউ থেকে অতুলপ্রসাদ সহ আরো অনেকে। 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ' গৃহের এই বার্ষিক উৎসবের কর্ণধার ছিলেন কানপুরের প্রথিতযশা সমাজসেবী ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন।

সময়—১৯২২ সাল। সেই বার্ষিক সভায় সভাপতি অতুলপ্রসাদ সেন। অতুলপ্রসাদ সভাপতির ভাষণে বহির্বঙ্গে স্থায়ী বসবাসকারী বাঙালিদের জন্য একটি 'সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠার কথা গভীরভাবে বলেন। তবে এ 'সম্মিলনী' গঠন করার মধ্যে কিছু অসুবিধা আছে, কারণ বাঙলায় শাসকশ্রেণীর অত্যাচার ও আচরণের প্রতিবাদে বিপ্লবাত্মক কর্মকাণ্ড যেভাবে দিন দিন বাঙলার গণ্ডি অতিক্রম করে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে—তাতে বাঙালির কোন সংগঠন করার প্রয়াস সূচনাকালেই বাধাপ্রাপ্ত হবে, এইকথা ভেবে অতুলপ্রসাদ বহির্বঙ্গের বাঙালির জন্য যে সম্মিলনীর কথা বলেছেন তা'হবে সম্পূর্ণভাবে অরাজনৈতিক-ভাষা এবং সাহিত্য সম্মিলনী। সেভাবেই অতুলপ্রসাদ তাঁর সভাপতির ভাষণে সম্মিলনীর জন্য কয়েকদফা প্রস্তাব ও পথনির্দেশ উল্লেখ করেছিলেন। বার্ষিক সভায় ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনও অতুলপ্রসাদ সেনের ভাবাসিক্ত ভাষণে **বহির্বঙ্গের বাঙালির আত্ম-রক্ষা ও আত্মসমর্থনের জন্য 'সাহিত্য সম্মিলনী' নামে একটি সংস্থার প্রয়োজনীয়তার** কথা

বলেন। সেইমত উপস্থিত সকলেই সাগ্রহে অতুলপ্রসাদ ও ডাঃ সেনের প্রস্তাবে সহমত পোষণ করেন। অতুলপ্রসাদকে পুরোভাগে রেখে সম্মিলনীর নামকরণ হল **'উত্তর ভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন'**।

বৃহত্তর পটভূমিকায় বহির্বঙ্গের বাঙালির আশা-আকাঙ্খার প্রদীপটি হাতে তুলে নিলেন অতুলপ্রসাদ। এই **'উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে'র জাত-শুদ্ধ করান হ'ল পরের বৎসর ১৯২৩ সালে কাশীতে গঙ্গার পূত ধারায় রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে। অতুলপ্রসাদ ছিলেন সেই সাহিত্য সম্মেলন-যজ্ঞের প্রধান কর্ণিক।**

কাশীর এই সাহিত্য সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ অতি সন্তর্পণে নীরব দর্শকমাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াবার নয়—অন্তরালবর্তী নির্লিপ্ত অতুলপ্রসাদকে চিনতে ভুল করলেন না। তাই অধিবেশনে দিলীপকুমার রায়ের সুধা-ঝরা গান হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' বলে অতুলপ্রসাদের দিকে অত্যন্ত মায়াভরা দৃষ্টিতে তাঁকে আহ্বান জানালেন।

এ যে শুধু আহ্বান নয়—অন্তরভেদী হৃদয় উজাড় করা সমাদর।

অতুলপ্রসাদ পদ্মাসনে বসে বাউল সুরে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার যাঁর গৌরবে রচনা করে মুগ্ধ হয়ে গর্ব অনুভব করেছেন, সেই 'মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি বাঙলা ভাষা!' গানটি পুরো গাইলেন।

সাধা কণ্ঠের উদ্বেল চমকিত আসরে এ যে তুলসীতলে নিবেদিত প্রদীপ-শান্ত, স্নিগ্ধ।

তারপর পর পর আরো ক'টি গান গাইলেন অতুলপ্রসাদ।

কাশীর সাহিত্য সম্মিলনে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমার রায়ের গান শুনেছিলেন। কোন পরিচয় তখনও পর্যন্ত ছিল না। দিলীপকুমার রায়ও অতুলপ্রসাদকে চিনতেন না, পিতৃবন্ধু হিসাবে জানতেন। সাহিত্য সম্মিলনে রবীন্দ্রনাথের সূত্রে অতুলপ্রসাদকে দেখলেন, নিজের কানে গান শুনলেন। সেই থেকেই দিলীপকুমার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন অতুলপ্রসাদের সাথে দেখা করা, গান শেখা, গান শোনা।

বাঙলা গানের সমৃদ্ধির রাজপথে অতুলপ্রসাদ ও দিলীপকুমার রায়ের উল্লেখযোগ্য সন্ধিক্ষণ। অতুলপ্রসাদ লখনউ প্রবাসী। তাঁর গানের কাণ্ডারী হিসাবে প্রচার ও প্রসার কাজে সুবালা মাসি, কনক দাস এবং দিলীপকুমার রায় ও সাহানা দেবীর অবদান সবচেয়ে বেশী। ধূর্জটিপ্রসাদও সেদিক থেকে অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সময় সুযোগ পেলে দিলীপকুমার রায় অতুলপ্রসাদের সাথে দেখা করতে যেতেন। অতুলপ্রসাদের পারিবারিক জীবনের বিশৃঙ্খলা এবং তার জন্য মানসিক যন্ত্রণার কথা দিলীপকুমার জানতেন। মাঝে মাঝে সেই যন্ত্রণা এত তীব্র হত যে, অতুলপ্রসাদ একান্তই নীরব বাক্যহীন-সুরহীন-সঙ্গীতহীন নিশ্চল পাথর হয়ে স্তব্ধ হয়ে থাকতেন। সে এক ভয়ানক পরিস্থিতি। দিলীপকুমার তা' কিছুতেই অতুলপ্রসাদের এই আত্মহনন স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারতেন না। বাঙলা গানের ঐতিহ্য ও সমৃদ্ধির কর্ষণে অতুলপ্রসাদের অবলম্বন অনিবার্য। তাই মাঝে মাঝে দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদকে সুরের ঝর্নায় অভিষিক্ত করার কাজে অগ্রজ ভূমিকা গ্রহণ করতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অতুলপ্রসাদের শুধু বন্ধু ছিলেন না—গানের তালিমে এবং স্বদেশভাবনায় দ্বিজেন্দ্রলালের প্রভাব অতুলপ্রসাদের মধ্যে গভীরভাবে অনুভব করা যায়। কৃতজ্ঞচিত্তে অতুলপ্রসাদ তা' স্বীকার করতেন। সেই বন্ধুপুত্র দিলীপকুমারকে অতুলপ্রসাদ শুধু স্নেহ করতেন না—নিজের জীবনের অতি সংরক্ষিত স্থানের চাবিটি দিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করতেন না—গানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতেন পরম নির্ভরবোধে। দিলীপকুমারও অতুলপ্রসাদের গানের কাণ্ডারী হবার গৌরব লাভে ধন্য হতেন।

একদিন সন্ধ্যায় ধূর্জটি মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের কেসরবাগের বাড়ীতে এলেন। ধূর্জটি মুখোপাধ্যায় অতুলপ্রসাদের সাথে দিলীপকুমারের পরিচয় করিয়ে দিলেন। অতুলপ্রসাদ বললেন, আরে, তুমি তোমার বাবার ছেলে—হা হা হা! জানো, তাঁর হাসির গানে আমি দোয়ার দিতাম সঘনে! আহা, কী গানই তিনি গাইতেন! আমি তাঁর সঙ্গে গাইতাম 'নন্দলাল তো একদা একটা করিল ভীষণ পণ'। সে কী হাসি দিলীপ! কী গান! কী ভাবুক দরদী! আর কী মিলের জৌলুষ। তাঁর সঙ্গে গাইতাম আমি ঃ

লিখে গেছেন পুরাণকর্তা স্বয়ং ভোলা খেতেন ভাঙ,
খেতেন না হয় ভোলা কিম্বা পুরাণকর্তাই সুতরাং।

দিলীপকুমারও গান গেয়ে শোনালেন। অতুলপ্রসাদ খুশী। ঈষৎ সলজ্জ হয়ে অতুলপ্রসাদ বলেন, আমিও গান বেঁধেছি।

দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের কাছে এসে বললেন, আমি জানি—দু'চারটে নয়, অসংখ্য—আমি তাই আপনার কাছে এসেছি গান শিখতে। বিশেষ করে আপনার 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' এ'গানটি শিখতে।

খুশিতে অতুলপ্রসাদের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললেন—ও-গানটি আমার বড় প্রিয় গান, গানটি তোমার এত ভালো লেগেছে শুনে কী যে আনন্দ হচ্ছে—

—*'আরো আনন্দ হবে আমাকে গানটি শিখিয়ে দিলে'।*

অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারের পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, বাপকা বেটা বটে। তিনিও এমনি সহজে আলাপ জমাতেন। তা' শোনো—এ সাদামাটা ভৈরবী, তুমি সহজেই শিখে নিতে পারবে।—

এই প্রসঙ্গে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বলেন "তোমার কয়েকটি চমৎকার ছাত্র-ছাত্রী জুটেছে, তাই তোমাকে উস্কে দিচ্ছি, তুমি যাও ঢাকায়। সেখানে রেণুকা সেনগুপ্ত বলে একটি মেয়ে আছে। সে আমার বোন হয় দূর সম্পর্কের। আহা কী কণ্ঠ! তাকে তুমি কিছু গান শিখিয়ে যদি তোমার ছাত্র-ছাত্রীদের দলে টানতে পারো তা চমৎকার হয়। অমন কণ্ঠ কালে ভদ্রে শোনা যায়।"

সেইমত দিলীপকুমার ঢাকায় যান। ঢাকায় বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ বসুর অতিথি হয়ে খোঁজ করে টিকাটুলিতে গিয়ে রেণুকার কণ্ঠে 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গানটি শোনেন।

দিলীপকুমারও কয়েকটি গান করেন—তাতে ঢাকায় দিলীপকুমারের নাম ছড়িয়ে পড়ল। দিলীপকুমার সেই সময় অতুলপ্রসাদ ও নজরুল ইসলামের গান বেশী করে পরিবেশন করেন। ঢাকার বাঙালি-হিন্দু মুসলমান মহলে অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গানের বন্যা বয়ে গেল দিলীপকুমারের যৌবনোচিত পরিশ্রমে।

হিন্দী ভজন, মুসলমানী খেয়াল, দ্বিজেন্দ্রলালের, অতুলপ্রসাদের, নজরুলের এবং তার স্বরচিত গান দিলীপকুমার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পরিবেশন করে বাঙলাগানের মাত্রাকে সর্বমনে ও চেতনায় এক নতুন রূপ ও প্রেরণা দান করেছিলেন। এর আগে ঢাকায় এমন গানের প্রবাহ দেখা যায়নি। একসময় অতুলপ্রসাদের পিতা রামপ্রসাদ সেন ও মাতামহ ভক্ত কালীনারায়ণ গুপ্তের রচিত গানের আসর আপামর ঢাকার জন-সাধারণের বড় আকর্ষণীয় ছিল। বিশেষ করে মুসলমান সম্প্রদায় ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মুখে মুখে কালীনারায়ণের,

'এই জগত সংসার, এত ভালোবাসা যার
আগে সেই জগতে ভালোবেসে, শিক্ষা কেন কর না'... এবং
'তুমি আমার কত তুমি, তুমি কি তাহা জান না'

এই গানগুলি তখন সর্বত্র শোনা যেত।

দিলীপকুমার জানতেন—গানের ধাক্কায় গানের জোয়ারে অতুলপ্রসাদ সরব। তাই নিজের রচিত গান গেয়ে গেয়ে অতুলপ্রসাদকে বিভোর করে দিতেন—আর তখুনি অতুলপ্রসাদ গানের সুরে অন্তর্লীন হয়ে যেতেন।

দিলীপকুমার গজল ভাঙ্গা সুরে স্বরচিত গান গাইলেন,

যদি দিন না দেবে তবে এত ব্যথা কেন সওয়াও?
যদি আশা নাহি রবে মিছে বোঝা কেন বওয়াও?

গানটি শুনে অতুলপ্রসাদ সঙ্গে সঙ্গে আগের একটি রচনা গজল সুরে গাইলেন—

কত গান তো হল গাওয়া
আর মিছে কেন গাওয়াও?
যদি দেখা নাহি দিবে
তবে কেন মিছে চাওয়াও?
যদি যতই মরি ঘুরে
তুমি ততই রবে দূরে,
তবে কেন বাঁশির সুরে
তব তরে শুধু ধাওয়াও?

দিলীপকুমারের হাতে হাত রেখে অতুলপ্রসাদ ভাব তন্ময়তায় গাইলেন—

যদি সন্ধ্যা হ'লে বেলা নাহি মিলে তব বেলা,
পথভোলা মোর ভেলা এ অকূলে কেন বাওয়াও?

একটু থেমে, দরদী মিষ্টি গম্ভীর কণ্ঠে,

যদি আমার দিবারাতি
কাটি যাবে বিনা সাথি,
তবে কেন বঁধুর লাগি
পথপানে শুধু চাওয়াও?
বড়ো ব্যথা তোমায় চাওয়া;
আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া;
যদি ব্যথী না আসিবে,
এত ব্যথা কেন পাওয়াও?

মানবিক এবং ঐশ্বরিক এই দুই উপলব্ধির রসে ও সুরে চমৎকার পরিবেশ ও পরিমণ্ডলের সৃষ্টি করলেন অতুলপ্রসাদ। এর পরই অতুলপ্রসাদ কাজরী সুরে গাইলেন—

জল বলে, চল্ মোর সাথে চল্,
কখনো তোর আঁখিজল হবে না বিফল
চেয়ে দেখ্ মোর নীল জলে, শত চাঁদ টলমল্

বঁধুরে আন্ ত্বরা করি,
কূলে এসে মধু হেসে ভরবে গাগরি;
ভরবে প্রেমে হৃৎকলসী, করবে ছল্‌ছল্।
মোরা বাইরে চঞ্চল, মোরা অন্তরে অতল
সে অতলে সদা জ্বলে রতন উজল।
এই বুকে ফোটে সুখে হাসিমুখে শতদল;
নহে তীরে, এই নীরে হবি রে শীতল।

বাংলা গানের ঠুংরির সৌরভ সঞ্চার করা এবং গজলে মানসিক ও মিসটিক, দুমুখী ভারের প্রবর্তন অতুলপ্রসাদের নিজস্বতা।

দিলীপকুমার গান গেয়ে গেয়ে অতুলপ্রসাদের গানের অন্দর মহলে ঢুকে যেতেন—তিনি গাইলেন পণ্ডিত ভাতখণ্ডের ঝাঁপতালে বাঁধা বিখ্যাত মারাঠী ভৈরবী 'ভবানী দয়ানী'—অতুলপ্রসাদ তখুনি শুনে গান বাঁধলেন ও গাইলেন—

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে!
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি
দ্বারখোলে কুসুম-কলি,
কুঞ্জে ফুকারে অলি যাহারে বারে বারে,
নিঝর কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈল-বন পুষ্পকুল নন্দে যাহারে,
যার প্রেমে চন্দ্র তারা
কাটে নিশি তন্দ্রাহারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শতধারে।।

হঠাৎ আবার অতুলপ্রসাদ ভাবপ্রবণ মুহূর্তে মনোবেদনার নিজস্ব মহলের বন্ধ দুয়ার আস্তে আস্তে খুলে দিলীপকুমারকে অভিষিক্ত করলেন। ধ্যনস্থ হয়ে ভৈরবী সুরে গাইলেন—

কী আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
বলিব না রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

যে পথে চালাবে নিজে,　　চলিব, চাব না পিছে;
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভরিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
দেখো সকলে আনিল মালা　ভকতি-চন্দন থালা,
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো।
আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।।

গানটি গাইবার পরই অতুলপ্রসাদ চোখের ঝরে-পরা জল হাত দিয়ে মুছতে মুছতে বলেন, জান দিলীপ, এ গানটি আমি বেঁধেছিলাম আমার জীবনের এক দারুণ দুঃখের সময়, যখন মনে হয়েছিল...যাক সে কথা। আবার সাথে সাথে গাইলেন,

বিধি, আর তো তোমারে নাহি ডরি।
আমি পেয়েছি অকূলে আজি তরী।
যবে কণ্ঠক তরুতলে ভাসাবে নয়ন জলে,
আমি কুসুমে দিব গো তারে ভরি।
হানো যদি খর বাণ, আমারও তো আছে গান;
আমি সম্মুখে রহিব তারে ধরি।
জেনো ওহে নিরদয়, হবে তব পরাজয়;
সন্ধি করিবে এসো অরি।
যারে ব্যথা দিবে তুমি　　তাহার নয়ন চুমি
যতনে বেদন লব হরি।
সবারে রাখিব বুকে, মোরে কেমনে রাখিবে দুখে?
সবাকার হাসি যে গো মোরই।।

গাইতে গাইতে অতুলপ্রসাদের চোখ দুটি আবার ঝাপসা হয়ে কণ্ঠ গাঢ় হয়ে যায়, তবুও দিলীপকে শেখান। গানটি শেষ হতেই বলেন, দিলীপ, এ গানটি কিন্তু... যার তার কাছে গেয়ো না। এ গানটি আমার বড় ব্যথার দিনে লেখা।

গানটি শেষ হবার সাথে সাথে কয়েকজন অতিথি এলেন, অতুলপ্রসাদ তাঁদের দেখে হেসে মাতিয়ে তুললেন—এক ঝলকে সমস্ত পরিবেশ একটা ভিন্নমাত্রা পেল। অতুলপ্রসাদের এই ভাবান্তর দিলীপকুমারকে বেশ বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেদিন এই প্রাণখোলা নিরাসক্ত হাসির বিষয়ে কিছু বলতে পারলেন না। বেশ কিছুটা আশ্চর্যও হলেন দিলীপকুমার।

একটু সহজ করার জন্য দিলীপকুমার অতুলপ্রসাদের শেখানো গানটি গেয়ে

পরিবেশকে অন্যপথে চালিত করলেন নিমেষের মধ্যে। দিলীপকুমার বিভোর হয়ে গাইলেন—

একা মোর গানের তরী ভাসিয়েছিলাম নয়ন-জলে;
সহসা কে এলে গো এ তরী বাইবে বলে?
যা ছিল কল্পমায়া সে কি আজ ধরল কায়া?
কে আমার বিফল মালা পরিয়ে দিল তোমার গলে?
কেন মোর গানের ভেলায় এলে না প্রভাত বেলায়?
হলে না সুখের সাথি জীবনের প্রথম দোলায়!
বুঝি মোর করুণ গানে ব্যথা তাঁর বাজল প্রাণে
এলে কি দু-কূল হতে কূল মেলাতে এ অকূলে?

গানটি শেষ হওয়ামাত্র দু'জনের—অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমার— সে কী আনন্দ তৃপ্তি ভরা উচ্ছ্বাস!

দিলীপকুমার লখনউতে এসেছেন যেন ব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করা, কিন্তু বেরুনো সহজ নয়। এদিকে সুভাষচন্দ্র বসু সবেমাত্র জেল থেকে বেরিয়ে বিশ্রামের জন্য ডালহৌসি পাহাড়ে ডাঃ ধর্মবীরের আতিথ্যে গেছেন। সেখানে সুভাষচন্দ্র বসু দিলীপকুমার রায়ের সান্নিধ্য পাবার জন্য টেলিগ্রাম করেছেন—'চলে এসো'। কিন্তু অতুলপ্রসাদের বজ্রবন্ধ স্নেহমুষ্টি থেকে বেরিয়ে পড়া সহজ নয়। তাই দিলীপকুমারের মনটা ভারাক্রান্ত কী করবেন, দোদুল্যমান চিন্তায় অতুলপ্রসাদকে সুভাষের আহ্বানের কথা জানালেন। অতুলপ্রসাদ স্নেহভরা অথচ অসহায় কণ্ঠে বললেন, যেতে হয় নিতান্তই তো যেও—দশ বারোদিন বাদে।'

"ততদিন তো সুভাষ থাকবে না ডালহৌসিতে"।

—আহা, সুভাষের সঙ্গে কলকাতায় তো দেখা হবে—না হয় বলো, আমিই তাকে ডাকছি এখানে আমার ছোট কুটিরে—

তাঁকে ধর্মবীর দম্পতি ছাড়বেন না যে'—

'আর আমিই বুঝি ছাড়নেওয়ালা? উটি হচ্ছে না। আমার খপ্পরে যখন পড়েছ! কী জানো দিলীপ, তুমি আমি হলাম কবি গুণী, সুভাষ-ধর্মবীর ওঁরা হলেন নেতা, কর্মী। ভবভূতি কি বলেননি, কবির আবেদন সমানধর্মীর কাছেই—

অতুলপ্রসাদের এই আকুতি দিলীপকুমারকে রণে ভঙ্গ দিতে হল। টেলিগ্রাম করে সুভাষকে জানিয়ে দিলেন, 'unavoidably detained'.

অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বুকে জড়িয়ে বললেন, এরি তো নাম বীর বালক! ধরো হারমোনিয়ম—আজ ফের একটা নূতন গান বেঁধেছি তোমার মন পেতে।

অতুলপ্রসাদ গাইলেন,

চাঁদিনী রাতে কে গো আসিলে?
উজল নয়নে কে গো হাসিলে?
মোহনসুরে
ধীরে মধুরে
পরাণ-বীণায় কে গো বাজিলে?
হেম-যমুনায়
প্রেম-তরী বায়,
কে ডাকে আমায়—'আয় গো আয়'?
প্রভাতবেলায়
সোনার ভেলায়
কেমনে চ'লে যাবে হায়!
তব সে কুলে
যাবে কি ভুলে
যে ভালোবাসা বাসিলে?

মিশ্র-দেশ পিলুতে অপরূপ গানটি সম্পূর্ণ নূতন।

দিলীপকুমার বললেন, এ একেবারে নব সৃষ্টি অতুলদা। বাংলা গানে হিন্দী ঠুংরির আলো হাওয়ার গন্ধ!

—কী বলো দিলীপ? তবে আমাকে ভালোবাসো তাই...

—ভালোবাসা অন্ধ করে অনেক সময় মানি। কিন্তু চোখও ফোটায় ত।—

অতুলপ্রসাদের ব্যক্তি জীবনের বেদনা-দুঃখ তাঁর গানে সুন্দর ও মহৎ হয়ে উঠেছে, তাই তাঁর গানে শ্রী-মহত্ব ও সৌকুমার্য এই তিনের সহ অবস্থানে বেদনা হয়ে উঠেছে গান—আর সেই গানই অতুলপ্রসাদের আত্ম-পরিচয়, আত্মজীবনী। দিলীপকুমার এবার লখনউ ছাড়বেন। অতুলপ্রসাদ এবং দিলীপকুমার একত্রে শয়ন করতেন। সে রাত্তিরে দিলীপ বিস্ময়ের সঙ্গে প্রশ্ন করেন, কেমন করে এত হাসতে পার তুমি!

মৃদু হেসে অতুলপ্রসাদ উত্তর দিলেন, দিলীপ, গান ও হাসিই আমার জীবন।... আমি কি প্রার্থনা করি ভগবানের কাছে জান? শ্মশানে যেদিন আমাকে নিয়ে যাবে সেদিন চিতায় শুয়ে হঠাৎ যেন সকলের দিকে চেয়ে একবার হেসে তবে চোখ-মুদি।—

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বেশ কদিন অতুলভবন সঙ্গীতমুখর ছিল। কিন্তু ভবনের ভেতরে ভেতরে ঘনীভূত বেদনার বাষ্প হেমকুসুম-হেমন্তশশী-তিন বোন হিরণ-কিরণ-প্রভাদের বেশ আলোড়িত করছিল সাংসারিক ছোটখাট বিধি ব্যবস্থার বিচিত্র পথে। কিন্তু অতুলপ্রসাদের চিত্ত সেই বাষ্পের কোমল আঘাত বক্ষে ধারণ করে নিজের ভেতরই নিজে তাকে গতি দিয়েছেন গানে ও খোস গল্পের আসরে নিজেকে গভীরভাবে যুক্ত রেখে। কিন্তু সে আর ক'দিন। এখন একেবারে প্রত্যক্ষতার সামনে মুখোমুখি।

পুত্র দিলীপ প্রায়শই মা-বাবার কথা কাটাকাটি আর উভয়ের অভাবনীয় নীরবতায় বেশ অস্বস্তি বোধ করতেন—মাঝে মাঝে নিরাশ হয়ে যেতেন—পড়ায় মন নেই, বিশৃঙ্খল পরিবেশে মনকে কিছুতেই সহজ করতে পারতেন না। ঠাকুমা, পিসিদের কাছেও বেশী যেতে পারতেন না—মা'র বারণ। সবমিলিয়ে দিলীপ একান্তভাবেই ছন্নছাড়া হতে চলেছে—পিতার নজর নেই, তিনিও উদাসীন। এ ধরনের ব্যবস্থা হেমকুসুমের পছন্দ নয়। একটিমাত্র সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে করে কূল না পেয়ে হেমকুসুম তেতে উঠছেন তাঁর স্বামীর উপর। কিছুই সংসারে মনের মত হচ্ছে না। বিরোধের তুষ আস্তে আস্তে ক্রোধাগ্নির স্পর্শে জ্বলে উঠছে।

এদিকে অতুলপ্রসাদও চিন্তান্বিত! মা হেমন্তশশীর কষ্ট, বোনদের প্রতি গৃহের কর্ত্রীর অসহযোগিতা, তার উপর হেমকুসুমের অভিযোগ, একমাত্র ছেলের লেখাপড়ায় মন নেই, বাবা তা দেখছে না—সব মিলিয়ে অতুলপ্রসাদ বিব্রত। পুত্র দিলীপকে অতুলপ্রসাদ কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, লেখাপড়ায় মন নেই কেন?

দিলীপ স্পষ্টভাষায় সেদিন বলেছিল, আমার পড়ায় মন বসছে না—কোন একটা বৃত্তিতে ভর্তি হতে চাই, কিছু শিখতে চাই।

অতুলপ্রসাদ স্নেহার্দ্র সুরে বললেন, বেশ, কি শিখতে চাও!

... ফার্মিং, আমি ফার্মিং শিখতে চাই। এলাহাবাদের নৈনী কলেজে ফার্মিং শেখার ব্যবস্থা আছে। দিলীপ খুব দ্রুত অথচ গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে বাবাকে বললেন।

—তাই হবে। আমি সব ব্যবস্থা করছি। তুমি মাকে সব বল, আর তৈরী হও—অতুলপ্রসাদও আন্তরিকতায় কথাগুলো বললেন।

হেমকুসুম আপত্তি করেননি। পুত্রের কিছু একটাতে যুক্ত থাকা দরকার। তা'ছাড়া নৈনী খুব দূরেও নয়।

এদিকে পুত্র দিলীপকুমারের জন্য সব ব্যবস্থা চূড়ান্ত করলেন অতুলপ্রসাদ।

এবার যাবার সময়। দিন যতই এগিয়ে আসছে হেমকুসুমের সন্তান-বিচ্ছেদের চিন্তা ভেতরে ভেতরে গভীরভাবে অস্থিরতার শূন্যতায় কান্না ঘিরে ফেলছে। মুখে কিছু বলতে পারছেন না, পাছে দিলীপের মন আড়ষ্ট হয়, খারাপ হয়।

দিলীপ খুব সহজ প্রকৃতির খুব সাদামাটা ভালমানুষ। তাকে একলা একলা ছেড়ে দেওয়া হেমকুসুমের ইচ্ছা নয়। তাই তিনি বাড়ীর পুরনো খানসামা জুম্মতকে দিলীপের সঙ্গে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন। জুম্মত দিলীপকে শৈশব থেকেই যত্ন করে, দিলীপও জুম্মতকে ক'দিন কাছে পেলে হোস্টেলে সব ঠিক ঠাক গুছিয়ে নিতে পারবে; তারপর ছেড়ে দিলে কোন অসুবিধা হবে না। জুম্মত অতুলপ্রসাদের খাস ভৃত্য, বাড়ীর সকল কাজকর্মের প্রয়োজনীয় লোক।

কিন্তু দিলীপের সঙ্গে জুম্মতের যাবার প্রস্তাবে অতুলপ্রসাদের মা ও বোনেদের আপত্তি। জুম্মত বাড়ীতে না থাকলে খুবই অসুবিধা হবে।

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে অতুলভবন আবার জ্বলে উঠল—

উভয়পক্ষ অনড়, অটল। হেমকুসুম ক্ষুব্ধ, অতুলপ্রসাদ কুণ্ঠিত—অসহায়।

হেমকুসুম কিছুতেই তাঁর একমাত্র সন্তানের অসুবিধা হবে তা' সহ্য করতে পারবেন না। দিলীপের প্রতি এ ধরনের আচরণ তিনি ভাবতেও পারেন না। তিনি নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে রইলেন—খাওয়া নেই, কারো সাথে কথা নেই। খানসামা জুম্মতের বার বার অনুরোধ করেও কিছু হ'ল না।

হেমকুসুম স্থির করলেন দিলীপকে নিয়ে এ বাড়ী ত্যাগ করে লখনউতে অন্য কোন বাড়ীতে চলে যাবেন। যেই ভাবা সেই কাজ, হেমকুসুমের চরিত্রের এটাই বিশেষত্ব—তা ভালই হোক খারাপই হোক। তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে সরানো কোনভাবেই সম্ভব নয়।

তাই যথাসময়ে দুপুরে হেমকুসুম দিলীপকুমারকে সঙ্গে করে অতুলপ্রসাদের অনুরাগী স্নেহভাজন কোন একজনের বাড়ীতে চলে গেলেন।

হেমন্তশশী এ ঘটনাতে খুবই বিরক্ত, অসন্তুষ্ট এবং অপমানিত। অতুলপ্রসাদের আসার অপেক্ষায় রইলেন। অতুলপ্রসাদ কোর্ট থেকে ফিরে বাড়ী ঘরের অবস্থা দেখে বুঝতে পারলেন কিছু একটা অঘটন ঘটেছে। কিন্তু কিছুই জিজ্ঞাসা করলেন না। মা হেমন্তশশী পুত্রের কাছে এসে হেমকুসুমের দিলীপকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবার কথা জানালেন। অতুলপ্রসাদ সব শুনলেন, কিছু বলার আগেই হেমন্তশশী বললেন, আমি বেঁচে থাকতে হেমকুসুমের এ বাড়ীতে আর আসা চলবে না।

জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

কিছুদিন পরে হেমকুসুম ক্যান্টনমেন্ট রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে দিলীপকে নিয়ে বসবাস করতে লাগলেন।

এ যে কী মর্ম যন্ত্রণা—অতুলপ্রসাদ তা' কাকে বোঝাবেন। প্রতিদিন কোর্টে যান—নানা ব্যস্ততার মধ্যে নিজেকে উজাড় করে সবার সঙ্গে যুক্ত হতে চান; কিন্তু তাঁর ঘরেই তাঁর প্রিয়া হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের সঙ্গ ছেড়ে আলাদা ঘর ভাড়া করে রয়েছেন—কোর্টে এ নিয়ে কথা হয়, শুভানুধ্যায়ীরা মাঝে মধ্যে অতুলপ্রসাদের একাকীত্বের জন্য দুঃখ অনুভব করেন—কিন্তু বলতে সাহস হয় না পাছে অভিমান হয়।

সারাদিনের হিসেব নিকেশ চুকিয়ে অতুলপ্রসাদ ঘরে আসেন—মা হেমন্তশশী পুত্রের কাছে এসে বসেন। আদর-মমতা জড়িত কণ্ঠে কুশল জিজ্ঞাসা করেন। বোনেরাও আসে—গান করে।

অতুলপ্রসাদ এমনি কোন এক সন্ধ্যায় তার বাগানের সামনেটায় ইজিচেয়ারে বসে। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ধূর্জটিপ্রসাদ এলেন, কিছু জরুরি কথা সেরে উঠবেন—এমন সময় অতুলপ্রসাদ বললেন, বসো ধূর্জটি। একটা গান লিখেছি শুনবে!

ধূর্জটিপ্রসাদ আনন্দিত ও উৎসুক কণ্ঠে বললেন, অবশ্যই।

অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

বলো সখী, মোরে বলো বলো,
কেন গো নয়ন ছলছল?
এমন প্রাতে ধরি দু-হাতে
চেয়েছে কি কেহ ঢলঢল?
কাহারো বাঁশি, মোহনভাষী,
ডেকেছে কি-'বঁধু, চলো, চলো'?
তোমার মালা পরিয়ে গলে
চলে গেছে কি হাসিয়ে খলখল?
ভাঙিব বাঁশি, সরবনাশী
চলো ফিরে, ঘরে চলো চলো।

ধূর্জটিপ্রসাদ হেমকুসুমের অন্যত্র চলে যাবার কথা জানতেন। গানটি শোনার পর ধূর্জটিপ্রসাদ অতুলদার কাছে এসে একটু উদাসভরা কণ্ঠে, আজ তবে চলি, বলে চলে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

রবীন্দ্র সংবর্ধনা।

লখনউ পৌরসভা থেকে রবীন্দ্রনাথকে পৌরসংবর্ধনা জানানোর সিদ্ধান্ত হয়। সেই মত রবীন্দ্রনাথকে নিমন্ত্রণ পাঠানো হ'ল। নিমন্ত্রণ-পত্রের সঙ্গে অতুলপ্রসাদ কবিকে অনুরোধ জানিয়ে পত্র দিয়েছিলেন, তিনি যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঁকে অন্ততঃ পাঁচ সপ্তাহ সময় দেন উপযুক্ত প্রস্তুতি পর্বের জন্য। রবীন্দ্রনাথ লখনউ আগমনের দিন স্থির করে অতুলপ্রসাদকে পত্রের উত্তর দেন। স্থির হয়, রবীন্দ্রনাথ চার দিন লখনউতে থাকবেন। সমগ্র লখনউ নবসাজে সজ্জিত হচ্ছে এবং তারজন্য সব দায়িত্ব দেওয়া হয় অতুলপ্রসাদের উপর। চার চার দিন, রবীন্দ্রনাথ লখনউতে থাকবেন—সে এক অভাবনীয় আনন্দ উৎসাহে লখনউ-এর বাঙালি তথা জনসাধারণের মধ্যে বিপুল উত্তেজনা প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

ঘরোয়া সান্ধ্য বৈঠকে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার অনুষ্ঠান সূচী তৈরী হল। অতুলপ্রসাদ গান রচনা করলেন এবং বাছাই করা ছোটছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে গানগুলি তৈরী করালেন। পাহাড়ী সান্যাল তার মধ্যে অন্যতম।

সারা লখনউ রবীন্দ্র-সংবর্ধনায় মেতে উঠেছে। তার ঢেউও হেমকুসুমের অন্তরকে পুলকিত করে তুলল। হেমকুসুমের মন উতলা। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের অতিথি হবেন, কিন্তু হেমকুসুম কী করবেন—অতুলপ্রসাদের অতিথি তাঁরও অতিথি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের এই মহাশুভ আগমনের বার্তা সবাইকার কাছে পাঠানো হয়েছে, হেমকুসুমের কাছে তো কেউ আসেনি! হেমকুসুমের অভিমান-সঞ্জাত বেদনার উৎস সেই অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ একবারের জন্য মহাউৎসবের বার্তা হেমকুসুমকে জানাননি কেন? —এই মহানন্দ যজ্ঞে সবার আহ্বান—তবে কী আমি ব্রাত্য, আমি বাদ। কিন্তু তা' হবার নয়—রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা। আমারও দায় আছে, আমারও অধিকার আছে সেই মহাযজ্ঞে আমার আহুতি দেবার; —এই ভেবে হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের অহংকারকে, অবজ্ঞাকে কিছুমাত্র আমল দিলেন না। পুত্র দিলীপকে নিয়ে হেমকুসুম অতুলপ্রসাদের পাশে দাঁড়ালেন—পুলকিত বিস্ময়ে এবং উচ্ছ্বসিত আনন্দে হেমকুসুমকে হৃদয়ের সকল শূন্যতা ভরাট করে বরণ করলেন, অভিনন্দন জানালেন অতুলপ্রসাদ নিজে।

অতুলপ্রসাদ সত্যপ্রসাদকে কোলকাতা থেকে ডেকে পাঠালেন লখনউতে তার পাশেপাশে থেকে রবীন্দ্র সংবর্ধনায় সহযোগিতা করার জন্য। লখনউ 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি' থেকে পাহাড়ী সান্যাল, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল, দ্বিজেন্দ্র আদিত্য, গিরিশ ভট্টাচার্য, বীরেন্দ্রনাথ রায়, অখিল বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগীন বন্দ্যোপাধ্যায়—এদের নিয়ে সংবর্ধনার পুরো ছক কষলেন। নিজের বাড়ীতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় কোর্ট

ফেরৎ সভা করেন তাদের নিয়ে অতুলপ্রসাদ। রবীন্দ্র-সংবর্ধনা যাতে নিখুঁত হয় সেদিকে গভীরভাবে নজর দেবার জন্য নানা পরিকল্পনার রূপরেখা স্থির করেন অতুলপ্রসাদ নিজে। শরীর ভাল নয়—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ আসছেন—এ কথা মনের সমস্ত তন্ত্রীতে উৎসারিত করে এগিয়ে চলেন অতুলপ্রসাদ।

পাহাড়ী সান্যালকে ডেকে বললেন, গান লিখছি—তোমাকে গাইতে হবে—ফাঁকি দিলে চলবে না।

সেইমত পাহাড়ী সান্যাল সাইকেলে চড়ে প্রায় প্রতিদিন এসে অতুলপ্রসাদের গান লেখার সংবাদ নিয়ে যেতেন। বেশ কদিন পাহাড়ী সান্যাল এসেছিলেন—কিন্তু শরীর প্রতিকূল থাকায় 'গান' লেখা হয়নি অতুলপ্রসাদের। অবশেযে 'গান' কয়েকটি লিখলেন—পাহাড়ী সান্যালকে শিখিয়েও দিলেন। দিন সমাগত—লখনউ সেজে উঠেছে। স্থানীয় মান্যগণ্য ব্যক্তিগণ প্রতিদিন সমস্ত খবর নিতেন মিঃ সেনের কাছে।

লখনউ বিখ্যাত সানাইবাদক তালিম হোসেনও প্রস্তুত রবীন্দ্রনাথকে সংবর্ধনার জন্য। সারা লখনউ এর প্রতিটি বড় বড় রাস্তা ফুল-পাতায় সেজে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথকে স্টেশন থেকে সংবর্ধনা করে আনার জন্য মামুদাবাদের নবাবের ল্যান্ডোগাড়ী অতুলপ্রসাদের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হ'ল—একদিন আগে। নানা রংয়ের ফুল ও রঙিন কাপড়ে সাজিয়ে এক অপরূপ করে তোলা হল ল্যান্ডোগাড়ী। কবিকে নিয়ে ট্রেন লখনউ স্টেশনে এসে পৌঁছতেই 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র শিল্পীদের ঐকতান বাদনের সুর মূর্ছনায় বাতাস মন্দ্রিত হয়ে উঠল। বিশ্বকবিকে দেখার জন্য স্টেশনে, স্টেশনের বাইরে সদর রাস্তায় জন সমুদ্র—বাড়ীর ছাদে, গাছের ডালে, দাঁড়িয়ে থাকা লরিতে শুধু জনতার মুক্ত স্রোত—একবার রবীন্দ্রনাথকে দেখার বাসনা। রমণীগণ বাড়ীর জানালায় দাঁড়িয়ে জট পাকানো।

হেমকুসুম অনেকক্ষণ আগেই স্টেশনে এসেছেন। স্বেচ্ছাসেবকগণ তাঁকে পথ করে দিল কবির কাছাকাছি অতুলপ্রসাদের পাশাপাশি। স্মিত অথচ মুগ্ধ হাসিতে হেমকুসুম-অতুলপ্রসাদের ভাব বিনিময়, সে এক স্বর্গীয় অনুভূতি—অতুলপ্রসাদের প্রেরণা ও উদ্যম যেন সহস্র ধারায় আরো বেশী আন্তরিকতায় তৃপ্ত হচ্ছিল।

শোভাযাত্রা শুরু হ'ল কবিবর রবীন্দ্রনাথকে ল্যান্ডোগাড়ীতে বসিয়ে—কিন্তু এগুতে পারছে না। উৎসাহী জনতা ল্যান্ডোগাড়ীর ঘোড়া খুলে দিল এবং নিজেরাই কবিকে বহন করে চলল। সে এক অভূতপূর্ব উত্তেজনাময় দৃশ্য। কোন রাজনৈতিক নেতার কিম্বা লখনউ-এর ইতিহাসে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সমাবেশের পরিবেশ এর আগে পরিলক্ষিত হয়নি। শোভাযাত্রার দু'পাশের বাড়ীর ছাদ থেকে নানারংয়ের পুষ্প ছুঁড়ে দেওয়া হল। রাস্তায় জল ঢেলে দেওয়া হল শীতলতার জন্য।

রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গাড়ী এসে দাঁড়ালো অতুলপ্রসাদের বাড়ীর সম্মুখভাগে। হেমন্তশশী শঙ্খ-চন্দন এবং ফুলসহ পাত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথকে বরণ করার জন্য। রবীন্দ্রনাথ গাড়ী থেকে নামলেন—মুগ্ধ অনিন্দ্য মুখ চোখ তপোবনের ঋষির মত মনে হচ্ছিল। পাহাড়ী সান্যাল এককভাবে কিছুমাত্র সময় ক্ষেপ না করেই অতুলপ্রসাদ রচিত দেশরাগে রবীন্দ্রনাথকে স্বাগতম জানালেন।

এরপর বালক বালিকাদের সমবেত কণ্ঠে—

এসো হে এসো হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাসভবনে।
আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ পূজিতে বঙ্গরতনে।
লহো আমাদের হরষ-ভার,
পরো আমাদের প্রীতির হার,
হৃদয়ের থালা ভরিয়া এনেছি
ভক্তিপুষ্প চন্দনে।

তোমার গৌরব, তোমার মান,
তোমার সুকৃতি, তোমার জ্ঞান
তোমার বিনয়, প্রেম মহান—
ঘোষিছে ভারত-বন্দনে।
ঈশপদে করি মিনতি আজ,
করো করো তুমি দেশের কাজ
দেশের দৈন্য দেশের লাজ
ঘুচাও দীর্ঘ জীবনে।।

অভিনন্দন, সমবেত অভিনন্দনে অভিভূত কবি। হেমন্তশশী কবির কপালে চন্দনের তিলক দিলেন—হেমকুসুম এগিয়ে এসে কবিকে পুষ্পমাল্যে বরণ করলেন—প্রণাম করে নিবেদন করলেন আন্তরিক অনুরাগ।

এরপর প্রত্যাভিনন্দনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'কৃষ্ণকলি' কবিতাটি সম্পূর্ণ আবৃত্তি করে শোনালেন। লখনউ-এর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে সে এক অনবদ্য অঘটন। সাধারণ মানুষের সাথে সাথে দেখতে দেখতে লখনউ-এর সেরা ব্যক্তিত্বপূর্ণ ব্যক্তিগণ অতুলপ্রসাদের ভবনে ভেঙ্গে পড়লেন। অতুলপ্রসাদ আজ হৃদয়ের সকল তন্ত্রী মুক্ত করে দিলেন—গানের আর গানের সমারোহ। রবীন্দ্রনাথও গান গাইলেন।

এরপর বিশ্রাম। রবীন্দ্রনাথ ক্লান্ত কিন্তু অবসন্ন নন। এত ভালবাসা, এত আন্তরিকতা এতদূরে এসে স্বজন-পরশ—এ এক অভাবনীয় সংযোজন!

রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার জন্য লখনউ-এর রাজা নবাব আলি খাঁ সাহেবের সুপ্রশস্ত বাংলোবাড়ীতে ব্যবস্থা হ'ল। নবাব আলির বাংলোবাড়ীতে একটি বিশাল হল ঘর। অতুলপ্রসাদের অনুরোধে নবাব সাহেব তাঁর বাসভবনে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছিলেন। তা'ছাড়া নবাব আলি রবীন্দ্র সংবর্ধনার জন্য গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিপদ গ্রহণ করেছিলেন।

পরের দিন রবীন্দ্রনাথকে নাগরিক সংবর্ধনা ঃ যথা সময়ে অতুলপ্রসাদ কবিকে নবাব আলির ভবনে নিয়ে গেলেন—কবি সেখানে পৌঁছানো মাত্র নবাব সাহেব ও স্থানীয় আরো অনেক প্রধান তালুকদার, আউধ চিফ্ কোর্ট-এর বিচারপতিগণ, লখনউ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের প্রধান সদস্যগণ, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও অধ্যাপকগণ রবীন্দ্রনাথকে স্বাগত জানালেন। এর পর একটি বাঙালি মেয়ে অতুলপ্রসাদ রচিত অভ্যর্থনা সঙ্গীত পরিবেশন করলেন—

জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পূরব-উজল রবি।
জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারতগৌরব রবি,
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি'
জয় হে কবি।

হে কবি, তোমার মোহন তান
নিখিল জনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি' তোমার দান
আজি গরবী—
হে বিশ্ব কবি।

কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর,
কভু বাজাও বীণা মৃদুমধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেমবিধুর—
বিচিত্র করি।

স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও
সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও
হে বীর কবি,
দেশপ্রেমী কবি।

বিশ্বের উদার সমতলে
ভারতীর দেউল তুলিলে,
দেশকালের ভেদ ভুলিলে
কী নব ছবি!—
হে কর্মী কবি।

বিশ্বেশ্বরের চরণতলে
তব গীতগঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে,
হে দেবকবি।

তারপর কবিকে মঞ্চে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথম বক্তা নবাব আলি খাঁ সাহেব—তারপর বিচারপতি বিশ্বেশ্বর নাথ শ্রীবাস্তব ও রাজা সুরজ বক্স সিং। এরপর কয়েকজন আইনজীবী বক্তব্য রাখেন। সর্বশেষ বক্তা অতুলপ্রসাদ। তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য প্রতিভার মূল্যায়ন করেন এবং পরে একটি গান করেন ঃ

কাঙাল বলিয়া করিয়ো না হেলা,
আমি পথের ভিখারী নহি গো।
শুধু তোমারি দুয়ারে অন্ধের মতো
অন্তর পাতি রহি গো।
শুধু তব ধন করি আশ
আমি পরিয়াছি দীন বাস;
শুধু তোমারি লাগিয়া গাহিয়া গান।
মর্মের কথা কহি গো।
মম সঞ্চিত পাপ পূণ্য,
দেখো, সকলি করেছি শূন্য;
তুমি নিজ হাতে ভরি দিবে তাই
রিক্ত হৃদয় বহি গো।

গানটি শেষ হবার পরই শ্রোতাদের মধ্যে গুন্‌গুনিয়ে শব্দ ভেসে এলো—'আহা, রবীন্দ্রনাথের গানের কি মিষ্টি সুর'। রবীন্দ্রনাথ তা শুনলেন—তখনই অতুলপ্রসাদকে পরামর্শ দিলেন তাঁর রচিত গানগুলি একত্র করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে।

তৃতীয় দিন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতানুষ্ঠান। গৈরিক পোশাক ও কাল টুপিতে বক্তৃতামঞ্চে রবীন্দ্রনাথ। ইংরেজীতে বক্তব্য রাখলেন রবীন্দ্রনাথ।

পরের দিন রাধাকমল মুখোপাধ্যায় ও রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-এর বাড়ীতে মধ্যাহ্নভোজনে রবীন্দ্রনাথ। সেখানে অতুলপ্রসাদ, ধূর্জটিপ্রসাদ, চরণদাস চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন। খেতে খেতে অনেক কথা হ'ল। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষায় বহুল প্রচলিত 'সুড়ঙ্গ', শব্দটি যেহেতু গ্রীক শব্দ—তার একটি বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বার করতে অনুরোধ করেছিলেন।

'রবীন্দ্রনাথের লখনউ থাকাকালে ধূর্জটিপ্রসাদ অতুলপ্রসাদের সাথে পরামর্শ করে এবট্ রোডস্থ বাসভবনেই একটি সঙ্গীতের আসর করেন। সেখানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা' ও 'তুমি একলা ঘরে বসে বসে কি সুর বাজালে' এবং অতুলপ্রসাদ 'আ মরি বাঙলা ভাষা' এই তিনটি গানের মধ্য দিয়ে একটি পরিচ্ছন্ন মুগ্ধতার বাতাবরণ সৃষ্টি করেছিল।

রবীন্দ্রনাথ লখনউ ছেড়ে বোম্বে রওনা হলেন। লখনউ স্টেশনে হেমকুসুমসহ অতুলপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথকে তুলে দিতে এলেন। গাড়ী ছেড়ে দিল—অতুলপ্রসাদ এগিয়ে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বিদায় জানালেন। পিছন ফিরে দেখেন পাশে থাকা হেমকুসুম নেই। 'হেম, হেম' বলে এদিক ওদিক তাকিয়ে ক্লান্ত প্রায় অবসন্ন দেহে বাড়ী ফিরলেন—বাড়ী ফিরেই অতুলপ্রসাদ দ্রুত হেমকুসুমের এ'ঘর, ওঘর ছুটোছুটি করতে করতে চিৎকার করে ডাকছেন হেম, হেম—তুমি কোথায়—দিলীপ, তোমরা কোথায়! কেউ সাড়া দিল না। ভৃত্য-খানসামা সবাই ছুটে আসছে—হেমন্তশশী ছুটে এলেন—বললেন, বৌমা তো আসেনি। বোনেরা বলল, বৌদি তো এখানে আসেন নি। অতুলপ্রসাদ বুঝলেন, হেমকুসুম পুত্র দিলীপকে নিয়ে চলে গেছেন। সজোরে নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে অসহায় ভাগ্যহত বেদনায় ছট্‌ফট্ করতে করতে সদ্য রক্ত-স্নাত মনটাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ছুঁড়ে দিয়ে গাইলেন—

পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ্!
কেন রে তুই যেথা সেথা পরিস প্রাণে ফাঁদ?
শীতল বায়ে আস্‌লে নিশি
তুই কেন রে হোস্ উদাসী?
ওরে নীলাকাশে অমন করে হেসেই থাকে চাঁদ।
শৈলশিরে সোনার খেলা
দেখিস যবে প্রভাতবেলা,
তুই কেন রে হোস্ উতলা দেখে মোহন চাঁদ?
করুণ সুরে গাইলে পাখি

তোর কেন রে ঝরে আঁখি?
কবে তুই মুছ্‌বি নয়ন, ঘুচবে মনের ধাঁধ?
সংসারেতে উঠলে হাসি
তুই শুনিস রে ব্রজের বাঁশি।
ওরে ভাবিস্‌ কি রে সবই গোকুল, সবই কালাচাঁদ?
কতই পেলি ভালবাসা,
তবু না তোর মেটে আশা!
এবার তুই একলা ঘরে নয়ন ভ'রে কাঁদ্‌।।

বিছানার শয্যায় এপাশ ওপাশ করতে করতে অতুলপ্রসাদ নিজেই বিভ্রান্ত মনকে কিছুটা শান্ত করলেন। হেমন্তশশী পুত্র অতুলপ্রসাদের মানসিক যন্ত্রণা বুঝতে পেরেও কিন্তু বন্ধ ঘর থেকে অতুলকে বেরিয়ে আনতে পারলেন না। অতুলপ্রসাদ তার কিছুক্ষণ পরেই সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতায় মিশ্র আশাবরী রাগে গাইলেন—

ওগো নিঠুর দরদী, এ কী খেলছ অনুক্ষণ?
তোমার কাঁটায় ভরা বন তোমার প্রেমে ভরা মন।
মিছে দাও কাঁটার ব্যথা, সহিতে না পার তা;
আমার আঁখি-জল তোমায় করে গো চঞ্চল—
তাই নয় বুঝি বিফল আমার অশ্রুবরিষণ!
ডাকিলে কও না কথা, কী নিঠুর নীরবতা!
আবার ফিরে চাও, বল 'ওগো শুনে যাও,
তোমার সাথে আছে আমার অনেক কথন'।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

তিন বোন, হিরণ-কিরণ-প্রভা এবং মা হেমন্তশশী বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে অতুলপ্রসাদের বেদনাবিদ্ধ মনের অন্তর্লীন অবস্থার কান্না শুনলেন। অরুণপ্রকাশও তখন সেখানে ছিলেন। 'পাগলা, মনটারে তুই বাঁধ' গানটি যখন অতুলপ্রসাদ রচনা করেন এবং পরবর্তী সময়ে তা' রেণুকা দাশগুপ্ত বা আরো পরে দিলীপকুমার রায়-সাহানা দেবীও গানটি যেভাবে গেয়েছেন আজ এমন একটি পরিবেশে তাড়িত হয়ে হৃদয়-নিঃসৃত ব্যাকুলতায় স্নাত হয়ে অতুলপ্রসাদ যেভাবে গাইলেন—তাতে ভৈরবী রাগকে একটি বিশেষ মাত্রায় উন্নীত করলেন।

অরুণপ্রকাশ গানটি শোনার মধ্য দিয়ে অতুলপ্রসাদের অন্তরের ছিন্ন-ভিন্ন আর্তনাদকে অনুভব করে খুবই চঞ্চল হয়ে গেলেন। তিনি নিজে ছুটে গেলেন

ক্যান্টনমেন্ট রোডের ভাড়াবাড়ীতে হেমকুসুমের কাছে—কাতরভাবে মিনতি করে অনুরোধ জানালেন, অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে দিলীপকুমার সহ চলে আসতে, অতুলপ্রসাদকে স্নিগ্ধ করতে। কিন্তু হেমকুসুম নীরব—ভেতরে ভেতরে যে শূন্যতার হাহাকার নিজের মধ্যেও অহর্নিশ অনুভব করে চলেছেন তার জন্য তার নিজেরও কম দুঃখ হয় না—তবুও হেমকুসুম ভেঙ্গে পড়লেন না, ছুটলেন না অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য লাভের জন্য। অত্যন্ত স্বাভাবিক নীরবতায় অরুণপ্রকাশকে ফিরিয়ে দিলেন। অরুণপ্রকাশ অত্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে এলেন—নিজের বাড়ী যাবার রাস্তায় নামলেন—কিন্তু পরক্ষণেই অতুলপ্রসাদের অসহায়তার কথা ভেবে পথের বাঁক পরিবর্তন করে অতুলপ্রসাদের কাছেই এলেন।

অতুলপ্রসাদ কোর্টে যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। খাবার কিছু খেলেন না—হেমন্তশশী দুটো সন্দেশ অতুলের মুখে পুরে দিলেন।

অতুলপ্রসাদ অরুণপ্রকাশকে দেখে বললেন, সন্ধ্যায় ধূর্জটিকে সাথে করে একবার এসো।

অরুণপ্রকাশ সন্ধ্যায় এসেছিলেন কিন্তু ধূর্জটিপ্রসাদ আসেন নি। অরুণপ্রকাশ বাড়ী ঢুকবার আগেই অতুলপ্রসাদ নিজের ঘরের বারান্দায় বিশ্রাম করছেন। অরুণপ্রকাশকে দেখে কাছে আসতে বললেন এবং হাতে এক টুকরো কাগজ দিয়ে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

আবার তুই বাঁধবি বাসা কোন্ সাহসে?
আশা কি আছে বাকি হৃদয়-কোষে?
কতবার গড়লি রে ঘর,
কতবার এল রে ঝড়,
কতবার ঘরের বাঁধন পড়ল খ'সে।
বাইরের মুক্ত মাঠে যেন তোর জীবন কাটে।
কেন তুই ক্ষুদ্র বাটে থাকবি বসে?
সবারে কর্ রে আপন, হ রে তুই সবার আপন;
ভুলে যা দুখের দহন ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে।

অরুণপ্রকাশ কাঠ হয়ে বসে রইলেন—এত যন্ত্রণা, এত দুঃখ, হৃদয় ভেঙে ভেঙে তছ্নছ্ হয়ে যাচ্ছে অনবরত—অথচ কোন অভিযোগ নেই, নেই কোন প্রতিশোধ স্পৃহা। কি করে সম্ভব—সকল প্রিয়জনের কাছ থেকে এত বঞ্চনা পেয়ে পেয়ে তবুও বলে 'ডুব দিয়ে গান-সুধার রসে'।

অতুলপ্রসাদ অরুণপ্রকাশের ভাবান্তর দেখে গায়ে হাত দিয়ে বললেন— ও সব মনে রাখতে নেই—পরে গাইলেন,

ওগো দুঃখী, কাঁদিছ কি সুখ লাগি?
সুখের যাতনা জান না কি?
কুসুম দু'দিনে শুকায়ে যায়,
থাকে শুধু কাঁটা তার বোঁটায়;
থাকে কেতকী-বনে ফণী জাগি।
মিলনে সদাই বিরহ-ভয়;
সে জয়ী যে-জন বেদন সয়।
দুখের দহনে হও অমল,
মুছাও দুঃখীর আঁখির জল।—
পেতে যদি চাও, হও ত্যাগী।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২৩ সালের অগস্ট মাসের শেষদিকে বারাণসীতে অল ইন্ডিয়া লিবার‍্যাল ফেডারেশনের অধিবেশন— অতুলপ্রসাদ মূল সভাপতি। এই অধিবেশনের উদোক্তা সি. ওয়াই চিন্তামণি। সেই অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ বলেছিলেন—

"....Strongly urged for complete Provincial Autonomy and a thorough-going Indianisation of the services and recruitment in England should be stopped at once. He also dwelt upon the subjects of the separation of functions (Judicial and Excutive), Hindu-Muslim relations, the Shadeshi movement, the relations between landlords and tenants, between capital and labour and some other provincial or less invert ant topics"... Indian annual Register 1923.

লখনউতে বোন কিরণের কন্যা বুলবুলকে লেখাপড়ায় সাহায্য করার জন্য অতুলপ্রসাদ অরুণপ্রকাশকে অনুরোধ করেছিলেন। বুলবুলকে অতুলপ্রসাদ খুব ভালবাসতেন। অনেক সময় বেদনায় ক্লান্ত হয়ে বুলবুলের কাছে এসে সহজ হয়ে যেতেন—। বড় মিষ্টি মেয়ে বুলবুল।

সেই বুলবুল ক'দিনের রোগে মারা গেল। অতুলপ্রসাদের ঘরে শোকের ছায়া সমস্ত পরিবেশকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। সকালে অরুণপ্রকাশ সংবাদ পেয়েই ছুটে এলেন—গেটের কাছে এসে দেখলেন অতুলপ্রসাদ প্রতিদিনের মত সামনের বাগানে নীরবে দাঁড়িয়ে গুন্‌গুন্ করে সেই বিখ্যাত শোক-সন্তাপ-হরা গানটি গাইছেন—

কি আর চাইব বলো, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

বুলবুলের মরদেহ ভৈঁসাকুণ্ড শ্মশানে নিয়ে দাহ করা হল। অতুলপ্রসাদ শ্মশানে গিয়েছিলেন! কিন্তু দাহকাজের স্থান থেকে অনেক দূরে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। নলিনী বিহারী হালদারও সেখানে ছিলেন। দাহকাজ সমাধা হবার পর সবাই যখন অতুলালয়ে এলেন, অতুলপ্রসাদের অনুরোধে নলিনীবিহারী তাঁর দাদা উত্তরপাড়ার ডাক্তার মণিভূষণ হালদার রচিত গানটি গাইলেন—

হরি হরি বলে দুই বাহু তুলে
প্রাণ সখারে ডাকিয়ে আয়,
ও সে ভুবন মোহন নব ঘনশ্যাম
ভকতি পরাণ হরিয়া লয়।

এরপর অতুলপ্রসাদ উপাসনায় বসলেন। অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়—মা হেমন্তশশী-কিরণ-প্রভা, হিরণ সহ অন্তরঙ্গ কয়েকজন অনুরাগীও উপাসনায় যোগ দিয়েছিলেন।

অতুলপ্রসাদ প্রার্থনা করলেন—মা হেমন্তশশী ধর্মগ্রন্থ থেকে পাঠ করলেন। শেষে অতুলপ্রসাদ অন্তরের বেদনাকে আপন সীমা অতিক্রম করিয়ে অনন্ত আনন্দধামে নিয়ে গেলেন—

পরাণে তোমারে ডাকিনি হে হরি,
ডেকেছি শুধু গানে;
তাই তো তোমারে পাইনি জীবনে,
ফিরেছি শূন্য প্রাণে।
তুমি চাহ প্রাণ, নাহি চাহ ভাষা;
চাহ দীন বেশ, নাহি চাহ ভূষা;
গাহি নি সে গান-তুমি শুন যাহা,
আর কেহ নাহি শোনে।
তুমি সবাকার হতে আপনার
সে কথা বুঝিতে বাকি নাহি আর।
তবু শত ঠাঁই শত বার ধাই
চাহি না চরণ-পানে।
শিখাও আমারে গাহিতে সে সুরে
যা শুনি থাকিতে পারিবে না দূরে

আসিবে হৃদয়ে তব বীণা লয়ে;
মাতাবে নূতন তানে।

বুলবুলের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই বুলবুলের বাবা মারা যান, কিরণ বিধবা হন। অতুলপ্রসাদ খুবই বিমর্ষ, হতোদ্যম।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ রবিবার এবং ছুটির দিনে নিজের বাড়ীতে আড্ডা দিতেন—সেই আড্ডায় বাংলা সাহিত্যের দিকপালদের জীবনী এবং বিভিন্ন ঘটনায় তাদের মানসিক বিচিত্র উত্থান, সৃষ্টির ঘটনা নিয়ে বন্ধুদের সাথে আলোচনা করতেন। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতি বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকবৃন্দ—ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়-রাধাকমল মুখোপাধ্যায়-রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়-নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত-অসিত হালদার-বিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত-হেমেন্দ্রলাল রায়-রবীন্দ্রলাল রায়-অম্বিকাচরণ মজুমদার-শচীন দত্ত-প্রশান্ত দাসগুপ্ত-ভীম সেন-হামিদ আলি খাঁ এবং বাঙালি অবাঙালি সাহিত্য ও সংগীত পিপাসু যুবক ও ছাত্ররা উপস্থিত থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে অতুলপ্রসাদ যেন নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিতেন। শরৎচন্দ্রের 'চন্দ্রনাথ' এবং ব্যক্তি শরৎচন্দ্রের বিষয়ে শ্রোতাদের কাছ থেকে নানা প্রশ্নের সুচারু উত্তর দিতে অতুলপ্রসাদের ক্লান্তি হ'ত না।

অতুলপ্রসাদ যখন যেখানেই থাকতেন, সুযোগ পেলে ভাবের তন্ময়তায় গান রচনা করতেন—এমনি অসংখ্য গান পরবর্তী সময়ে নির্দিষ্ট খাতায় না থাকায় সেগুলি হারিয়ে গেছে।

ব্যারিস্টারী কাজে সকলসময় কিছু না কিছু কাগজপত্তর সঙ্গে থাকত। অতুলপ্রসাদ সেই মামলা সংক্রান্ত কাগজ পত্তরেও গান লিখতেন।

এমনি একটি বিখ্যাত গান ওকালতির ডাইরী কাগজের ফাঁক থেকে উদ্ধার করেন ধূর্জটিপ্রসাদ। সেদিন সাহিত্য-আসরে অনেক কথার আলোচনায় ডাইরী নাড়াচাড়া করতেই ধূর্জটিপ্রসাদ গানটির — দু'চার লাইন নিজে পড়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে অতুলপ্রসাদের নজরে আনলেন। অতুলপ্রসাদ সলজ্জভাবে ধূর্জটির কাছ থেকে কাগজটি চেয়ে নিলেন— তারপর চোখ বুজে সংযত সুরে উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন—

ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুনঃ উদবে কবে পূরব-ভালে?
হা রে বিধাতা, সে দেবকান্তি

কালের গর্ভে কেন ডুবালে?
আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন?
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে?
পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি?
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী?
সিংহের দেশে বিচারিছে শিবা,
বীর্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।
নানক গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি—
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতি।
ধর্মের বেশে বিহরে অধর্মী।
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে?

মন্ত্রমুগ্ধের মত লুপ্ত দেশগৌরবের স্তুতিতে শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দে উদ্বেলিত। অতুলপ্রসাদ দরদভরা সুরে গানটি খুবই উচ্চগ্রামে গেয়ে সকলের হৃদয় উন্মোচন করে দিলেন।

ব্যারিস্টারী কাজে প্রসিদ্ধি লাভের জন্য যে পরিশ্রম প্রতিদিন অতুলপ্রসাদকে করতে হ'ত তারই মধ্যে স্থানীয় ঐতিহ্য-সংস্কৃতি-ভাষা রীতিনীতি আয়ত্ত করার তাগিদও ছিল তীব্র। লখনউ গানের সাম্রাজ্য। ঠুংরি-দাদরার মজলিসে অতুলপ্রসাদের নিত্য যাওয়া আসা। তিনি ঠুংরি ভালবাসতেন— যার জন্য তিনি ঠুংরী বিশারদ 'বিন্দাদীন' ও 'কালকা'র এ দু'জনের সঙ্গে নিবিড়তা বাড়িয়েছিলেন, নিজে যেতেন, তাঁদের নিজের ঘরে এনে আদর করতেন, গানের পর গানে সব লুটে নিতেন। অতুলপ্রসাদ তাঁর বহু গানের সুর 'বিন্দাদীন ও কালকা'র ঢংয়ে গেয়েছেন'।

'কালকা' ও 'বিন্দাদীন' ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলির শা'র সভা-গায়ক ঠাকুর

প্রসাদের পুত্র। শৃঙ্গার রসে রসায়িত কথক নৃত্যে ঠুংরী গানের যে প্রভাব তা কালকা-বিন্দার ঘরানা। বহু অবাঙালি গানের গুণী গায়ক ও যন্ত্রবিদ্‌রা অতুলপ্রসাদের ঘরে আসতেন। আসতেন হারমোনিয়ম বাদক নবাব আলী সাহেব, কণ্ঠশিল্পী ওস্তাদ আহম্মদ খলীফ খাঁ, ছোটে মুন্নে খাঁ; যন্ত্রশিল্পী বরকৎ আলি, সাকায়েৎ হোসেন খাঁ; তবলা বাদক বীরু মিশ্র, খুরসেদ আলী খাঁ ও আবীদ হোসেন।

তা'ছাড়া কোন বিখ্যাত গাইয়ে—সে রামপুর থেকে অথবা গোয়ালিয়র থেকে, অথবা হায়দ্রাবাদ থেকে, 'মথুরা'-ইন্দোর-কাশী এমন কি কলকাতা থেকে আসতেন, প্রায় সবাই অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে আসর করতেন। সেই আসরে ভাতখণ্ডেজীহ্-শ্রীকৃষ্ণরতনজানকার প্রায়শই লখনউ এলে আসতেন। এক একটি গানের আসরে প্রভূত অর্থ খরচ হত অতুলপ্রসাদের। তাই কখনো কখনো অনত্রও আসর বসত।

শ্রীকৃষ্ণরতনজানকার 'ভবানীদয়ানী মহিষাসুর মরদনী' এই গানটি হৃদয় উজাড় করে দিয়ে গাইতেন। হেমন্তশশী তা' খুব ভালবাসতেন।

শ্রীকৃষ্ণরতনজানকারের সেই গানের অনুকরণে অতুলপ্রসাদ ভৈরবী রাগে একদিন আসরে গাইলেন—

সে ডাকে আমারে।
বিনা সে সখারে রহিতে মন নারে!— সে ডাকে
প্রভাতে যারে দেখিবে বলি
দ্বার খোলে, কুসুম-কলি',
কুঞ্জে-ফুকারে অলি, যাহারে বারে বারে,
নিঝর কলকণ্ঠ-গীতি বন্দে যাহারে,
শৈল-বন পুষ্পকুল নন্দে যাহারে
যার প্রেমে চন্দ্র তারা
কাটে নিশি তন্দ্রাহারা,
যার প্রেমের ধারা বহিছে শত ধারে।।

অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে ঠুংরী, গজল, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালীর সঙ্গে হিন্দুস্থানী রাগরাগিণীর মিলন ঘটিয়েছিলেন।

গানের জন্য অতুলপ্রসাদ শুধু নিজের ঘরের দুয়ার খুলে দেননি—নিজেও ছুটে গেছেন, যেখানে শুনেছেন গাইয়ে বাজিয়ে এসেছে—সেই আসরে, তাদের কুটিরে। কোন লাজ-ভয় এমন কি তাঁর মর্যাদা, স্ত্রী হেমকুসুমের কিন্তু-কিন্তু ভাব, কিছুই গ্রাহ্য করতেন না। এই গান পাগল, সুরকাঙালকে লখনউ এর প্রতিটি অলি-গলিতে দেখা যেত। অতুলপ্রসাদ মন-প্রাণ ভরে হৃদয়-অঞ্জলি নিয়ে সেই সব সঙ্গীতের

ছোট-বড় গাইয়েদের সাথে মিশে যেতেন, হৃদয়-কলস পূর্ণ করে তবে তৃপ্ত হতেন। এ ধরনের মানসিকতার জন্য হেমকুসুমও বিরক্ত হতেন, যদিও হেমকুসুমও গান ভালবাসতেন—গান গাইতেন—তবুও অতুলপ্রসাদের লাগামহীন, পাত্র-পাত্রীজ্ঞানশূন্য উদ্যাম ব্যাকুলতাকে তেমন ভালচক্ষে দেখতেন না। সন্দেহ বায়ুতে মাঝে-মধ্যে হেমকুসুম মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে প্রাচীর তুলতেন উভয়ের বোঝাপড়ায়—নানা অসংলগ্ন কথায় তাঁর প্রিয়, স্বামী অতুলকে আঘাত করতে এতটুকু দেরী হ'ত না। অতুলপ্রসাদ সব আঘাত, সব দুঃখকে গানের অঞ্জলি করে তাঁর সেই 'হরি'কে ফিরিয়ে দিতেন—তাই তো হৃদয়-প্রাণ খুলে হাসতে হাসতে সব সহজ করে নিতেন।

অতুলপ্রসাদ সঙ্গীত-সন্ন্যাসী। তাঁর বাসস্থান কেশরবাগ সেই সন্ন্যাসীর সিদ্ধ-স্থান লখনউতে। লখনউ-এর বাইরে থেকে যখনই কোন গাইয়ে-বাজিয়ে এসেছেন—কেশরবাগ তাঁকে আকর্ষণ করেছে। দ্বিধাহীন অনলসচিত্তে অতুলপ্রসাদের গৃহে এসে সঙ্গীতের গূঢ়রস পরিবেশন করেছেন, সার্থক হয়েছেন এমন গীত-পাগল তাপসের সান্নিধ্য লাভে। ভারতের সাধনতন্ত্রে স্থান মাহাত্ম্যের কথা আছে। স্থান মাহাত্ম্যের আকর্ষণে যুগে যুগে তপস্বীগণ সিদ্ধ-বস্তুর আস্বাদন লাভ করে সিদ্ধকাম হতেন। এই কেশরবাগও তেমনি সঙ্গীতের মাহাত্ম্যে সিদ্ধ স্থান। কেশরবাগ বারাদ্বারীতে লখনউ-এর নবাবদের এবং রাজাদের রাজপ্রাসাদ ছত্রমঞ্জিল, ছোটছত্রমঞ্জিল, নবাব-বেগমদের স্মৃতি সৌধ—যার ভেতর দিয়ে পরবর্তীকালে প্রশস্ত রাজপথ হয়েছে। লখনউ-এর শেষ ইতিহাস নবাব ওয়াজিদ্ আলি শাহ্-এর ইতিহাস। যিনি নানাভাবে হেনস্থা হয়ে লখনউ ছেড়ে লন্ডনের পথে অজানা কারণে কলকাতায় মেটিয়াবুরুজে রাজ অট্টালিকা তৈরী করে বসবাস করতেন। ওয়াজিদ্ আলি শাহ লখনউ ছেড়ে যাবার সময় বিষাদের গান গাইতে গাইতে লখনউকে কাঁদিয়ে কেশরবাগের ভেতর দিয়ে হাজারো নাগরিকের মিছিলে ধীরে ধীরে বারো ঘোড়া টানা গাড়ীতে চড়ে নর্তকীদের ঠুংরী গানের তালে তাল রেখে "ঘর ছোড় চলে লখনৌ নগরী" চলে গেলেন চিরকালের জন্য। এই সেই কেশরবাগ—যেখানে প্রতিটি ধুলি-কণায় মিশে আছে বিষাদের দীর্ঘশ্বাস, যারা দিন গুন্‌ছিলো পরবর্তী কোন একটি সময়ের, যেখানে আবার সেই ঠুংরীর মাধুর্যে রসাপ্লুত হৃদয়ের পরশ-ধন্য হতে। অতুলপ্রসাদ সেই কেশরবাগেই—এক অনন্য সংগীত-সাধনার তীর্থভূমিতে সবাইকে আহ্বান করেছেন প্রতিদিন।

অতুলপ্রসাদ যাঁদের গান শুনতে যেতেন, গান শোনার পর তাঁদের হাতে টাকা গুঁজে দিয়ে আসতেন।

এমনি একদিন নিজের কেশরবাগ বাড়ীতে মক্কেলদের সাথে একটি জটিল মামলার বিষয়ে কথাবার্তা বলছেন—হঠাৎ টোড়ী গানের সুর অতুলপ্রসাদের মুখ-চোখকে ভাবান্তরে নিয়ে গেল। অতুলপ্রসাদ উৎসুক শূন্য চাউনিতে এদিক ওদিক খুঁজছেন—সেই সুর, সেই অন্তর ভেজা আর্তি-কে; কে গায়!' উপস্থিত মক্কেলদের মধ্য থেকে একজন বললেন, লখনউ এর নামজাদা এক গায়িকা পাগল হয়ে রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে বেড়ায়—কথাটা শোনামাত্র অতুলপ্রসাদ, যে তাঁর পরিচয় দিল, তার হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে কাতর কণ্ঠে বললেন, যাও, যাও ওকে নিয়ে এসো, এমন গান, এমন হৃদয় নিঙড়ে নেওয়া গান! যাও! ওকে অন্ততঃ রাস্তার মোড়ে আনো, আমি সেখানে যাবো! এই বলে অতুলপ্রসাদ মামলার কাগজ-প্রত্তর ফেলে দিয়ে গায়ের চাদরটা কোন রকমে আল্‌তোভাবে সামনে নিয়ে ঘরের বাইরে বারান্দা পেরিয়ে রাস্তার মোড়ে দাঁড়াতেই, পাগলিনী অতুলপ্রসাদকে দেখেই দৌড়ে দ্রুত পালিয়ে গেল। অতুলপ্রসাদ তাঁকে চিনতেন। সে ছিল লখনউয়ের এক বিখ্যাত বাঈজী—প্রেমে পড়ে তার সর্বস্ব সে বিলিয়ে দিয়েছিল তার প্রেমিককে। প্রতিদানে তার কপালে জুটেছিল প্রবঞ্চনা। অতুলপ্রসাদও সেই বাঈজীর গান শুনবার জন্য কয়েকবার তার কাছে গিয়েছিলেন। পাগলিনী অতুলপ্রসাদের প্রাণটাকে বড় ধাক্কা দিয়ে গেল। বিমর্ষ, কাতর, অনেকটা বিরহ ব্যাকুল হৃদয়ে ঘরে ফিরে এলেন—তখন সবাই চলে গেছে। নীরবতার সীমাহীন শুন্যতায় অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে মনে করলেন—বার বার অস্পষ্ট স্বরে হেম, হেম বলে ডাকলেন।

সন্ধ্যা হয়েছে। হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদের ঘরে ঢুকে বাতি জ্বালালেন, দেখলেন অতুল আরাম কেদারায় ক্লান্ত দেহে শুয়ে আছে। অতি সন্তর্পণে কপালে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। অতুলপ্রসাদ ঝোলানো হাত দুটো তুলে মা'র হাত দুটো সজোরে চেপে ধরলেন। হেমন্তশশী অতুলের বন্ধচোখ দুটো থেকে ঝরে পড়া অশ্রু মুছে দিলেন। চোখ খুলে মা ছেলে কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে হৃদয়-ভেদী দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। সেই রাতে অতুলপ্রসাদ একটি গান রচনা করেছিলেন।

অতুলপ্রসাদ দু'দিনের জন্য মামলার কাজে কলকাতায় গিয়ে আবার লখনউ এলেন। যেদিন লখনউ এলেন সেদিনই বন্ধু বিজনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, শম্ভুশরণ ও নির্মল দে-দের সঙ্গে নিয়ে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন।

অতুলপ্রসাদ গানটি গাইলেন ঃ—

এত হাসি আছে জগতে তোমার, বঞ্চিলে শুধু মোরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
হাসিব হাসাব এই মনে লয়ে রচিলাম কত গান;

সেই গানে আমি কাঁদিলাম কত, কাঁদালেম কত প্রাণ।
যে ডোরে সবার হয় মালা গাঁথা, দিলি ফাঁসি সেই ডোরে—
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
আমিও তো কত সুখের আশায় আশার ভেলায় ভেসেছি;
আমিও কত সেই বাঁশি শুনি যমুনার কূলে এসেছি।
কোথা শ্যামরায়, যার লাগি হায় রহিতে নারিনু ঘরে?
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!
বুঝেছি তোমার মধুর মুরলী বাজিবে না মোর তরে।
এসো ঘনশ্যাম, তোমার রুদ্র দণ্ড লইয়া করে।
লয়ে যাও মোরে হে চিরবিরাম, তোমার রথের পরে।
বলিহারি বিধি, বলিহারি যাই তোরে!

গানটি শেষ হওয়ামাত্র কেমন একটা নীরবতা সমগ্র পরিবেশকে ম্লান করে দিল। বেশ কিছুক্ষণ অতুলপ্রসাদ স্তব্ধ, বাক্যহারা!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ একটি মামলার ব্যাপারে এলাহাবাদে গেলেন। মামলার কাজ শেষ করে অমল হোমের অফিসে অপ্রত্যাশিতভাবে হাজির। অমল হোম তখন মতিলাল নেহেরুর 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' কাগজের কাজে এলাহাবাদে। বিপিনচন্দ্র পাল সম্পাদক। রঙ্গ আয়ার আর অমল হোম সহকারী সম্পাদক। উত্তর প্রদেশের মডারেটদের সমালোচনায় পত্রিকাটি তখন রমরমা। 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পুরোপুরি একসট্রিমিজমের ভাবনায় ভরা পালে ছুটছে। অতুলপ্রসাদ মডারেট লিডার—খুব নাম; হঠাৎ একসট্রিমিস্টদের শিবিরে উপস্থিত হওয়ায় সবাই অপ্রস্তুত। সদাহাস্য সুস্মিতবদনে অমল হোমের কাছে এসে বলেন, আজ শনিবার, কাল রবিবার— আমি আজ সন্ধ্যায় মোটরে লখনউ যাব। তুমিও আমার সঙ্গে চল।

অতুলপ্রসাদ এলাহাবাদে ডঃ তেজবাহাদুর সপ্রুর অতিথি। অমল হোম অতুলপ্রসাদকে ফেরাতে পারেন না। রাজী হলেন লখনউ ঘুরে আসতে, সঙ্গে সঙ্গী হলেন 'লীডার' পত্রিকার সম্পাদক সি. ওয়াই. চিন্তামণি। মডারেট আর এক্সট্রিমিস্ট একসঙ্গে অতুলপ্রসাদের সাথে—এ এক অদ্ভুত ব্যাপার! তা' সম্ভব হয়েছে অতুলপ্রসাদ বলেই। অতুলপ্রসাদ মডারেট হলেও তাঁর ঘর ও ভাবনা সর্বদল ও সর্বমতের সম্মিলন স্থল। মানসিক সংকীর্ণতার বহু ঊর্ধ্বে অতুলপ্রসাদ সকলের চিত্তলোকে অজাতশত্রু হয়ে বিরাজ করতেন। ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে নানা

মত ও চিন্তাধারার ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনিয়ত ভারতের রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তিত করছে।

১৯২২ সালে চিত্তরঞ্জন দাশ জেল থেকে মুক্তিলাভ করার পরই কংগ্রেসের অধিবেশন হয় গয়ায়—সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ। ঠিক সেইসময় তুরস্কের কামালপাশা স্বাধীনরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন—এই সংবাদে অনুপ্রাণিত চিত্তরঞ্জন দাশ গয়ার কংগ্রেস অধিবেশনে সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে 'এশিয়াটিক কনফারেন্সের' কথা বলেন—এবং কংগ্রেসকে আইন সভায় প্রবেশের প্রস্তাব করা মাত্র রাজাগোপাল আচারীর নেতৃত্বে গান্ধী-বাদীরা তাঁর বিরোধিতা করেন এবং অহিংস অসহযোগ যথাযথ চালিয়ে যাবার কথা বলেন এবং অধিবেশনে উপস্থিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাধিক্যে তা' পাশ করিয়ে নেন। চিত্তরঞ্জন দাশ পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগ করে চিত্তরঞ্জন কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক অধীনে থেকে 'স্বরাজ্য দল' গঠন করলেন—মতিলাল নেহেরু, বিটলভাই ঝাভেরি প্যাটেল, হাকিম আজমল খাঁ, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, নরসিংহ, চিন্তামণি, কেলকার প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ 'স্বরাজ্য দলে' যোগদান করেন। দু'টি দলের বিরোধিতায় কংগ্রেসের শক্তি ক্ষয় হচ্ছে, তাতে আতঙ্কিত হয়ে উভয় দলের অবস্থানের সুষ্ঠু মীমাংসার জন্য উভয় দলের সম্মতিতে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হ'ল এবং তাতে কংগ্রেস প্রার্থীদের ভাবী আইন সভার নির্বাচনে মাত্র কৌশলে অংশগ্রহণ করতে পারবে। 'স্বরাজ্যদল' বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচনে অংশ গ্রহণের প্রস্তুতি নিল। এদিকে তুরস্কে স্বাধীনরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হওয়াতে খিলাফৎ সমস্যার সমাধান হ'ল। এই সুযোগে কিছু স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি রাজশক্তির প্ররোচনায় 'মহরমের' পুণ্য উৎসবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সামনে এনে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মদত দিল—মুলতানে ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা ভয়াবহ রূপ নিল। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্যদল' তাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া থেকে এতটুকু বিভ্রান্ত হ'ল না। এদিকে 'স্বরাজ্য দল' সুভাষচন্দ্র বসুকে সম্পাদক করে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকা প্রকাশিত ক'রল—যা' নির্বাচনের মুখপত্র হিসাবে কাজ করল। নির্বাচনে স্বরাজ্যদলের ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, নলিনীরঞ্জন সরকার, সুভাষচন্দ্র বসু, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রভৃতি সদস্যগণ জয়লাভ করলেন। এমন কি রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও 'স্বরাজ্যদলে'র ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে পরাজিত হন। কংগ্রেসের অবস্থা খুবই নমনীয়—১৯২৩ সালের ডিসেম্বর মাসে মহম্মদ আলির সভাপতিত্বে কোকনদে কংগ্রেসের অধিবেশন হয় এবং 'স্বরাজ্য দলে'র ভাবনাকে বাধ্য হয়ে গ্রহণ করা হয়। ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের আন্দোলন মন্দীভূত হ'ল। সেই

সুযোগে কোহাটে আবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হ'ল—এই দাঙ্গার প্রভাব নানাভাবে প্রাদেশিক নেতাদের বিচলিত করল। 'স্বরাজ্যদলেও' মত বিরোধ দেখা দিল—কংগ্রেসের মধ্যেও ভাঙ্গন গভীরভাবে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রচণ্ডতম আঘাত হানল। ছড়িয়ে ছিটিয়ে ব্যক্তি, ব্যক্তিত্বের ক্ষোভ, নেতৃত্বের মধ্যে একে অপরের প্রতি বিরোধাত্মক প্রচার সামগ্রিকভাবে দেশের সাধারণ মানুষের ঐক্যবোধকে শিথিল করল। এদিকে সুভাষচন্দ্র বসু আর যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের বিবাদ এবং 'এডভ্যান্স' পত্রিকার প্রকাশ এবং মদনমোহন মালব্যের Indepedent Congress Party গঠন—সব কিছু মিলিয়ে মিলনের বাতাবরণে কালো মেঘ ঘনীভূত—দেশ জুড়ে বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় নানা মহলে হতাশার অপরিচ্ছন্ন মানসিকতা মন-প্রাণকে দুর্বল ও অসহায় করে তুলল। তারই সুযোগে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধকে সদা-জাগ্রত রাখার বিচিত্র ও বিভিন্ন ছল চাতুরীর পথে ইংরেজের রাজনৈতিক শক্তি কাজ করে যাচ্ছে। তারই প্রকোপ সারা ভারতবর্ষে।

লখনউ মিলিত হিন্দু-মুসলমানের একই রক্তে অভিষিক্ত—বর্ধিত তার সংস্কৃতি, তার সামাজিক তথা ধর্মীয় আচার-আচরণ। তাই কেউ বলতে পারেনি লখনউ মুসলমানদের, বলতে পারেনি লখনউ হিন্দুদের। তার উপর দীর্ঘ বৎসর ধরে লখনউ'এর প্রতিটি ধূলিকণায় এক জাতি, এক প্রাণ এই ভারতবর্ষ, এই বার্তা বহন করে অতুলপ্রসাদ সেনের ক্লান্তিহীন পরিক্রমা। তাই তো অতুলপ্রসাদ অচিরেই হয়ে গেলেন 'ভাইদাদা' 'সেন সাহেব'—'এ. পি. সেন'।

সেই লখনউ শহরে মন্দিরে-মসজিদে কোন বিরোধ নেই, নেই কোন বাধা। আমিনাবাদের মন্দির-মসজিদ হিন্দু মুসলমানের মিলিত চেতনার প্রবাহে পুষ্ট। শুধু মন্দির নয়, শুধু মসজিদ নয়, মন্দির-মসজিদের সংস্কার সাধন—অর্থ সাহায্য, পূজা আর নমাজ যেন নিত্যকালের জন্য। কিন্তু এই দুয়ের এক ভাবনায় কেমন যেন বিরোধ এল! অপ্রাসঙ্গিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে কিছু মুসলমানের দাবী এল—মসজিদে নমাজ পড়ার সময় হিন্দুদের মন্দিরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজানো চলবে না। তাতে নমাজ পড়ায় বিঘ্ন ঘটে। কথাটি যখন লখনউতে রটে গেল তখন সবাই উদ্বিগ্ন হলেন—কিন্তু এর বেশী কিছু ভাবলেন না। কারণ লখনউ-এর সংস্কৃতি তা' ভাবতে দেয় না। সে সময় বিচারপতি সমীউল্লা বেগ লখনউতে নিজের বাড়ীতে এসেছেন। তিনি যখন এ'কথা শুনলেন; খুবই আশ্চর্য বোধ করলেন। তিনি মুসলমান সমাজের নেতৃস্থানীয়দের বললেন, তোমাদের দাবী ঠিক দাবী নয়। প্রতিক্ষণে মসজিদের পাশ দিয়ে রাস্তায় দ্রুত ছুটে চলেছে অসংখ্য গাড়ী নানারকম শব্দে হর্ন বাজিয়ে—তাতে যদি মসজিদে নমাজ পড়ায় বিঘ্ন না হয়—হিন্দুদের

মন্দিরের কিছু শব্দে নমাজের বিঘ্ন হবে কেন? সেদিন মুসলমানরা সমীউল্লা বেগের পরামর্শ কানে নিলেন না। তারা হিন্দুদের মন্দিরের শাঁখ-ঘণ্টার শব্দের প্রতিবাদ করলেন এবং ১২ই সেপ্টেম্বর আমিনাবাদ পার্কে একটি সভার আহ্বান করলেন। ঐ দিন পূর্ব ঘোষিত হিন্দুদের ও একটি সভা আমিনাবাদ পার্কে হবার কথা। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় প্রশাসন আমিনাবাদ পার্কে দুটি সভাই নিষিদ্ধ করে দেন। কিন্তু এক পক্ষ প্রশাসনের কথা শুনলেন না। ফলে ঐদিন বিকেলে দাঙ্গা শুরু হ'ল—সে এক ভয়ানক অবস্থা। অপ্রস্তুত জনসাধারণ প্রাণ দিলেন—ছুটে পালালেন, প্রতিরোধ প্রস্তুতির অভাবে সমগ্র লখনউ ভয়ে ও আর্তনাদে কাঁপতে লাগল।

অতুলপ্রসাদ তখন কোর্টে। দাঙ্গার সংবাদ রটে যাওয়ার সাথে সাথে কোর্ট থেকে ছুটে লখনউ'র মধ্যস্থলে—যেখানে দাঙ্গায় উন্মাদ হয়ে উঠেছে কিছু লোক, তাদের মধ্যে একা—অসহায় অবস্থায়-নিরস্ত্র হয়ে সবাইকে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—এই আত্মঘাত এই আত্ম-হনন বন্ধ করতে—রক্তাক্ত শরীরের ফিন্‌কী ছোটা রক্তে অতুলপ্রসাদের সর্বাঙ্গ লাল হয়ে গেছে—বে-ওয়ারিশ দাঙ্গাবাজরা তাঁকে আঘাত করছে—কিল-চড়-ঘুষি থেকে শুরু করে নানাবিধ আয়ুধে ক্লান্ত-অবসন্ন অতুলপ্রসাদকে গতি রুদ্ধ করতে উন্মাদ হয়ে উঠেছে। কিন্তু অতুলপ্রসাদ একা—একান্তভাবে একা; সবার কাছে ছুটে গিয়ে প্রার্থনা জানিয়েছেন দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য। লখনউ-এর নেতৃস্থানীয় উভয় ধর্মের মানুষদের কাছে কাতরভাবে অসহায় মানুষের জন্য প্রাণ ভিক্ষা করেছেন দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে। রাজপুরুষদের কাছে গিয়ে এই আত্মঘাতি দাঙ্গা বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানিয়েছেন।

দাঙ্গা সেদিনই আয়ত্তে এসেছে—কিছু শুভ-ভাবনার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রচেষ্টায়। এ. পি. সেন হাতে জীবন-বাজী রেখে অশান্ত-বুদ্ধিভ্রষ্ট-উন্মাদ দুষ্কৃতকারীদের,—যারা এ. পি. সেনকে চেনে না—জানে না, মধ্যে গিয়ে দাঙ্গা বন্ধ করার দুঃসাহসিক ঘটনা বিদ্যুৎ গতিতে রটে গেল—লখনউ কিছু শুভ-বুদ্ধি সম্পন্ন উভয় সম্প্রদাযের নেতৃ-স্থানীয় মানুষ উপদ্রুত-দাঙ্গা বিধস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে দাঙ্গার উন্মাদনা আয়ত্তে আনলেন।

লখনউ শহরে এই প্রথম ও শেষ হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা। একটা বিরাট জাগরণের বাতাবরণ অতুলপ্রসাদকে কেন্দ্র করে লখনউতে নব জন্মের উন্মেষ ঘটতে শুরু করল। সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদ প্রায় বিপর্যস্ত দেহে ও মনে আঘাতের স্থানগুলিতে ঔষধের প্রলেপে আরামে বিশ্রাম নিচ্ছেন। বাড়ীর বাবুর্চি এবং অন্যরা অতুলপ্রসাদের সর্বাঙ্গ ভালভাবে নানাবিধ ঔষধি গাছের রসে শুশ্রষা করছিলেন।

সেইসময় সৈয়দ আমিমুদ্দিন আমেদ-আবদুল জব্বার—দু'জনেই বাঙালী মুসলমান—সেই দাঙ্গার সময় লখনউতে ছিলেন, তারা অতুলপ্রসাদ সেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। দাঙ্গার দিনই অতুলপ্রসাদের দুঃসাহসিক অভাবনীয় কার্যকলাপে হতবাক্ হয়েছিলেন। সন্ধ্যায় তারা দু'জন অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন—অতুলপ্রসাদ তাঁদের জানতেন। সৈয়দ আমিমুদ্দিন আমেদ হলেন বিবেকানন্দ সকাশে হেমচন্দ্র ঘোষের সঙ্গী। আমিমুদ্দিন আমেদ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করে সরফরাজ হোসেনকে লেখা বিবেকানন্দের একটা চিঠির অংশ উল্লেখে বলেন—

... For our own motherland a junction of the two great systems Hinduism and Islam-Vedanta brain and Islam body— is the only hope. I see in my minds eye the future perfect India rising out of this chaos and strife, glorious and invincible with Vedanta brain and Islam body ...

অতুলপ্রসাদ স্মিতহাস্যে আমিমুদ্দিনকে আরো কাছে আরো একান্তে ডেকে নিলেন—পরে বললেন, ...সারা দেশে গান্ধীজী অহিংসার কথা বলে বলেও দেশের মানুষকে স্বাধীনতার জন্য নিয়োগ করতে পারছেন না। আমার মনে হয় কি জানেন আমেদ ভাই, স্বাধীনতার কথাটা আজ খুব বড় কথা নয়—আগে নিজেদের ভেতরকার পরাধীনতার শেকল ছিঁড়তে না পারলে আমাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ হবে। মহাত্মাজী সহ দেশের বড় বড় নেতা সবাই ইংরেজ তাড়াবার জন্য এক হতে চাইছে, কিন্তু পথ খুঁজে পাচ্ছে না—নানা মত ও পথের বেড়াজালে আরো বেশী বিরোধের ঘনঘটা জাতীয় জীবনে অনিবার্যভাবে ঘনীভূত হচ্ছে। নেতারা যেখানে দেশ মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে এক হতে পারছে না, সেখানে সাধারণ মানুষ ও সম্প্রদায় কী ভাবে এক হবে বুঝতে পারছি না আমিমুদ্দিন ভাই! আমরা এক হবার কথা বলব কি করে। লখনউতে হঠাৎ যে কাণ্ড ঘটে গেল তা আমরা কেউ ভাবতে পারিনি—তবুও হ'ল। বিরোধের আগুন তাড়াতাড়ি জ্বলে ও ছড়িয়ে যায়—তাই ভয় হয় আবার কোথা থেকে সেই ইন্ধন সব কিছুকে ওলটপালোট করে দেয়। আমার কি মনে হয় জানেন, আমাদের নিজেদের ভেতরে জাত-ধর্ম-ভাষা ইত্যাদির যে শেকল দীর্ঘযুগ ধরে আমাদের একটা নির্দিষ্ট বিশ্বাসের নিজস্বতায় বন্দী করে রেখেছে— তা' থেকে মুক্তির ব্যবস্থা প্রথমে করতে হবে। তারপর পরবর্তী পর্যায়ে স্বাধীনতার আস্বাদন। নতুবা, আমার মনে হয়, সব প্রয়াস, সব ত্যাগ-আত্মাহুতি বিফল হবে।

রাত্রি অনেক হয়ে গেছে। ক্লান্ত অতুলপ্রসাদ কিন্তু ক্লান্ত নন। সবাই চলে যাবার

পর অরুণপ্রকাশ এসেছিলেন—বললেন, ও বাড়ী থেকে খবর এসেছে আপনার সংবাদ জানাবার জন্য। অতুলপ্রসাদ চোখ বুজে ছিলেন। আস্তে আস্তে চোখ খুলে বললেন, জানিয়ে দাও, ভাল আছি।

সারা রাত ঘুম নেই। মনের ভেতরটাতে লখনউতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং দেশ ও জাতীর বিপন্নতায় নেতৃত্বের অভাবের বিষয়টি তোলপাড় করছে। হাতের কাছে কাগজ ছিল—রচনা করলেন জাতির উদ্দেশ্যে—

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।
আপন কারায় বন্ধ তোরা,
পরের কারায় বন্দী তাই।
হা রে মূর্খ, হা রে অন্ধ,
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব!
দেশের শক্তি করিস মন্দ—
তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই;

সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই!
তাই মন্দিরে মসজিদে লড়াই।
প্রবেশ ক'রে দেখ্ রে দু ভাই—
অন্দরে যে একজনাই।

দেশমাতার আর বিশ্বমাতার
ম্লেচ্ছ কাফের এক পরিবার।
নয় তুরস্ক, নয়তো তাতার—
জন্ম-মৃত্যু এই যে ঠাঁই।

ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ—
এক জাতি তাই এক শো অংশ।
হিন্দু রে, তুই হবি ধ্বংস
না ঘুচালে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে
শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে
ওরে সেই অছুত ছেলেই তুলে কোলে
তুষ্ট হন যে গঙ্গা-মাঈ।

খাবি নে জল ভাইয়ের দেওয়া?
খাস্ নে অন্ন তাদের ছোঁওয়া?
ওরে শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া
রঘুনাথ তো খেলেন তাই।

তোরাই আবার সভাস্থলে
হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে,
সম-তন্ত্র চাস সকলে—
বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই!

জাতির গলায় জাতের ফাঁস,
ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ,
দাসত্ব ঘোচে না তাই!

ছাড়্ দেখি রে রেষারেষি,
কর্ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।
তখন তোদের সব বিদেশী
দাস না ব'লে বলবে ভাই।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২২ সালে কানপুরে 'বঙ্গ সাহিত্য সমাজে'র বার্ষিক উৎসবে অতুলপ্রসাদ বহির্বঙ্গের বাঙালির আত্মসমর্থন ও আত্মপ্রসারের জন্য বঙ্গসাহিত্যের যে বীজ রোপন করেছিলেন তাহাই কাশীতে গঙ্গার পূত প্রবাহে জাত-শুদ্ধিকরণ করে নূতন নামকরণ হ'ল পরবর্তী এলাহাবাদের অধিবেশনে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন'। প্রয়াগের অধিবেশনে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মূল সভাপতি ছিলেন। অতুলপ্রসাদ যান নি। স্বাস্থ্যের কারণে ডাক্তারের নির্দেশে তখন তিনি উট্‌কামণ্ডের স্বাস্থ্য নিবাসে।

বহির্বঙ্গের বাঙালির মাতৃ-ভাষা ও সাহিত্যের তরণীর কাণ্ডারী হয়ে হাল ধরলেন মাননীয় বিচারপতি লালগোপাল মুখোপাধ্যায়।

১৯২৫ সালে গুড ফ্রাইডে ও ইস্টারের ছুটিতে সুরম্য নগরী লখনউতে 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে'র তৃতীয় অধিবেশন। অতুলপ্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। লখনউ-এর বিশিষ্ট বাঙালিরা একত্রিত হয়ে, 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র

সদস্যদের যুক্ত করে বাঙালির পরম শ্রদ্ধার ও আদরের এই সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করাবার জন্য সকলের সর্ববিধ চেষ্টা। সাহিত্য সভার মূল সভানেত্রী পাঞ্জাব প্রবাসী সরলাদেবী চৌধুরানী। প্রতিনিধিদের প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে অতুলপ্রসাদ অভ্যর্থনা জানিয়ে জানিয়ে সকল আয়োজনে খুবই তৎপর। শরীর অসুস্থ, কিন্তু মাতৃ-আরাধনায় তাঁর এতটুকু ক্লান্তি নেই। প্রবাসী বাঙালিরা আসবেন তাঁর আবাস-নগরীতে—একটা ভয়ার্ত অন্তর খুবই সতর্ক হয়ে রয়েছে ভেতরে ভেতরে। বাড়িতে ঘুমের মধ্যে ও সেই ভাবনা—কি হবে—কতদূর হবে মাতৃ প্রণাম ঠিক মত হবে কিনা? মাঝরাতে টেবিলের কাছে এসে তিনি একটি গান লিখলেন—

ওগো সুখদুঃখের সাথি, সঙ্গী দিন রাতি, সংগীত মোর।
তুমি ভর মরুপ্রান্তর মাঝে শীতল শান্তির লোর।
বন্ধু হীনের তুমি বন্ধু
তাপিত জনের সুধা-সিন্ধু
বিরহ-আঁধারে তুমি ইন্দু
নির্জনজন-চিত্তচোর।
দীনহীন পথচারী
সম্বল হে তুমি তারি;
সম্পদে উৎসবে জনমনোহারী
সর্বতরে প্রেম ক্রোড়।
তব পরশ যবে লাগে
সুপ্তি স্মৃতি কত জাগে
বিস্মৃত কত অনুরাগে
রাঙে হৃদয় ঘনঘোর।
যাহা বাক্য কহিতে নাহি জানে
অন্তরে কহ তাই তানে
মুক্ত কর তুমি, ছিন্ন কর গানে,—
বন্ধন কঠিন কঠোর।
গীতিমুখর তরুডালে
তব দূত অমৃত ঢালে;
পুষ্প দোলে তব তালে,
অম্বরে নাচে চকোর।

ভক্ত কণ্ঠে তুমি ভক্তি
বীর করে নব শক্তি
সুর নর কিন্নর, বিশ্বচরাচর
তব মোহ মন্ত্র-বিভোর।

চার্চ মিশন হাই স্কুলে যেখানে প্রতিনিধিদের সাময়িক গৃহস্থালী, অতুলপ্রসাদ বার বার সেখানে গিয়ে কোথা থেকে কে এসেছেন— ক'জন এসেছেন, শুভেচ্ছা জানিয়ে ছুটছেন আবার অন্যত্র, যেখানে অধিবেশন হবে। অধিবেশন স্থান— গঙ্গাপ্রসাদ মেমোরিয়াল হল।

অতুলপ্রসাদ রচিত উদ্‌বোধন সঙ্গীত

এসো প্রবাসমন্দিরে,
এসো গো বঙ্গভারতী।
দীন প্রবাসী বঙ্গজনের
লহো গো দীন আরতি।

যতনে তুলিয়া প্রবাসফুল
পূজিত তোমার চরণমূল;
আসিবে নূতন ভকতকুল,
করিবে চরণে প্রণতি।

তোমার বীণার মোহন তান
মোহিবে নিখিল-ভারত-প্রাণ,
গৌড়জনের গৌরব মান
লভিবে নবীন শকতি।

সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা,
ওগো বাঙালি হৃদি-রমা
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি মা,
তোমার প্রবাসী সন্ততি।

মঞ্চের উপর অতুলপ্রসাদ, ডঃ রাধাকুমুদ, ডঃ রাধাকমল, অসিত হালদার, ডঃ প্রসন্নকুমার আচার্য, ফনীভূষণ অধিকারী, ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন। মাঝখানে গদিমোড়া কেদারায় সভানেত্রী সরলাদেবী চৌধুরানী।

উদ্‌বোধন সঙ্গীত পরিবেশনের পর শান্ত ও সুমধুর কণ্ঠে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সম্মেলনের কর্ণিক অতুলপ্রসাদ এলোমেলো চাদরখানি যথাযথ সুবিন্যস্ত করে তাঁর সুচিন্তিত অভিভাষণ পাঠ করলেন।

প্রবাসী বন্ধুদের সঙ্গে একাত্ম হওয়ার আনন্দজ্যোতি তাঁর চোখে-মুখে। কণ্ঠস্বর আবেগ ও উৎসাহে ভরপুর।

দীর্ঘ অভিভাষণে অতুলপ্রসাদ 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনে'র নামাকরণ প্রসঙ্গে বলেন,

...প্রবাসী নামটি অপেক্ষাকৃত সুপরিচিত; কিন্তু এ নামটি সম্পূর্ণ নিরাপত্তিতে গ্রহণ করা চলে না; ইহার কারণ প্রধানতঃ এই যে, এদেশে বহু সংখ্যক বাঙালি এমন আছেন যাঁহারা দীর্ঘকাল হইতে এবং বংশপরম্পরায় এখানে স্থায়ীভাবে বাস করিতেছেন; তাঁহাদিগকে ঠিক প্রবাসী বলা চলে কিনা সন্দেহ। তারপর 'প্রবাসী' শব্দ দূরত্বব্যঞ্জক ও আগন্তুকতার পরিচয়, বাঙালি এবং এদেশবাসী সকলেই আমরা ভারতমাতার সন্তান, সুতরাং ভারতে বাস করিয়া নিজেকে 'প্রবাসী' বলা সমীচীন বোধ হয় না। আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী নহি, বরঞ্চ যদি আমরা নিজেকে পরবাসভূমে নিজবাসী বলিয়া মনে করিতে পারি তবেই প্রশস্ততার সমর্থন করা হইবে।...

... সর্বপ্রথমে আমাদের কর্ত্তব্য প্রবাসে বাঙালি বালক-বালিকাদিগের বাঙলা শিক্ষার সুব্যবস্থা করা। যেখানে বহুসংখ্যক বাঙালির বাস সেখানে সুপরিচালিত বাঙলা স্কুল স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক। তাহা ব্যয় সাপেক্ষ সন্দেহ নাই, কিন্তু যদি সকলের নিজের উপার্জ্জনের এক ক্ষুদ্রাংশও এ উদ্দেশ্যে ব্যয় করেন, তবে তথায় অন্ততঃ মেয়েদের একটি পাঠশালা উত্তমরূপে চলিতে পারে।

... আমাদের মনে রাখিতে হবে যে, আমরা দেব ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বংশধর, তারক পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের স্বজাতি। আমাদের নিকট বিদ্যা বিতরণ বিষয়ে দানশীলতার পরম সার্থকতা কেবলমাত্র শাস্ত্রের অনুশাসন নহে, উহা প্রত্যক্ষকৃত সত্য; বাঙালী জাতির মধ্যে এ ব্রতে সিদ্ধ স্বার্থত্যাগী পুরুষের অভাব নেই।...

চলতি সাহিত্য সম্পর্কে...

... অতি অল্পকালের মধ্যে সুলেখক ও সুসাহিত্যিকের সংখ্যা বিশেষ বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে; পাঠক সমাজকে আজকাল অন্য সাহিত্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় না। প্রায় সকল প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয় আমাদের বাঙলা ভাষায় লিখিত হইয়াছে এবং হইতেছে। তবে আমাদের সাহিত্যের পরিমাণের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনাও বাড়িতেছে; সুতরাং প্রবাসী পাঠক সমাজের একটু সাবধান হওয়া আবশ্যক। একপ্রকার নব্য সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেছে। তাহার গতিবিধি আমার নিকট শিব কিম্বা সুন্দর বলিয়া মনে হয় না।... ইহাদের বাক্ আছে অর্থ নাই; পার্বতী আছে পরমেশ্বর নাই।...

একটি পত্রিকার কথা উল্লেখ করে বলেন,

... যদি একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা প্রবাসে নিয়মিতরূপে সম্পাদনা করা যায় তাহা হইলে বহির্বঙ্গীয় বাঙালিগণের মাতৃসাহিত্য সেবার পথে বিশেষ সহায়তা করা হইবে, সাহিত্য প্রেমিকদিগকে মাতৃভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতাদি রচনা করিতে উদ্বুদ্ধ করা হইবে।

... সাহিত্য-প্রেমী বন্ধুগণ, আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবানীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিম্বা উপাসকের অভাব হইবে না; কিন্তু তাঁহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ে ভক্তি চাই; গভীর নিষ্ঠা চাই; প্রচুর ধৈর্য চাই— নতুবা আমাদের সাহিত্য সাধনা নিষ্পল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিম্বা ভাবুকতায় আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কার্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা এ সদগুণ সমূহের সমাবেশ হইলে তবে আমরা সফল হইব।...

বারাণসীর সুরেশ চক্রবর্তী 'প্রবাসজ্যোতি'র প্রকাশ ও প্রচারের জন্য অতুলপ্রসাদের কাছে গিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ প্রবাসে একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে বহির্বঙ্গে একটি সাহিত্য পত্রিকার পুরোপুরি দায়িত্ব তিনি 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের' উপর দিতে চেয়ে অভিভাষণে তার গঠন প্রকৃতির রচনা সন্নিবেশ ইত্যাদির সুন্দর পরিকল্পনা পেশ করেন।

সেইরূপ পত্রিকা প্রকাশের পরিকল্পনা সাহিত্য সম্মিলনের বিষয় নির্বাচনী সভায় সিদ্ধান্ত হয়। প্রকাশিত পত্রিকার নামাকরণও করলেন অতুলপ্রসাদ 'উত্তরা'। তিনিই 'উত্তরা' কার্যকরী সমিতির সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় যুগ্ম সম্পাদক— ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় কোষাধক্ষ।

মূল সভানেত্রী সরলাদেবী—রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা প্রথম মহিলা উপন্যাসিক স্বর্ণকুমারীর কন্যা। মা ও মাতুলের সম্পাদিত ঐতিহ্যবাহী 'ভারতী' পক্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্তা। জাতীয় কংগ্রেসে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্র-সঙ্গীত উদ্‌বোধিত সভার সুর সাধিকা—সমাজ সংস্কারের ভূমিকায় অগ্রবর্তিনী—'বীরাষ্টমী' উৎসবের প্রবর্তিকা-বাঙালির মনীষা ও পাঞ্জাবের বীর্যবত্তায় অসমসাহসিকা এই বঙ্গললনা সরলাদেবী বলেন, প্রবাসে নীড় বাঁধার মুখে এই অতুল সেনরাই আমায় প্রথম সংবর্দ্ধনা করেন, আজ নীড় ভাঙ্গার দিনে এঁরাই আবার স্নেহ দিয়ে ধরলেন।

'উত্তরা' প্রকাশের জন্য অর্থ চাই। বেশীরভাগ অর্থ অতুলপ্রসাদই বিভিন্ন সময়ে—প্রেসের দেনা মেটানো থেকে সব কিছুর জন্য অর্থ দিয়েছেন। পত্রিকাটি যদিও 'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের' মুখপত্র—কিন্তু কার্যত সম্মেলনের

পরিচালকমণ্ডলীর প্রায় সকলেই পত্রিকা প্রকাশের ব্যাপারে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। তাই পত্রিকা প্রকাশের ব্যয়ভারও একাই অতুলপ্রসাদকে বহন করতে হয়েছে।

'প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের' এত বড় অনুষ্ঠান হয়ে গেল—সারা উত্তরপ্রদেশ থেকে উজ্জ্বলনক্ষত্র-বাঙালিদের সমাবেশ অতুলপ্রসাদকে ঘিরে সে এক অভূতপূর্ব ঘটনা—কিন্তু হেমকুসুম তাতে অনুপস্থিত। হেমকুসুম এসব পছন্দ করেন না—অতুলপ্রসাদ তাতে যুক্ত হোক তাও তাঁর ইচ্ছা নয়। তাই অরুণপ্রকাশ হেমকুসুমের এই নীরবতা এবং একাকীত্বের বেড়াজাল ভেঙ্গে বাইরে সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনে যোগদান করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মূল সভানেত্রী সরলাদেবী একবার অতুলপ্রসাদকে অনুরোধ করেছিলেন পত্নী হেমকুসুমের সাথে দেখা করার জন্য। অরুণপ্রকাশ তাতে উৎসাহ দেখান নি। তাই অতুলপ্রসাদও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ নীরবতায় বিষয়টিকে আর বাড়াত দেন নি।

অতুলপ্রসাদের বাড়ীতেই সরলাদেবী ছিলেন। মাতা হেমন্তশশীকে পেয়ে সরলাদেবী অতীতের হারিয়ে যাওয়া যোগসূত্রের রোমাঞ্চকর অধ্যায়ের রোমন্থন করে পুলকিত।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এর কিছুদিন পর হেমকুসুম লখনউ-এর ক্যান্টনমেন্ট রোডের বাড়ী থেকে পুত্র দিলীপকুমারকে নিয়ে দেরাদুনে চলে গেলেন। সেখানেই কিচুদিন থাকবেন মা-ছেলে। অতুলপ্রসাদ নিয়মিত টাকা পাঠাতেন, যেমন পাঠাতেন লখনউতে আলাদা বাড়ীতে হেমকুসুমের জন্য।

সেদিন অতুলপ্রসাদ একা একা পায়চারী করছেন। হেমকুসুমের কথা মনে এল—মনে হ'ল হেমকুসুমও বুঝি পাশে পাশে রয়েছেন—আচম্বিতে পাশে, পেছনে ফিরে ফিরে তাকান। তারপর নিজের মনেই ব্যর্থ হাসিতে বারান্দায় উঠে কেদারায় বসেন। গুন্ গুন্ করে হাতে তাল ঠুকে আশাবরী রাগে গাইলেন,

মুরলী কাঁদে 'রাধে রাধে' ব'লে,
শ্যামসুন্দর, হায়, ভাসে নয়নজলে।
দেখো যমুনা-জলে শূন্য তরী দোলে।
শূন্য ঝোলে ঝুলা নীপতরুতলে।
'রাধে রাধে' ব'লে।
কুঞ্জে নীরব পাখি, পুচ্ছ মেলে না শিখী,
পবন থাকি থাকি দীরঘ নিশাস ফেলে।

এসো গো মানিনী, মাধো-বিমোহিনী,
এসো বিরহিণী, এসো বঁধু গলে—
'শ্যাম শ্যাম' ব'লে।

প্রতিদিনের কোর্ট কাছারীর পর অতুলপ্রসাদ তাঁর বাড়ীর সংলগ্ন রাজপথে মাঝে মধ্যে দাঁড়িয়ে কার জন্য অপেক্ষা করেন উদাস অন্বেষণে। আবার কখনো বা ছুটে যান গোমতীর তীরে পর্ণকুটীরে-বস্তীতে সাধারণ, অতি সাধারণ মানুষের কাছে— অনেকেই যে 'ভাইদাদার' জন্য অপেক্ষা করে থাকেন—টাকা-কম্বল-অন্নের জন্য। এটা তার নিয়মিত কাজ। একদিন ওকালতির কমিশনে অতুলপ্রসাদ গোমতী নদী দিয়ে নৌকায় যাচ্ছেন। মাঠের হৃদয় ভেদ করে এঁকে বেঁকে গোমতী ধারা বয়ে চলেছে—মিষ্টি হাওয়া ক্লান্ত দেহে আমেজ তুলেছে—তারই মধ্যে রবীন্দ্রনাথের কবিতার বইয়ের পাতা উলটাতে উলটাতে হঠাৎ চোখে পড়ল, অল্প বয়সের একটি মেয়ে নদীর ধারে বসে আনমনা। মিষ্টি মৃদু মায়াজড়ানো হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে—আধময়লা ঘাঘরাটাও আন্দোলিত হচ্ছে—মেয়েটি কেমন যেন উদাস— মেয়েটির উদাসভাবে অতুলপ্রসাদের হৃদয়টাও কেমন যেন উদাস হয়ে গেল— লিখলেন, গাইলেন—

কে তুমি বসি নদীকূলে একেলা?
কার লাগি এত উতলা?
কে তরী বাহি আসিবে গাহি?
খেলিবে তার সনে কি খেলা?
সারা বেলা গাঁথ মালা
ঘরের কাজে এ কী হেলা?
ছলনা করি আন' গাগরি
কার লাগি বলো অবেলা!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

খবর এল হেমকুসুম অসুস্থ; দেরাদুনে এক বন্ধুর বাড়ী থেকে ফেরার সময় টাঙ্গায় উঠতে গিয়ে পড়ে যান, পড়ে গিয়ে তাঁর পেলভিস্ বোন্ ভেঙ্গে যায়।

উৎকণ্ঠিত অতুলপ্রসাদ শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন—অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত। এদিকে বাড়ীতে মা হেমন্তশশী অসুস্থ—তাঁর দেখাশোনা,চিকিৎসার ভাবনা। অতুলপ্রসাদ মা'কে খবরটা জানালেন। কাতরকণ্ঠে হেমন্তশশী বলেন, যাও অতুল দেরাদুনে যাও, ওর পাশে থাক। আমার জন্য ভেবো না। এখানে তো বাবুর্চি

খানসামারা আছে, তা'ছাড়া অরুণ, ধূর্জটি তো প্রায়ই আসে। আমার যা'হোক কেটে যাবে। দেরী করা ঠিক হবে না।

এরপর একটু থেমে হেমন্তশশী অতুলপ্রসাদকে উদ্দেশ্য করে পুনরায় বললেন, আমি তো তোর স্ত্রীকে তোর কাছে ফিরে আসার জন্য সুযোগ দিয়েছিলাম—দু'বার তিন বৎসরের জন্য আমি তোর কাছে আসিনি, কিন্তু হেম দু'তিনবার তোর কাছে থেকে ঝগড়া করে বাড়ী ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে, এটা দেখে অনেক চিন্তা করে এবার আমি তোর কাছে এসেছি—বোধহয় এবারই শেষ; তবে তোর ছোট দুটি বোন হিরণ-কিরণ বড় দুঃখী, ছেলেমেয়ে হারিয়ে ওরা নিঃস্ব—তোর হাতে তাদের দিয়ে গেলাম—মা হেমন্তশশীর এই কাতর আবদারে অতুলপ্রসাদের চোখ দুটি ভেসে গেল।

হেমন্তশশী বললেন, অতুল, হেমকে সুস্থ করে এখানে নিয়ে এসো।

অতুলপ্রসাদ দেরাদুনে চলে গেলেন। সেখানে পৌঁছেই হেমকুসুমের শয্যার পাশে বিহ্বল দৃষ্টিতে অতুলপ্রসাদ দাঁড়িয়ে। হেমকুসুমের সমস্ত দেহ-মনে একটা রোমাঞ্চ— এক না জানা ঢেউ চকিতে খেলে গেল, বিশ্বাস করতে পারছেন না—এ কি তাঁরই অতুলপ্রসাদ! কত অপমান, কত দুঃখ দিয়েছি, অকারণে অভিমানে ছেড়ে চলে গেছি—সত্যি আজ আমার পাশে আমার অতুলপ্রসাদ! চোখ দুটো আবৃছা হয়ে গেল।

অতুলপ্রসাদ নিজেকে আরো নিকটে নিয়ে গিয়ে কপালে হাত রেখে বললেন, হাঁ, আমি, আমি তোমার অতুল। তুমি অসুস্থ—বেশী কথা বলা ঠিক নয়।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের অবস্থা দেখে খুবই চিন্তিত হলেন—মনে মনে ভাবলেন, একা একা এখানে রাখা ঠিক হবে না, ভাল চিকিৎসার জন্য লখনউতে হেমকে নিয়ে যাবেন।

কিন্তু হেমকুসুমের শরীরের অবস্থা যা, তাতে লখনউতে যাবার মত অনুকূল নয়। ডাঃ জ্যোতিলালের ইচ্ছা নয়, এ অবস্থায় হেমকুসুমকে স্থানান্তরিত করা। তাই চিকিৎসার জন্য হেমকুসুমকে দেরাদুনেই থাকতে হবে। অতুলপ্রসাদ বেশ বিব্রত হলেন। তার পক্ষে বেশীদিন লখনউ ছেড়ে দেরাদুনে থাকা সম্ভবও নয়। হেমকুসুমের চিকিৎসার বেশী সময় লাগবে।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে সব ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়ে ডাঃ জ্যোতিলালের দায়িত্বে হেমসুকুমকে রেখে লখনউ ফিরে গেলেন।

অতুলপ্রসাদ এখন আউট্রাম রোডে উঠে এসেছেন। মা হেমন্তশশীও অসুস্থ—সারাটা জীবন শোকের সাথে সহবাস করে হেমন্তশশী সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে

গেছেন। প্রতিদিন অসুস্থ শরীরে প্রার্থনায় বসেন। প্রার্থনার মধ্যেও মাঝে মাঝে অতুল, অতুল বলে ডাকেন। হেমন্তশশীর তিন কন্যা—হিরণ-কিরণ বিধবা; সন্তান শোকাতুরা। প্রভার স্বামীও বেকার—চাকরী ক্ষেত্রে গোলমাল। ছেলে মেয়েদের নিয়ে প্রভাকে অতুলপ্রসাদ নিজের কাছে এনেছেন।

মার শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোর্ট থেকে অতুলপ্রসাদ সোজা বাড়ী এসে মা'র কাছে বসেন— মাকে যত্ন করেন, সেবা করেন।

মাঝে মাঝে অরুণপ্রকাশ খোঁজ খবর নেন হেমন্তশশীর। অতুলপ্রসাদ বিষাদ কণ্ঠে বলেন, ভাল নেই, আমার মা আমাকে নিঃস্ব করে চলে যাবেন অরুণ! আমার মা আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে যাচ্ছেন!

সেদিন অরুণপ্রকাশ আসামাত্র অতুলপ্রসাদ তাকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে যেতে যেতে পাশের ঘরের টেবিলের উপর থেকে একটা মোড়কে বাধা বই নিয়ে মা'র ঘরে ঢুকলেন। হেমন্তশশীর তখন জ্ঞান নেই। অতুলপ্রসাদ ধীরে ধীরে অরুণপ্রকাশকে বললেন, মা এখন সংজ্ঞাহীন—**আমার 'কয়েকটি গান'** বইটি ছেপে এইমাত্র এল, তোমাকে সাক্ষী রেখে আমি আমার বইখানা মা'র পাদপদ্মে নিবেদন করছি—এই বলে মা'র পায়ের উপরে কিছু ফুল আর মুদ্রিত 'কয়েকটি গান' শীর্ষক বই রেখে তার উপর উপুড় হয়ে অতুলপ্রসাদ শিশুর মত অঝোরে কাঁদতে লাগলেন—সে এক অনির্বচনীয় করুণ দৃশ্য যেন মর্তলোকে মাতৃ-বন্দনার স্তুতিতে ঘরখানি মন্ত্রমুগ্ধ। কত কথা বলতে চায়, উজাড় করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে ব্যাকুল ঐ মা'র চরণে। মা যে স্নেহময়ী, কল্যানী! সন্তানের জন্য কত যন্ত্রণাই না সহ্য করেছেন আমার মা!

হেমন্তশশী বিধবা হবার পর দ্বিতীয়বার বিবাহের সংবাদে বালক অতুলপ্রসাদের হৃদয় অভিমান-রুদ্র রোষে ছিন্ন ভিন্ন করছিল অনবরত; সেই অতুলপ্রসাদ আজ মনুষ্যত্বের সুউচ্চ শিখরে উঠে সর্বস্ব সেই মা'র চরণে দেবার জন্য ব্যাকুল—কান্নায় কান্নায় মা'র চরণ ধৌত করে দিচ্ছেন।

অবশেষে সকল চেষ্টার ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে মা হেমন্তশশী চলে গেলেন—অতুলপ্রসাদ কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন।

অতুলপ্রসাদ কখনো মা'র অবাধ্য হননি। অসাধারণ মাতৃভক্তি, যার জন্য হেমকুসুমও অতুলপ্রসাদকে আঘাত করতে এতটুকু দেরী করতেন না। মা'র সুখ বিধান ও নির্দেশ পালন করার জন্য অতুলপ্রসাদের চিন্তা তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনে সবচেয়ে বেশী অংশ জুড়ে ছিল। সেই মা'র শ্রাদ্ধবাসরে অতুলপ্রসাদ বালকের মত কাঁদতে কাঁদতে প্রার্থনায় বলেছিলেন—

"বিশ্বজননী! সংসারে পাইয়াছিও অনেক, হারাইয়াছিও অনেক! কিন্তু এবার সকলের চেয়ে অমূল্য সম্পদ হারালাম!—মা। তুমি আমাকে অনেক সুখে বঞ্চিত করিয়াছ কিন্তু একটি পরম সুখে একদিনের জন্যও বঞ্চিত কর নাই, সেটি অপূর্ব মাতৃস্নেহ। আজ তাহা হইতেও বঞ্চিত করিলে। এক এক সময় মনে হয় এখন কি লইয়া থাকিব, কে আমাদের সকলসুখে সুখী ও সকল দুঃখে দুখী হইবে। শৈশব হইতে যৌবনে, যৌবন হইতে প্রৌঢ়াবস্থায়, প্রৌঢ়াবস্থা হইতে প্রায় বার্ধক্যে আসিয়া পড়িলাম, মা'র কাছে চিরকাল শিশু হইয়া রহিলাম। যখন 'মা' বলিয়া ডাকিতাম আর মা যখন 'অতুল' বলিয়া ডাকিতেন তখন ভুলিয়া যাইতাম যে এত বড় হইয়াছি। শৈশবে যেমন স্নেহের শাসন পাইতাম সেদিনও সেই রূপ পাইয়াছি। হায়! আজ তেমন করিয়া শাসন করিবে কে? এই গৃহ রক্ষা করিবে কে? মাতৃহারা হইয়া নিজেকে নিঃসম্বল মনে হইতেছে। বিশ্বজননি! তুমি আমার সহায় হও।"

মা'র শ্রাদ্ধ কাজে অতুল-পুত্র দিলীপকুমার এসেছিল এবং বাবাকে কাছে থেকে সারাক্ষণ সহযোগিতা করেছিল। কয়েকদিন লখনউতে বাবার কাছে কাটিয়ে দিলীপকুমার মা'র কাছে দেরাদুনে চলে গেল।

কলকাতা থেকে সমাজের প্রচারক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় হেমন্তশশীর শ্রাদ্ধকাজে উপস্থিত ছিলেন। রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রায় ১৫০০ রুগ্ণ আতুর ও বিপন্নদের অতুলপ্রসাদ নিজের হাতে পরিবেশন করে খাইয়েছেন।

শ্রাদ্ধবাসরে মাতৃ-প্রণামের সময় অতুলপ্রসাদ মনে মনে সংকল্প করলেন— মা'র নামে লখনউতে একটি সেবাশ্রম এবং শুশ্রূষালয় স্থাপন করাবেন এবং তার জন্য তিনহাজার টাকা দেবেন। সমাজের প্রচারক গুরুদাস বাবুকে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্যে ১৫০০ টাকা দেবেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

মা'র শ্রাদ্ধকাজ সম্পন্ন হবার পর অতুলপ্রসাদ আবার কাজকর্মে নিজেকে যুক্ত করতে লাগলেন—দেহ-মন চায় না—তবুও অতুলপ্রসাদকে কোর্টে যেতে হবে, অর্থ উপার্জন করতে হবে—অনেক প্রত্যাশী মানুষ—দুঃস্থ-অসহায় বিধবা তাঁরই অর্থের জন্য বেঁচে আছে।

এমন এক সন্ধ্যায় কোর্ট থেকে ফিরে অতুলপ্রসাদ খোলা বারান্দায় পায়চারী

করতে করতে রাত্রির নিবিড় স্নিগ্ধ শান্ত পরিবেশে মা'র কথা, স্ত্রী হেমকুসুমের কথা হৃদয়ে চমক্ দিয়ে গেল। নিজেরই মধ্যে ভাবতে ভাবতে এতটা জীবনপথ পেরিয়ে কত ক্ষত, কত অপমান, আবার কত আনন্দ ও স্বাপ্নালু আকাঙ্খার জন্য ব্যাকুলতার বিচিত্র কলরোল এক সাথে ভীড় করে গ্রাস করতে চাইছে। একই সঙ্গে আত্মতৃপ্তির অনাদৃত প্রয়াসে মথিত চেতনা অপর দিকে নিবিড় নৈরাশ্য ও ক্ষমাহীন প্রাণের ব্যর্থ আক্রোশ— সব কিছু জড়িয়ে জড়িয়ে অতুলপ্রসাদকে দেহ-মনে বেশ দাগ রেখে গেছে। তবুও ঘাত প্রতিঘাতের জীবন-বিধ্বস্থতায় মা'র কথা— তাঁর আশিষ চুম্বনের জন্য কাঙ্গালপনার অনিবার্যতা গানের মধ্য দিয়ে রসায়িত হয়ে প্রকাশ করলেন ঃ

আমার মনে ভগন দুয়ারে, সহসা তুমি কে গো, তুমি কে?
নন্দন-আভা-বেষ্টিত, তনু উজল নিজ আলোকে—
তুমি কে গো, তুমি কে?

এ কী প্রেম-প্রতিম অঙ্গ!
এ কী যৌবন-রূপ-রঙ্গ!
এ কী মন্দাকিনী-মন্দ-সলিল-ভঙ্গ!
এ কী সহসা মম জীবন-বন পুষ্পিত
তোমার নয়ন-পলকে!
তুমি কে গো, তুমি কে?

ছিল অশ্রুজলদলীন হৃদয় দুঃখ-তামস গগনে,
আজি প্রাণ মন ইন্দ্রধনু তোমার নয়ন-কিরণে,
আজি প্রাণ মম মত্ত মধুপ লুণ্ঠিত তব চরণে,
মম জীবন মরণ ধরম শরম
সকলি লীন পুলকে।
তুমি কে গো, তুমি কে?

তুমি বিশ্ব করেছ সুন্দর মনে নিভৃত কন্দরে;
মম ক্ষুদ্র তরণী চঞ্চল ক্ষুদ্র জীবন-বন্দরে;
তুমি সহসা উদিত ভাস্কর নীল নিশীথ-অম্বরে;
মম জীবন-গহন-চয়ন-কুসুম
শোভিত তব অলকে।
তুমি কে গো, তুমি কে?

সারাটা জীবন প্রেম-তাপস অতুলপ্রসাদ এই জীবন-গহনের অন্বেষণে ব্যাকুল হয়ে সবার হৃদয় দুয়ারে দাঁড়িয়ে সজল নয়নে জিজ্ঞাসা করছেন—তুমি কে গো, তুমি কে?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

গরমের ছুটি। মা'কে হারিয়ে বিরহ কাতর অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে গেলেন। রবীন্দ্রনাথেরও অনন্ত অবসর—শান্তিনিকেতনের বিদ্যালয়-আশ্রমিকদের ছুটি। 'দিহলি'র নিকটস্থ কলাভবনের দোতলায় প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আর অতুলপ্রসাদ মুখোমুখি বসে গানে গানে হৃদয় তরঙ্গের আলোচনা করতেন—মুগ্ধতার পরিমণ্ডলে উভয়ে আনন্দ-নির্ঝর প্রবাহে পুলকিত হতেন।

রবীন্দ্রনাথ শোনাতেন—

'মনে রয়ে গেল মনে কথা—
... শুধু চোখের জল, প্রাণের ব্যথা।

'মায়ার খেলা'র প্রমদার উক্তি

.. দে লো, সখী, দে পরাইয়ে গলে
সাধের বকুল ফুল হার।

....

শূন্য প্রাণ কাঁদে সদা-প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু, দয়াসিন্ধু
প্রেমবিন্দু কাতরে করো দান

....

হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন-সনে।
এই বাতাসে ফুলের বাসে মুখখানি কার পড়ে মনে?

....

তবু মনে রেখো যদি দুরে যাই চলে
... যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে-যায় নবপ্রেম জালে।

অতুলপ্রসাদের সাম্প্রতিক মানসিকতার ভাবনাকে সতেজ করার জন্য রবীন্দ্রনাথ এ ধরনের অনেকগুলি গান গেয়ে অতুলপ্রসাদের অন্তরলোকে অনিন্দ্য-নন্দিত ভাবের উৎস ধারা উজানে বইয়ে দিলেন।

অতুলপ্রসাদও নীরব হয়ে থাকেন নি। তিনিও অবিরাম হৃদয়-দুয়ার খুলে আত্মহারা হয়ে রবীন্দ্রনাথের চরণ-বিন্দ বিধৌত করলেন।

অতুলপ্রসাদ পর পর গাইলেন—

মুরলী কাঁদে 'রাধে রাধে' বলে
শ্যামসুন্দর, হায়, ভাসে নয়ন জলে।

. . . .

বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখি পাতে
আমিও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে

. . . .

ওগো আমার নবীন সাথী,
ছিলে তুমি কোন্ বিমানে?
আমার সকল হিয়া মুঞ্জরিছে
তোমার ওই করুণ গানে।
জগতের গহন বনে
ছিনু আমি সংগোপনে,
না জানি কী লয়ে মনে
এলে উড়ে আমার পানে।
লয়ে তব মোহন বরন।
আমার শুকনো ডালে রাখালে চরণ;
আজ আমার জীবন-মরণ
কোথা আছে কে বা জানে।
ঝ'রে গেছে সকল আশা,
ফোটে না আর ভালোবাসা,
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
আমার প্রাণে কোন্ পরাণে?

অতুলপ্রসাদ গানটি গাইতে গাইতে মন-প্রাণের অজস্র ব্যাকুলতায় ধ্যানস্থ হয়ে কবির কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। বারবার গাইলেন—

... ঝরে গেছে সকল আশা
ফোটে না আর ভালোবাসা
আজ তুমি বাঁধলে বাসা
আমার প্রাণে কোন্ পরাণে?
...

অবশেষে শেষ করলেন সকল যন্ত্রণা-বেদনা-ক্ষোভের পরম শক্তি সঞ্চয়ে—

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির—নাহি ভয়।
ভুলি ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান
সাথে আছে ভগবান-হবে জয়।...

প্রত্যক্ষ ভগবানের সামনে, ক্ষমা-সুন্দর শুচি-স্নিগ্ধ হৃদয়-সম্রাটের চরণে প্রণতির এই লগ্নকে পরিপূর্ণ করে অতুলপ্রসাদ প্রাণের আরাম, মনের শান্তি, হৃদয়ের একান্ত আপন ও গোপন ব্যাকুলতায় সদ্য তপোস্নাত এক অনির্বচনীয় অনুভবে পুলকিত। কোন অভিযোগ নেই, দুঃখ-বেদনার আত্মকেন্দ্রিক ক্ষোভ নেই; অন্তহীন প্রতীক্ষায় অতন্দ্র অনুভব-রসে অতুলপ্রসাদ দয়িতের জন্য তপস্যায় নিমগ্ন। আজ আর বিষাদ নয়—আজ আনন্দবিরহেও, আনন্দ।

আশ্রমে ছুটি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের মিলন মুহূর্তের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল শান্তিনিকেতনের গাছে গাছে পাতায় পাতায়, নাচন জাগিয়ে মুখর হল ধরণীতল। শান্তিনিকেতনে ক'দিন থেকে কলকাতায় ফিরে শিশিরকুমার দত্তের সাথে অতুলপ্রসাদ সিমলায় গেলেন। সিমলায় অতুলপ্রসাদ মাতৃবিয়োগের বেদনাকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিলেন অনন্ত আকাশের-পাহাড়ের প্রতিটি শিলায়। শতদ্রু-নদীর উৎস মুখ ভোজ্যিতেও অতুলপ্রসাদ সস্ত্রীক বন্ধু শিশিরকুমার সহ গেলেন। সে এক রমনীয় অভিজ্ঞতা—পাহাড়-ঝর্ণা-পাখির কলরব—দেবদারু গাছের সমাবেশ সব কিছু মিলে অতুলপ্রসাদ গানে গানে রসময় হয়ে উঠলেন। অনেক গান লিখলেন-গাইলেন।

সন্ধ্যাতারা জ্বলিছে গগনে
আয় আয় চাঁদিয়া!
আনো গো সজনী, মধুর রজনী
সোনার তরণী বাহিয়া।
তাপিত আমি তপ্ত তপনে;
সুপ্তিসংগীত গেয়ে যা গোপনে।
কনক শ্রাবণে এ মরু-জীবনে
ঢেলে দে স্বপন-অমিয়া।
আকাশ ভাষায়ে মধুর গানে
পাখিরা উড়ে যায় সুদুর বনে।
আমার আশাগুলি উড়িছে দিশা ভুলি—
গোধুলি এল, আয় নামিয়া।

এমনি অনেক গান গেয়ে অতুলপ্রসাদ হৃদয়কে যেন হালকা করতে পেরেছেন। এমনি একদিন সস্ত্রীক শিশিরকুমারের অনুরোধে গাইলেন সেই আত্ম-সমর্পণের বেদনা-সিক্ত আকুতি ঃ

কি আর চাহিব বলো, হে মোর প্রিয়,
তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
বলিব না রেখো সুখে, চাহ যদি রেখো দুখে,
তুমি যাহা ভালো বোঝ তাই করিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
যে পথে চালাবে নিজে, চলিব, চাব না পিছে
আমার ভাবনা প্রিয়, তুমি ভাবিয়ো।
শুধু তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।
দেখো সকলে আনিল মালা-ভকতি-চন্দন-থালা
আমার যে শূন্য ডালা, তুমি ভরিয়ো
আর তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো।

ক্ষণিকের মধ্যে সমস্ত পরিবেশ কেমন যেন ভিজে গেল। আর্ত-বেদনার হাহাকারে এমন সাবলীল আত্মসমর্পণ শিশিরকুমার ও স্ত্রী কুমুদিনীকে বেশ অন্য লোকে নিক্ষেপ করল।

সিমলার পাহাড়ে একা একা ঘুরে ঘুরে অতুলপ্রসাদ বহুদূরে দলছাড়া হয়ে যেতেন। যদিও বন্ধু-পত্নী কুমুদিনী ভাইদাদাকে সঙ্গে খাবার দিয়ে দিতেন। এমনি একদিন অতুলপ্রসাদ চলতে চলতে পাহাড়ের কোলঘেষে আড়ালে এক রূগ্ণ দুঃস্থ বৃদ্ধাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গেলেন তার আছে। দুঃস্থা প্রথমে কিছুটা ভয় পেয়েছিলেন। তারপর অতুলপ্রসাদের মায়াভরা চোখদুটিতে বাঁধভাঙ্গা করুণার প্রবাহ দেখে আশ্বস্ত হলেন। অতুলপ্রসাদ সঙ্গে আনা খাবার পরম শ্রদ্ধায় ও আন্তরিকতায় যত্ন সহকারে ধীরে ধীরে কাছে বসিয়ে বৃদ্ধাকে খাওয়ালেন। নিজের হাতে বৃদ্ধাকে ধরে আদর করতে করতে অতুলপ্রসাদের চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল। নিজেকে সেখানে বেশীক্ষণ রাখতে পারলেন না—যাবার সময় বৃদ্ধার শীর্ণহাতে এক মুঠো টাকা গুঁজে দিয়ে দ্রুত বেগে সেখান থেকে অতুলপ্রসাদ লোকালয়ে ভালমানুষের মত মিশে গেলেন আর দশজনের মধ্যে।

সিমলায় থাকাকালীন অতুলপ্রসাদ সত্যদাদাকে এবং কাশীতে সুরশে চক্রবর্তীকে পত্র দিয়েছিলেন। সুরেশবাবুর নিকট যে পত্র দিয়েছিলেন সেখানে প্রস্তাবিত এবং স্থিরীকৃত মাসিকপত্র 'উত্তরা' প্রকাশের বিষয়ে সুরেশ চক্রবর্তীর পত্রের উত্তরে লিখেছেন। সেই পত্রে 'উত্তরা' সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ পরামর্শ দিচ্ছেন ঃ

আপাতত এলাহাবাদের Indian Press থেকে 'উত্তরা' প্রকাশ করা— পরবর্তী সময়ে লখনউতে বাংলা প্রেস থাকলে সেখান থেকে ছাপার ব্যবস্থা করা; সম্পাদকীয় দপ্তর লখনউতেই থাকা সঙ্গত। আগামী ১ লা আশ্বিন মহালয়ার দিন যাতে 'উত্তরা' প্রকাশিত হয় তার ব্যবস্থা করা। বাঙলাদেশের কাগজে 'উত্তরা' প্রকাশের বিজ্ঞাপন দেওয়া। লখনউতে ফিরে শিল্পী অসিতকুমার হালদারকে দিয়ে 'উত্তরা'য় প্রচ্ছদ তৈরী করা এবং রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাদ-বাণী সংগ্রহ করা 'উত্তরা'র প্রকাশ সংখ্যায় পত্রস্থ করা।

১৯২৫, জুলাই মাসেই অতুলপ্রসাদ সিমলা থেকে লখনউ ফিরে এলেন। আবার সেই কোর্ট কাছারী—মক্কেলের ভীড়—সাথে সাথে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভা—দরিদ্রদের জন্য সেবাশ্রম—হরিজন পল্লীতে প্রতিদিন যাওয়া, খোঁজ খবর নেওয়া—গোমতী তীরে ভাঙ্গা বস্তির সংস্কার—'উত্তরা' প্রকাশের জন্য চিন্তা ভাবনা—সব যেন একই সঙ্গে দীর্ঘ অবকাশ যাপনের মাশুল হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু অতুলপ্রসাদ ক্লান্ত হয়েও কোন কাজ থেকে সরে আসতেন না।

লখনউতে আসার পর থেকেই মা'র নামে শুশ্রূষালয় স্থাপনের বিষয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলেন।

এদিকে দেরাদুন থেকে খবর এসেছে হেমকুসুমের অবস্থার উন্নতি হয়নি। তাঁকে লখনউতে নিজের কাছে আনা যায় কিনা—এই ভাবনা, তার উপর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মামলার বিষয়ে গভীরভাবে যুক্ত হওয়া—সবকিছু একত্রিত হয়ে অতুলপ্রসাদের চিত্তকে নানাবিধ টানাপোড়েনে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

হেমকুসুম ক্লান্ত—নিঃস্তরঙ্গ নিঃসঙ্গতায় ভয়ার্ত মন থেকে থেকে কাকে যেন খুঁজছে— কার বাহু স্পর্শের কাতর আকাঙ্খায় অন্তরের মধ্যে গুম্‌রে উঠছে—বলার ভাষাও যেন আটকে আসছে—কিন্তু সমগ্র চেতনায় যার প্রতীক্ষা বার বার কামনা করছে সেই প্রিয়, সেই একান্ত নির্ভর ক্ষমা-সুন্দর, সবার চেয়ে আপন. সব থেকে আলাদা একান্ত গোপন, আপন-জন তাঁকে কাছে পেতে তাঁর সমস্ত চেতনা উৎসুক! তাই হেমকুসুম দিলীপকুমারকে পাঠালেন লখনউতে—আর নয়, আর একা একা নিজেকে নিঃশেষ করতে পারছি না—আমাকে তুলে ধরো—আমার অহংকার আমাকে পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ করেছে—এবার আমাকে, তোমাতে লও—লখনউতে আমাকে নিয়ে যাও!—

ডাক্তার জ্যোতিলালও খবর পাঠিয়েছেন—মিসেস সেনকে লখনউ নিয়ে গিয়ে কয়েকমাস ভালভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে।

অতুলপ্রসাদ পুত্র দিলীপকুমারের কাছে হেমকুসুমের লখনউ আসার খবরে পুলকিত—আকাশ ছোঁয়া আনন্দ ধমনীতে তোলপাড়। মুহূর্তের মধ্যে সব অভিমান সব কান্না যেন আনন্দে মাতোয়ারা করে গেয়ে উঠল—

আমার আঙিনায় আজি পাখি গাহিল এ কী গান?
শুনি নি এমন গাওয়া— হেন মরমভেদী বাণ।
যে করেছে অবহেলা আমার গানের মালা,
আজি কি পাখির গলায় তার গলার প্রতিদান?
যে দিয়েছে এত ব্যথা, মনে হয় এ তারি কথা;
বুঝি গো ভিজেছে আজি তার নিঠুর দু-নয়ান।
বল্ রে অজানা পাখি, তুই তার দূত নাকি?
এত দিনে ভাঙিল কি তার গভীর অভিমান?
মোর প্রাণের গানটি শিখি বনে যা তুই বনের পাখি
বুঝায়ে কহিস তাহারে, আমি তার লাগিয়া ধরি প্রাণ।

দিলীপকুমারকে দুটো হাতে জড়িয়ে ধরে অতুলপ্রসাদ আবেগভরা কণ্ঠে বললেন, যাও, ...দেরাদুনে গিয়ে তোমার মা'কে নিয়ে এস। দরকার হয় ট্রেনে বিশেষ কামরায় বিশেষ ক্লাসে নিয়ে এস। আমার পক্ষে এখন যাওয়া সম্ভব নয়—মক্কেলের অনেক কাজে আগে থেকে আবদ্ধ হয়ে আছি। দিলীপ, খুব সাবধানে মা'কে ট্রেনে তুলবে—আমি এখানে স্টেশনে থাকব।

অতুলপ্রসাদ তৃপ্তির হাসিতে বললেন, আমার হেম, অনেকদিন পর আবার তারই ঘরে আসবে!

দিলীপকুমার চলে গেল।

অতুলপ্রসাদ ছোট বোন প্রভাকে ডেকে হেমকুসুমের লখনউতে এ বাড়ীতে আসার খবর দিলেন এবং বললেন, একজন পরিচারিকা রাখতে হবে—হেমের জন্য—শরীর সারেনি—তাই যত্ন নিতে হবে, চিকিৎসা করাতে হবে। আবেগজড়িত অনুরাগে উৎকণ্ঠিত কণ্ঠে দ্রুত কথাগুলি বললেন।

তা কেন? আমি তো এখানে রয়েছি—আমি বৌদির দেখাশোনা করব— তুমি ভেবো না দাদা—আমি থাকতে কোন অসুবিধা হবে না—প্রভাও গভীর মমতার স্বরে কথাগুলি বলল।

বলচিস, তোর একার পক্ষে কি এতটা সম্ভব হবে—অতুলপ্রসাদ যেন একটা

স্বস্তির আবেগে বললেন। তারপর নিজে বারান্দায় আরামকেদারায় বসে দোল খেতে খেতে গাইছেন,

এবার আসিলে তুমি সুন্দর বেশে,
পরাণ কাঁপিছে তাই ত্রাসে হরষে।
এলে না কাজল ঝড়ে
অশনি-বাহন-পরে;
আসিলে কুসুম-রথে মধুর হেসে—
সুন্দর বেশে।
পরিলে কি ছদ্ম সাজ?
কুসুমে লুকালে বাজ?
হাসিতে কি নাহি বাঁশি?
কাঁদাতে কি এলে হেসে?
মনেতে ভাবি আবার
তূণে শর নাহি আর;
মুছাতে আঁখি-আসার এলে তাই অবশেষে—
সুন্দর বেশে।

প্রভা আয়েঙ্গার ও স্বামী শেষাদ্রি আয়েঙ্গার ও তাদের ছেলেমেয়েরা অতুলপ্রসাদের গাওয়া গান বেশ উপভোগ করছিল। শেষাদ্রি কাছে এসে—হেমকুসুম কবে আসছেন ইত্যাদি সংবাদ নিলেন এবং অতুলপ্রসাদকে ভরসা দিলেন— এখানে হেমকুসুমের যত্ন ও চিকিৎসার কোন ত্রুটি হবে না।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সংসার—অতুলপ্রসাদের সান্নিধ্য—সেই লখনউ কত শত স্বপ্ন, কত আকাঙ্খা প্রতিদিন কাট্‌ছাট্‌ করে জমে জমে ফেলে আসা জীবনের উপর প্রাচীর তুলে হেমকুসুম আবার নোতুন করে নবীন উদ্যমে সংসারি হতে চান। শরীরটা যদিও প্রতিকূল কিন্তু মনের সজীবতায় এখনও হেমসুকুম স্বামী-পুত্রকে একান্তভাবে সব কিছু থেকে আপন বক্ষে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে থাকতে চায়—তার জন্য সব আছে; কিন্তু কোথায় যেন একটা বিরাট কিন্তু কিন্তু ভাব! একটা অন্তর্লীন অদৃশ্য তাড়নায় হেমকুসুম ছট্‌ফট্‌ করে নিজেকে কোন কিছুর স'থে মেলাতে পারছে না— যুদ্ধ করছে অনবরত, সংসারের জন্য—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের জন্য—নিজের খেয়াল খুশিতে প্রতিবাদহীন দুর্বার অভিলাষ—তা সত্ত্বেও হেমকুসুম সব কিছু পেয়ে সব হারিয়েছে।

অনুশোচনা আর অনুতাপের আগুনে পুড়ে পুড়ে নিজেকে আবার স্বাভাবিক মমতায় পরিচ্ছন্ন ও শুদ্ধ করে মাথা উন্নত করে দাঁড়িয়ে বলতে চায়— ওগো, তুমি যে আমার—আমার সব তুমিই। আমার হাত ধরে তুলে লও, তোমার সান্নিধ্যের সুখ-আনন্দ পেতে দাও!

লখনউ থেকে ফিরে দিলীপকুমার দেরাদুনে মা'কে সব জানাল। হেমকুসুমের চলার শক্তি নেই তবুও উজ্জ্বল আবেগে পুত্রকে বুকে টেনে নিয়ে চোখের বাঁধ ভাঙ্গা বন্যায় ভেসে গেলেন।

যথাবিহিতভাবে অতি সাবধানে ডাঃ জ্যোতিলালের সহযোগিতায় দিলীপকুমার মা'কে লখনউ নিয়ে এলেন। স্টেশনে ধূর্জটিপ্রসাদ, পাহাড়ী সান্যাল, অরুণপ্রকাশ এবং বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত,—এদের নিয়ে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। সবাই আশ্বস্ত হলেন—সেন মশায়ের অশান্তির দিন বোধ হয় শেষ হতে চলল। আউট্রাম রোডের বাড়ী আবার আলোময় হয়ে উঠল—কিন্তু হেমকুসুমের অসুস্থতাবশত সন্ধ্যার আসর বন্ধ।

প্রভা অতি যত্নে হেমকুসুমের পরিচর্যা করছে। এমনি এক সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদের কাছে হেমকুসুম একটি গান শুনতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতুলপ্রসাদ স্থির নয়নে হেমকুসুমের চোখে চোখ রেখে সুরের বাঁধন খুলে দিয়ে গাইলেন,

আজ আমার শূন্য ঘরে আসিল সুন্দর'
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার সোনার বঁধু এল আপন ঘর,
ওগো অনেক দিনের পর।
আজ আমার নাই কিছু কালো,
পেয়ে আজ উজল মণি সব হল আলো।
আজ আমার নাইকো কেহ পর,
সুখীরে করেছি সখা, দুঃখীরে দোসর—
অনেক দিনের পর।
মনে পড়িল তা কি—
এতদিন যে দুয়ার খুলে ছিনু একাকী।
বুঝি ভিজিল আঁখি।
আর ছেড়ে যেয়ো না বঁধু জন্মজন্মান্তর,
ওগো আমার সুন্দর।

অন্তর উৎসারিত আনন্দের স্নিগ্ধতা উভয়ের হৃদয়কে পুলকিত করল—

হেমকুসুম নীরব—মুগ্ধতার পরিচ্ছন্নতায় বিহ্বল কিন্তু কিছুটা সংকুচিত। অতুলপ্রসাদ আবেগ জড়িত তৃপ্তির নিবিড়তায় প্রশান্ত।

লখনউ-এর বড় বড় ডাক্তার প্রায় প্রতিদিন হেমকুসুমের চিকিৎসায় আসতেন। অভিজ্ঞ নার্সরাও এসে তদারকি করতেন ও প্রভাকে সহযোগিতা করতেন এবং বিভিন্নভাবে সেবা ও শুশ্রূষার নিয়মনীতি জানিয়ে যেতেন। এ'ভাবে তিন-চারমাস কেটে গেল। ভাঙা হাড় সেবা শুশ্রূষায় কিছুটা সেরেছে। কিছুটা স্বস্তির আরাম অতুলপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। উপর্যুপরি পরিশ্রমে অতুলপ্রসাদও অসুস্থ হয়ে গেলেন। তবে মানসিক শক্তি এত বেশী যে অসুস্থতার অনিবার্যতাকে তেমন আমল দিলেন না।

এদিকে হেমকুসুমের মানসিক অসুস্থতা পূর্বের মত হঠাৎ শুরু হল। হেমকুসুমের অসুস্থতাবশতঃ সংসারের সব দায়িত্ব অতুলপ্রসাদ তাঁর ছোট বোন প্রভার উপর দিয়েছিলেন—তার ফলে অতুলপ্রসাদ নিশ্চিন্তভাবে দৈনন্দিন জীবন ও আদালতের কাজ ভালভাবে করতে পেরেছিলেন। এটা হেমকুসুম খুব একটা পছন্দ করতেন না। তবে মুখে এতদিন কিছু বলেন নি—

পুত্র দিলীপকুমার মা'কে লখনউতে পৌঁছে দিয়ে তাঁর শিক্ষালয় নৈনীতে চলে গেলেন। হেমকুসুম অতুলপ্রসাদকে বলে বসলেন, দিলীপের কাছে নৈনীতে একটা ভাল বেয়ারাকে পাঠাতে হবে এবং চেয়ে বসলেন অতুলপ্রসাদের খাস বেয়ারাকে পাঠিয়ে দিতে। অতুলপ্রসাদের খাস বেয়ারা আদালতের প্রস্তুতির জন্য সমস্ত বিধিব্যবস্থা করে দেয়। তাকে নৈনীতে দিলীপকুমারের কাছে পাঠাতে অতুলপ্রসাদ রাজী নন। তাতে হেমকুসুম আত্ম-অহংকারের জ্বালা তীব্র হয়ে উঠল এবং গভীরভাবে ব্যক্তিত্ববোধের উপর আঘাত হানল। চোখ-মুখ হঠাৎ পাংশুবর্ণে ঝড়ের সংকেত নিয়ে এল। কিন্তু অতুলপ্রসাদ খাস বেয়ারাকে না পাঠিয়ে অন্য বেয়ারাকে নৈনীতে পাঠিয়ে দিলেন।

এমনি অবস্থায় সংসারে একটা অসন্তোষের তুষাগ্নি জ্বলছিল। স্বাভাবিকভাবে হেমকুসুম শারীরিক দিক থেকে সুস্থ হচ্ছিলেন। মন-মেজাজও মাঝে মাঝে প্রসন্ন থাকত। হাঁটতে তেমন পারতেন না—হুইল চেয়ারে বসে ঘরের বিভিন্ন জায়গায় এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ঘুরে বেড়াতেন। এমনিভাবে হুইল চেয়ারে বসে নিজের ঘর থেকে চেয়ার ঘুরিয়ে একেবারে সামনের ঘরে ঢুকলেন—সে ঘরে হেমন্তশশীর বড় একখানা সুন্দর তৈল-চিত্র দেয়ালে ঝুলানো ছিল, সেটি দেখে হেমকুসুম চিৎকার করে কঠিন সুরে বলে উঠলেন, She is still here to guard my house?...—বলেই চেয়ার ঘুরিয়ে রাগে উত্তপ্ত হয়ে দ্রুত নিজের ঘরে চলে

গেলেন। কিছুক্ষণ পরে হেমকুসুমের পিত্রালয়ের এক বর্ষীয়সী আত্মীয়া অতুলপ্রসাদের কাছে এসে তীব্রস্বরে বললেন, ঐ ফটোটা এখান থেকে সরিয়ে ফেলুন!

অতুলপ্রসাদও ক্ষোভে ও ক্রোধে সমস্বরে বললেন, না, কিছুতেই তা' হবে না—আমার স্বর্গতা মায়ের ফটো সরিয়ে আমি আমার মা'কে অপমান করতে পারব না। ফটো এখানেই থাকবে, আমার মা, আমার মা!

হেমকুসুমও দ্রুত হুইলচেয়ারে বসে ছুটে এলেন এবং অপ্রাসঙ্গিক কুবাক্য প্রয়োগ করে ফটোটি সরিয়ে ফেলার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে লাগলেন।

অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের কথার কোন উত্তর না দিয়ে পূর্ব নির্ধারিত লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসমিতির সভায় উপস্থিত হবার জন্য চলে গেলেন।

হেমকুসুম ক্রোধ সংবরণ করতে পারলেন না। তিনি বাড়ী ছেড়ে ঐদিনই সেই বর্ষীয়সী আত্মীয়াকে সঙ্গে করে তাঁর এক আত্মীয়ার বাড়ী চলে গেলেন—সেখানে ৩/৪ দিন থাকার পর ভিন্ন একটি বাড়ী ভাড়া করে একটি নার্সকে নিয়ে থাকতে লাগলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভার শেষে অতুলপ্রসাদ অবসাদগ্রস্ত মনে শ্লথ দেহে বাড়ী এলেন। প্রভা ছুটে এসে দাদার ক্লান্ত অবসন্ন চেতনায় মমতার পরশ দিলেন। কাছে এসে হাত-পা দু'হাতে বুলিয়ে বুলিয়ে আস্তে আস্তে বলল—বৌদি চলে গেছেন—কী যে হল! তুমি এখন ক'দিন বিশ্রাম নাও—বেশী কাজে জড়িয়ে থেকো না।

অতুলপ্রসাদ ছোটবোন প্রভার দিকে নরম চোখে চেয়ে রইলেন—চোখের কোণে জল ভরা মেঘের আনাগোনা—কিন্তু বর্ষিত হ'ল না। মৃদু হেসে শুধু বললেন—পা'টা সেরেছে কিন্তু মনের ব্যাধি একই আছে। যাক্ কী আর করার আছে। একটু চুপ থেকে পরক্ষণেই বললেন—সামনে সঙ্গীত সম্মেলনের আয়োজনে মেতে থাকব।

রাত্রিতে সামান্য আহার সেরে অতুলপ্রসাদ আবার নিজেকে স্বাভাবিক করে নিলেন। বিষাদ তাঁকে কোনভাবেই অবসিত করতে পারত না। যত দুঃখ আসুক, যত অবজ্ঞা আসুক, অতুলপ্রসাদ আপন চিত্তলোকের সংকীর্ণতার গুহা থেকে বেরিয়ে বৃহৎ-উদার মানবলোকে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। হেমকুসুমের ব্যবহার অতুলপ্রসাদের অন্তর্জীবনের কাছে খুবই বেদনার কিন্তু সে বেদনা অতুলপ্রসাদের কাছে একান্ত আপন, একান্ত গোপন। লালিত বেদনায় তিনি উদাসীন হন নি; তাই যতই দুঃখ পেয়েছেন অতুলপ্রসাদ দুঃখের অন্ধকার কারাগার থেকে বেরিয়ে

মানুষের জীবনে, সংসারের বিচিত্র কোলাহলে মেতে উঠেছেন। মানুষের পরশ, মমতার আবেশে মুগ্ধ হবার কাঙালপনা অতুলপ্রসাদকে ঘর ছাড়া করেছে, জগৎ সংসারের সকলের দুঃখকে বরণ করে। সেই রাত্রিতেই অতুলপ্রসাদ লিখলেন,

যদি তোর হৃদ্ যমুনা হল রে উছল, রে ভোলা।
আজি তুই এ কূল ও কূল ভাসিয়ে দিয়ে চল্, রে ভোলা।
আজি তুই ভরা প্রাণে ছুটে যা নৃত্যে গানে;
যে আসে প্রেম-প্লাবনে ভরিয়ে দিয়ে চল্ রে ভোলা।
যে আসে মনের দুখে, যে আসে ফুল্লমুখে,
টেনে নে সবায় বুকে, তোর থাক-না চোখে জল, রে ভোলা।
দু'ধারে ফুল কুড়িয়ে চলে যা মন জুড়িয়ে;
মালা তোর হলে বিফল করবি কী তুই বল্, রে ভোলা।
মিছে তোর সুখের ডালি, মিছে তোর দুখের কালি;
দু-দিনের কান্না-হাসি, ছল ছল ছল, রে ভোলা।
জীবনের হাটে আসি বাজা তুই বাজা বাঁশি,
থাক্ না সেথা বেচাকেনার দারুণ কোলাহল, রে ভোলা।
অরুপের রূপের খেলা চুপ করে তুই দেখ্ দু-বেলা;
কাছে তোর এলে কুরূপ, তুই মুখ ফিরিয়ে চল্ রে ভোলা।

গানটির প্রতিটি লাইন রচনা করে নিজেই তা' গেয়ে গেয়ে বেদনার জড়তাকে শূন্যে মিশিয়ে দিলেন। রাত্রিতেই রায়রাজেশ্বর বলি অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে এলেন আসন্ন সঙ্গীত সম্মেলনের বিষয়ে আলোচনার জন্য। সঙ্গে ছিলেন নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক উমানাথ বলি। অতুলপ্রসাদ অভ্যর্থনা সমিতির সদস্য—কিন্তু সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের মধ্যে বরণীয় একজন। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সেরে মান্য অতিথিরা চলে গেলেন।

অতুলপ্রসাদের অন্তর্জীবনে আজই যে বেদনার ছায়া আচ্ছন্ন করে তাঁকে বেদনাতুর করেছে—তার সংবাদ তাঁর বন্ধু মহলে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল। তাই আসন্ন সঙ্গীত সম্মেলনের অতুলপ্রসাদের সদ্য আঘাতপ্রাপ্ত ভারাক্রান্ত মনকে সহজ ও গতিবহ করার জন্য সংগীতানুরাগী বন্ধুরা তাঁর কাছে এসে অবস্থাকে আয়ত্তে আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাদের কোন প্রয়াসের প্রয়োজনই হয়নি। বেদনাতুর অতুলপ্রসাদ নিজেই হলাহল পান করে প্রাণকে সর্বময় করে তুলেছেন।

পরদিন থেকে শুরু হ'ল প্রথম নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনের সার্থক রূপায়ণ। অতুলপ্রসাদ সঙ্গীত পাগল। তাই তাঁর উপস্থিতি খুবই অনুপ্রেরণাদ্যোপক।

ভারতের বিভিন্ন স্থানের গায়ক-বাদকরা আপন আপন ঐশ্বর্য উজাড় করে দেবার আগ্রহে ব্যাকুল। কেশরবাগে বারদুয়ারীতে আসর বসল—এলেন ফৈয়াজ খাঁ, আলবন্দে খাঁ, নসির খাঁ, চন্দন চৌবে, আলাউদ্দিন, ফিদা হুসেন, এনায়েৎ খাঁ, বীরু মিশ্র, হাফিজ আলি, মোরাদ খাঁ, রাধিকামোহন গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাতখন্ডেজী এবং শিষ্য শ্রীকৃষ্ণরতনজানকার। অতুলপ্রসাদ দোপল্লী টোপী ও আঙ্গার খাঁ, চুড়িদার পরে সম্মেলনে উপস্থিত। অনেক নবাব-রাজা-তালুকদাররা মরফিলএ পোশাক পরিধান করে উপস্থিত ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ আর অতুলপ্রসাদ দু'জন মশ্‌গুল হয়ে সারাক্ষণ সেই সম্মেলনে। তানের পর তান—অবিরাম তানের নূতন অভিযান, নাভীদেশের গভীর অন্তঃস্থল হতে উত্থিত গমক সিংহ নিনাদে অনির্বচনীয় মুগ্ধতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল। ধন্য ধন্য পড়ে গেল সর্বত্র—দিন রাত অতুলপ্রসাদ সঙ্গীত সম্মেলনে, আদালত-মক্কেল কিছুই তাঁকে আকর্ষণ করতে পারল না।

এদিকে মাতুল কন্যা সাহানা সঙ্গীত সম্মেলন শুরু হবার আগেই ভাইদাদার কাছে হাজির। অতুলপ্রসাদের ইচ্ছা—সাহানার গান পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীকে শোনান। তাই সম্মেলন শুরু হবার আগেই অতুলপ্রসাদ সাহানাকে কিছু গান শিখিয়েছিলেন। সাহানারও তীব্র ইচ্ছা ভাইদাদার কাছে গান শেখেন। কিশোর বয়সে শকুন্তলা নাটকে পানিমামর কণ্ঠে একটি গান শুনেছিলেন—সেই সুর অতুলপ্রসাদকে মুগ্ধ করেছিল তারই সূত্র ধরে। অতুলপ্রসাদ সাহানাকে—

'বধু, ধরো ধরো মালা, পরো গলে,
ফিরে দিয়ো না বনকুসুম ব'লে।
কাঁটার ঘায়ে রাঙা হাতে
ফুল তুলেছি আঁধারে দুঃখ-রাতে;
তাহে গেঁথেছি বিজনে আঁখিজলে।
প্রেমের কূলে ছিনু একা,
আজি তোমারে একেলা পেনু দেখা;
ঘর ভুলিনু তব বেণুর বোলে।
যদি না মালা শোভে গলে,
তারে দিয়ো ঠাঁই তব পদতলে;
তোমায় ধরিব হৃদয়-শতদলে

শেখালেন। নিজে গাইতে গাইতে সুরের আমেজে বিহ্বল হয়ে যেতেন। সাহানা দেবী অতি নিষ্ঠার সাথে একবারেই গানটি কণ্ঠে ধরে রাখলেন।

তিনদিনের সঙ্গীত সম্মেলন শেষ হ'ল। চতুর্থ দিনে সঙ্গীত সভা। এই সঙ্গীত সভায় অতুলপ্রসাদ সাহানাকে সঙ্গে করে নিয়ে যান এবং ভাতখণ্ডেজী, মথুরার চন্দন চৌবে, রতনঝঙ্কার সহ অন্যান্য বড় ওস্তাদদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। সাহানা দেবী বড় বড় ওস্তাদদের সামনে গান করেছিলেন।

সঙ্গীত সম্মেলন ও সঙ্গীত সভা শেষ হবার পর অতুলপ্রসাদের ভবনে ওস্তাদদের আসর চলল। সঙ্গীতানন্দে মুখরিত অতুল-ভবন। ভাতখণ্ডেজীও একদিন এলেন অতুলপ্রসাদের বাসভবনে। সে' সময় অতুলপ্রসাদ সাহানাদেবীকে দিয়ে গান গাইয়েছিলেন। রতন ঝঙ্কারজীর কণ্ঠে 'ভবানীদয়ানী' গানটি তিনি খুবই ভালবাসতেন। অতুলপ্রসাদ এই গানটি বন্ধুপুত্র দিলীপকুমার রায়ের কণ্ঠে প্রথম শোনেন এবং তার পরই নিজে রচনা করেন—

সে ডাকে আমারে
বিনা সে সখারে রহিতে মন নীরে।....

আলাউদ্দীন খাঁর বেহালা আর সঙ্গত করতেন তবলাবাদক বীরু মিশ্র—যেন সঙ্গীতের ঝর্ণায় আকাশের কোলে ঝুলে থাকা তারাগুলি নৃত্যঢংয়ে ঝরে পড়ছে ধরার ধুলোয়।

অতুলপ্রসাদ সাহানাকে সঙ্গে করে সুধাকণ্ঠী অচ্ছন্ন বাঈয়ের গান শোনাতে নিয়ে গেলেন। বন্ধু বিশ্বেশ্বরনাথের বাড়ীতে বন্ধুপুত্রের তিলক উৎসবে অতুলপ্রসাদ অচ্ছন বাঈয়ের গান প্রথম শোনেন—সে অনেকদিন আগে। অচ্ছন্ন বাঈয়ের গান শুনে উভয়ে মুগ্ধ। অতুলপ্রসাদ নিজ আবাসে অচ্ছন বাঈকে আহ্বান করে এনেছিলেন— সে সময়ে ধূর্জটিপ্রসাদ, বন্ধুপুত্র দিলীপ রায়ও উপস্থিত ছিলেন।

সেই অচ্ছন্ন বাঈয়ের গান শুনতে শুনতে অতুলপ্রসাদ কোথায় যেন হারিয়ে যেতেন—ভাইদাদার মুগ্ধতা সাহানাদেবীকে পুলকিত করত। নিজেও শুধু আনন্দিত হতেন না—বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে ভাবতেন, মর্তে এও কি সম্ভব!

লখনউ সঙ্গীতের জলসাঘর, প্রতি গলিতে সুরের সাথে তবলা আর বেহালার রেওয়াজে ধূলিধূসর পথ যেন কথা বলে, মাতোয়ারা হয়ে নৃত্য-তরঙ্গে নবনীয়মান হয়ে উঠছে অনবরত। সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতানুরাগীর অন্তরঙ্গতা সেসময় গভীরমাত্রা লাভ করেছিল সর্বত্র। অতুলপ্রসাদের সঙ্গীতানুরাগ ও সঙ্গীতানুভূতির প্রকাশ এবং তাঁর সঙ্গীতের বিষয়ে লখনউ-এর বহু বাঈজীর কণ্ঠের সামগ্রী হয়েছিল। বাংলা ভাষার গান—হিন্দীতে কিংবা উর্দুতে অনুবাদ করে সুরের নিজস্বতায় লখনউ-এর বিভিন্ন সঙ্গীত আসর ভরাট হত। অতুলপ্রসাদও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের প্রাণতরঙ্গের বাণী ও ছন্দকে বাঙলা ভাষায় ভাবনায় ও রূপ তন্ময়তায় গেঁথে রেখেছিলেন তাঁর

অনেক গানে। বাঈজীদের সান্নিধ্য এবং গানের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ ব্যক্তি-জীবনের দুঃখ-বেদনাকে পরিশুদ্ধ করে যে ফুল সৃষ্টি করতেন তা' ব্যথার পূজায় অঞ্জলি দিয়ে তৃপ্ত হতেন। কষ্ট তিনি পেতেন কিন্তু সেই কষ্টকে ভেতরে ভেতরে আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার ঊর্ধ্বে তুলে সবার সঙ্গে যুক্ত করে নিজেকে সর্বজনীন করতে চাইতেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ দার্জিলিংএ বেড়াতে গেলেন। সঙ্গে সাহানাদেবী। অপূর্ব সুযোগ একান্তে অত্যন্ত কাছে পাওয়া যাবে ভাইদাদাকে। তাই মজলিশী মেজাজে অতুলপ্রসাদের নানা রঙ্গ তামাশায় হাসির প্রাণখোলা সহজ মূর্তিটি সাহানা দেবী গভীরভাবে অনুভব করেছেন। যে মানুষটার প্রতিটি পাঁজরের ফাঁকে ফাঁকে রক্ত কণিকার সাথে বেদনার শিরা প্রতিদিন দপ্ দপ্ করে উঠছে, তাঁরই মধ্যে অনাবিল হাসির উৎসধারায়, আনন্দের ফোয়ারায় বিমূর্ত হয়ে একাকার হতে পারেন তা' খুবই আশ্চর্য। অতুলপ্রসাদ মানুষকে চান—মানুষের স্পর্শ, মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার অতি কাছাকাছি নিবিড় হয়ে থাকতে চান। প্রেম চান, প্রিয়া চান, মমতা চান, ভালবাসা চান—এমনি আরো কত কি মানুষের আকাঙ্খা, সব কিছু অতুলপ্রসাদ চান। আবার যা তিনি চেয়ে কাঙাল তা' আবার গানে গানে ফিরিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ অতুলনীয়, পূর্ণ।

দার্জিলিং-এ প্রায়ই অতুলপ্রসাদ কোন না কোন পথ ধরে চলতেন, শুধু চলতেন। এমনি একদিন ঘুম স্টেশনে চলে এলেন—কুয়াশায় ঘেরা মেঘের নাচন আর মাঝে মধ্যে আলোর সাথে লুকোচুরী সাহানা ও অতুলপ্রসাদ উপভোগ করতে করতে দাঁড়িয়ে থাকতেন। মেঘের আঁচলে যখন সর্বাঙ্গ আচ্ছন্ন হতো তখন তৃপ্ত মনের ও প্রাণের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসত—

কে হে তুমি সুন্দর, অতি সুন্দর, অতি সুন্দর!
কভু নবীন ভানু ভালে,
কভু ভূষিত নীরদমালে,
কভু বিহগকূজিত কুহক কণ্ঠে
গাহিছ অতি সুন্দর।
কভু নির্মল নীল প্রাতে
কনককিরীট-মাথে
অভ্রভেদী অচলাসনে
রাজিছ অতি সুন্দর!

কভু পুষ্পিত নভ-কুঞ্জে
তব নৈশ বংশী গুঞ্জে;
কভু পীত-জোৎস্না-বসন শ্যাম
মুরতি অতি সুন্দর!

প্রাকৃতিক চলমান দৃশ্যে মন উধাও। কেমন যেন আপনা থেকেই সব বাঁধন ছিন্ন হয়ে উড়ে যেতে চায়—জমাট দেহে তখন শুধু পাখার আমন্ত্রণ। তারই মধ্যে নিজেই 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ' গেয়ে পরিবেশটাকে আরো আরো অন্তর-ভেদী আকর্ষণে মাতিয়ে তুললেন। সাহানা দেবীও গাইলেন—'কী আর চাহিব বল, হে মোর প্রিয়—তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিয়ো'। একটা ভিন্ন জগৎ, একটা নিবিড় হয়ে একাকার হবার জগৎ—সেখানে দুই নেই—সব একের জন্য আকুতি। অতুলপ্রসাদ সাহানাদেবীকে শেখালেন,

তব পারে যাব কেমনে, হরি!
দুস্তর জলধি, নাহি তরী।
আছি বসে একা ভবতীরে,
ঘোর তিমির ঘন গগন আছে ঘিরে,
বলো বলো কেমনে এ নিধি তরি।
আছি আঁধার-পানে শ্রবণ পাতি,
যদি আসে হেথা তরঙ্গ আঘাতি
তব তরী
সে আশে ধৈরজ ধরি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২৬ এর শুরুতে আবার লখনউতে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন কেশরবাগের বারদুয়ারীতে। রবীন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত, আমন্ত্রিত অনেক সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পী সমজদার।

এবার রবীন্দ্রনাথ উঠেছেন ছত্রমঞ্জিলে নবাব-প্রাসাদে। সঙ্গে আছেন নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আরো অনেকে। সঙ্গীত সম্মেলনের উদ্‌বোধন হ'ল চিত্রপ্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে। ছত্রমঞ্জিল প্রসাদের লম্বালম্বি চবুতরে শান্তিনিকেতনের শিল্পীদের বহু ছবি, নন্দলাল-অবনীন্দ্রনাথের অনেক চিত্রকলা। ওস্তাদ গায়ক, নিষ্ণাত তবলা বাদক, বিশারদ সেতারীরাও এসেছেন। এসেছেন দিলীপকুমার রায়; সাহানা দেবী—অতুলপ্রসাদ তো আছেনই।

সবার রঙে রঙ মিশায়ে অতুলপ্রসাদ ব্যস্ত। একদিকে জরুরী মোকদ্দমায় কোর্টে হাজিরা—আবার সন্ধ্যায় সঙ্গীত সম্মেলন।

রবীন্দ্রনাথ ছত্রমঞ্জিল প্রাসাদ চত্বরে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দিচ্ছেন—এমনি মুহূর্তে কবির পার্শ্বচর একখানি জরুরী 'তার' এনে কবির হাতে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ কিছুক্ষণ নীরব হলেন—ছন্দ ভঙ্গ হ'ল। নিমেষের মধ্যে 'তার'-খানি দক্ষিণ হাতে মুষ্টিবদ্ধ করে পুনরায় ভাষণ দিলেন। কিন্তু মনটা খুবই চঞ্চল। আসনে বসেই অতুলপ্রসাদকে ইসারায় ডেকে বললেন, অতুল, এখুনি আমাদের বিদায় নিতে হবে, এই দেখ—এই বলেই মুষ্টিবদ্ধ 'তার' খানি প্রিয় অতুলের হাতে দিলেন। 'তার'টি শান্তিনিকেতন থেকে এসেছে—অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যু সংবাদ বহন করে। মর্মান্তিক সংবাদে কিছু মাত্র অধীর না হয়ে রবীন্দ্রনাথ চিত্রার্পিত প্রায় অবিচল স্থৈর্যে ভাষণ শেষ করলেন।

রবীন্দ্রনাথ চলে গেলেন। সঙ্গীত সম্মেলনের শেষে অতুলপ্রসাদের বাড়ীতেই সঙ্গীতের আসর বসল। দিলীপকুমার, ধূর্জটিপ্রসাদ—সাহানাদেবী, নির্মলকুমার সিদ্ধান্তের স্ত্রী চিত্রলেখা সিদ্ধান্ত।

অতুলপ্রসাদ সুরলোকের নিত্য যাত্রী। পরিধানে সেরওয়ানী, চুড়িদার পাঞ্জাবী, মাথায় নকশাদার টুপি—খাঁটি উত্তরপ্রদেশীয়। চোস্ত উর্দুতে সকলের সাথে কথা বলছেন।

অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে সেদিন বাঙলা গানের আসর। কোন নবাবী গানের ঘরানার প্রভাব ছিল না। বাঙলা গানের সুরধনী বইতে লাগল গোমতীর তীর ঘেঁষে। দিলীপ রায়, সাহানা দেবী-অতুলপ্রসাদ—বাঙলার তুলসীমঞ্চের প্রদীপের স্নিগ্ধ শিখায় বিশ্বেশ্বরের চরণে নিবেদিত। দিলীপকুমার গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'রাঙাজবা' গানটি পরিবেশন করলেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত-শ্যামাসঙ্গীত-ভাটিয়ালী-বাউলের অঙ্গের গান—তার সাথে সাহানার কণ্ঠে অতুলপ্রসাদের এবং নিজের কণ্ঠে অতুলপ্রসাদ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরা'র জন্য অতুলপ্রসাদ কাশীর সুরেশ চক্রবর্তীর হাতে একটি নূতন গান পাঠিয়ে দিলেন যা অনেকদিন আগে লিখেছিলেন—

এ বনেতে বনমালী, কোথা তব বনফুল?
কার লাগি ধায় এত দলে দলে অলিকূল?
সুরভি পবন মোরে ঘুরাইছে মিছে ঘোরে,
শুধু কি ফুটাও কাঁটা, ফুটাও না কি মুকুল?

গহনে বিহগ হেন আমারে ভুলায় কেন?
এত গন্ধ এত গান সকলি কি মহাভুল?
বড়ো সাধ ছিল মনে ভরিব আঁচল বনে;
ভুলিব চরণে ব্যাথা, নয়নে বেদন-দুল।

'উত্তরা'র লেখা পাবার জন্য সুরেশ চক্রবর্তীর তাড়ায় অতুলপ্রসাদ বলেন, নতুন গান লিখি কখন? এই তো একটা কেসে কালই আবার বাইরে যেতে হবে। স্বরলিপি সহ একটা পুরনো গান দেব—সাহানার নয়, সংগীতচার্য সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের। তিনি আমার কিছু গানের স্বরলিপি করেছেন।....

'উত্তরা'য় প্রকাশিত মহেন্দ্র রায়ের 'তরুণ কবি প্রেমেন্দ্র' এবং গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন' এ দুটো প্রবন্ধ খুব মনোযোগ দিয়ে পড়েছি—খুব ভাল এবং উঁচু মানের।

'উত্তরা'র জন্য প্রেসের বিল অনেকগুলি জমে গেছে—অতুলপ্রসাদ সুরেশ চক্রবর্তীকে বললেন, একদিন এসো—বিলগুলির জন্য টাকার চেক দিয়ে দেব। আর কোথাও থেকে টাকা না আসলে 'উত্তরা' ছাপা খরচ করবে কি করে?

সুরেশ চক্রবর্তী খুবই চিন্তিত হলেন।

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের চতুর্থ অধিবেশন কানপুরে। এপ্রিল মাস—মূল সভাপতিত্ব করবেন বলে স্থির হয়েছিল শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের দর্শন বহুজনের। কিন্তু শরৎচন্দ্র সম্মেলনে আসবেন—খবরটা চাঞ্চল্য সৃষ্টি করল কানপুর ও তার আশেপাশে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত প্রতিনিধিদের।

কানপুরে অধিবেশনে সবাই উপস্থিত—কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ধূর্জটিপ্রসাদ আরো অনেকে—শরৎচন্দ্র আসবেন—খুব আড্ডা হবে—সাহিত্য সম্মেলনের মেজাজ ও মাত্রা বর্ধিত হবে। কানপুরের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সম্মেলনের ঋদ্ধি ডাঃ সুরেন সেন সবাইকে স্বাগত জানালেন। অতুলপ্রসাদের জন্য আলাদাভাবে থাকাব ব্যবস্থা হ'ল—কিন্তু অতুলপ্রসাদ সবিনয়ে বলে উঠলেন, না, না, তা হয় না। আমি ত' সকলের সঙ্গে প্রতিনিধি আবাসে থাকব।

দাদামশাই, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রথম সম্মেলনের অধিবেশনে এলেন—ডাঃ সেনের বিশেষ অনুরোধে।

অতুলপ্রসাদ সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনে অসুস্থতাবশতঃ উপস্থিত হ'তে পারেন নি। তাই কানপুর অধিবেশনে এসে খুবই আনন্দিত। সারা রাত সাহিত্য ও গানের মজলিসে বিভোর। অধিবেশনের মহাক্ষণে কর্তৃপক্ষ কিংকর্তব্যবিমূঢ়—

শরৎচন্দ্র আসবেন না। তিনি অসুস্থ। অতুলপ্রসাদকে সবাই বরণ করলেন, মাল্যভূষিত করলেন সভাপতিত্ব করার জন্য। অতুলপ্রসাদ বিভ্রান্ত হলেও অসম্মতি প্রকাশ করতে পারলেন না। প্রাণ-প্রতিম এ-প্রতিষ্ঠানের গঠন ভিত্তির প্রথম কর্ণিক-স্পর্শ তো তাঁরই।

সভাপতি অতুলপ্রসাদ। দু'লাইনের একটি কথা, ...রামের অবর্তমানে সিংহাসনে তাঁর পাদুকা স্থাপন করে ভরত যেভাবে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন, শরৎচন্দ্রের অনুপস্থিতিতে এ সভায় আমারও ঐ ভূমিকা। এইটুকু বলেই অতুলপ্রসাদ দরাজ গলায় 'ভারত ভানু কোথা লুকালে' গানের অর্ঘ্য দিয়ে উপস্থিত সকলের চিত্তলোক নিস্তরঙ্গ প্রশ্নে ঘুরে ঘুরে খুঁজে বেড়াচ্ছে ঃ

আছে অযোধ্যা কোথা সে রাঘব?
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন?
কোথা সে কালা কালিন্দী কূলে?

সেই অধিবেশনে অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'অতুলপ্রসাদের গান' শীর্ষক রচনাটি লেখকের অসুস্থতাবশতঃ অনুপস্থিতিতে ডঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় পাঠ করছিলেন—অতুলপ্রসাদ তাঁর নিজের সম্পর্কে আলোচনার ও প্রশস্তির কথা শুনে খুবই বিব্রত এবং বিড়ম্বিত বেদনায় ক্লান্ত—বার বার বেল টিপেও ডঃ মুখোপাধ্যায়কে নিরস্ত করতে পারলেন না। অগত্যা তিনি নতশিরে বসে রইলেন। প্রবন্ধ পাঠ শেষ হওয়ার সাথে সাথে শ্রোতৃবর্গের অনুরোধে অতুলপ্রসাদ পর পর গান গেয়ে গেলেন। তখন রাত দুটো।

এই কানপুর অধিবেশনেই সম্মেলনের মুখপত্র 'উত্তরা' প্রকাশের ব্যয় বহন করার বিষয়ে ব্যাপক পর্যালোচনা হয়। অধিবেশনের পর অতুলপ্রসাদ বাঙ্গালোর যান গ্রীষ্মাবকাশের দিনগুলি অতিবাহিত করার জন্য। সেখানে থেকেও 'উত্তরা'র বিষয়ে পত্রালাপ করছেন।

কিন্তু ইন্ডিয়ান প্রেসের কর্মকর্তা 'উত্তরা' প্রকাশের জন্য— পূর্ণাঙ্গ হিসাব পাঠিয়ে প্রাপ্য দু'হাজার তিনশত টাকা দাবী করেছেন। কে এত টাকা দেবে? 'উত্তরা' যৌথ উদ্যোগের প্রতিশ্রুতির দায় বহন করতে রাজি নন। তবে কে পরিশোধ করবে। অতুলপ্রসাদ স্পষ্ট জানিয়েছেন—আমি তো অনেক টাকা দিয়েছি, অন্যরা এবার যা হয় করুন। অনেক আলোচনা-তর্ক এবং অবশেষে সবাই চুপ।

অতুলপ্রসাদ

শেষ শয্যায়

অতুলপ্রসাদ বিব্রত—তিনি সুরেশ চক্রবর্তীকে জানালেন ... 'উত্তরা'র জন্য আমাকে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হতে হচ্ছে; যদি জানতাম আমার সমস্ত দায়িত্ব পড়বে তা'হলে এ কাজে হস্তক্ষেপ করতাম না। যাহা হউক, আমি আর একখানা ৫০০ টাকার cheque Indian Press এর নামে দিচ্ছি—যদিও এর জন্য আমি নিজে দায়ী নই। তুমি এই চেকখানা দেবে না যদি Indian Press আমাকে তাদের টাকার জন্য personally দায়ী করতে চান। আমি Indian Pressকেও একখানি চিঠি দিলাম, ভবিষ্যতে তুমি যে সর্তে কাগজখানি আগামী আশ্বিন পর্যন্ত চালাতে প্রতিশ্রুত হয়েছ ঠিক সেরূপভাবে কাজ করবে।...

সবশুদ্ধ আমি 'উত্তরা'র জন্য প্রায় ১৫০০ টাকা দিলাম।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২৬ সালে ডিসেম্বর মাসে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন দিল্লীতে। প্রমথ চৌধুরী মূল সভাপতি। সেই অধিবেশনের সাহিত্য সভায় অমল হোম লাহোর থেকে এসেছেন এবং বহু বিতর্কিত প্রবন্ধ 'অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য' পাঠ করেন। অধিবেশন শেষে অমল হোম লখনউতে গেলেন। অতুলপ্রসাদ সেবার শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে গিয়েছিলেন তাই দিল্লীর অধিবেশনে যেতে পারেন নি। লখনউতে অতুলপ্রসাদ আসার পর অমল হোম তাঁর সাথে দেখা করেন এবং দিল্লীর অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধটি—যার কপি ছাপিয়ে পূর্বেই অতুলপ্রসাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন, সম্পর্কে মতামত জানতে চাইলেন।

অতুলপ্রসাদ জানালেন, তোমার প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথ পড়েছেন, খুশি হয়েছেন—আমারও ভাল লেগেছে।

দুপুরের খাবার শেষে বিশ্রামের পর অতুলপ্রসাদের আমন্ত্রণে অমল হোম অতুলপ্রসাদের নিজের নামের রাস্তায় লখনউ রেল স্টেশনের সামনে চমৎকার বাড়ী 'হেমন্তনিবাসে' হাজির হলেন। সঙ্গে ছিলেন ধূর্জটিপ্রসাদ, বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত এবং নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। নানা কথার ফাঁকে অমল হোম অতুলপ্রসাদের গানের দু একটি পাণ্ডুলিপি নিজের কাছে রাখবেন বলে জানালে অতুলপ্রসাদ পর পর আগের ২টি রচনা উদ্ধার করে অমল হোমের হাতে দিলেন। তারপর গান দুটি গেয়ে শোনালেন;

ওগো সাথি, মম সাথি, আমি সেই পথে যাব সাথে,
যে পথে আসিবে তরুণ প্রভাত অরুণ-তিলক-মাথে।
যে পথে কাননে আসে ফুলদল,

যে পথে কমলে পশে পরিমল,
যে পথে মলয় আনে সৌরভ শিশিরসিক্ত প্রাতে।
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে বধূরা যমুনার কূলে
যায় ফুল হাতে প্রেমের দেউলে,
যে পথে বন্ধু বন্ধুর দেশে চলে বন্ধুর সাথে—
আমি সেই পথে যাব সাথে।
যে পথে পাখিরা যায় গো কুলায়
যে পথে তপন যায় সন্ধ্যায়,
সে পথে মোদের হবে অভিসার শেষ তিমির-রাতে।

মুগ্ধতার পরশে একটি অনন্য অতুলপ্রসাদের চিত্র শ্রোতৃমণ্ডলীদের চোখে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠছে। অতুলপ্রসাদ থামলেন না—পরের গানটিও সাদা গলায় গাইলেন—

জানি জানি তোমারে গো রঙ্গরানী,
শূন্য করি লইবে মম চিত্তখানি।
এসো গো মম অন্তরে ধীরে মৃদু মন্থরে
বিদ্যুৎ-প্রবেশে তব শঙ্কা মানি।
বলো গো অয়ি চঞ্চলে, এনেছ ও কী অঞ্চলে?
দিবে কি মোরে ভরিয়া দুটি পাণি?
তব চরণ-রন্‌ঝনা করিবে কি গো বঞ্চনা—
কুহক-কল-কণ্ঠে এ কী বাণী গায়!
কী সুধা তব সংগীতে, কী শোভা তনুভঙ্গিতে;
ভুলায় তব ইঙ্গিতে কী মোহ আনি'?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ-এর সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে অতুলপ্রসাদ স্থানীয় যাঁদের সহযোগিতা পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে নলিনীবিহারী হালদার, শিবচন্দ্র প্রামাণিক, ডাঃ রামদাস প্রামাণিক এবং শরৎচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছায়ার মত নগরীর উন্নয়নে গভীরভাবে অনুসরণ করতেন। তাঁদেরই চেষ্টায় 'গুডউইল ক্লাব' স্থাপিত হয়েছিল অতুলপ্রসাদের নেতৃত্বে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে আদর্শগত সংঘাতে গুডউইল ক্লাবের কর্মধারা স্তব্ধ হয়ে যায়।

লখনউ গোলাপ নিকেতনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের গোড়াপত্তন হয়। সময়টা ১৯১০ সাল। বেলুড় থেকে প্রেরিত বীরেশ চৈতন্য মহারাজ সেবাশ্রমের কাজ পরিচালনা করেন। পরবর্তী সময়ে আমিনাবাদে আশ্রম স্থানান্তরিত হয় এবং সেখানে জমি ক্রয় করে নোতুন করে আশ্রমের গৃহ নির্মাণ করা হয়।

১৯২৬ সালে এলেন স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজ। সেসময় থেকে অতুলপ্রসাদের সাথে গভীর যোগাযোগ হয় আশ্রমের।

আমিনাবাদে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের জন্য যে জমি কেনা হয় তাতে সহযোগিতা করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদ সেই থেকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সভাপতি এবং নলিনীবিহারী হালদার ছিলেন অবৈতনিক সম্পাদক। অতুলপ্রসাদ সেবাশ্রমের একটি বড় হলঘর নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করে পিতার নামে 'রামপ্রসাদ হল' প্রথমে উৎসর্গ করেন—পরে মা হেমন্তশশীর নামে 'হেমন্তশশী শুশ্রষালয়'-এ তা উৎসর্গ করেন।

প্রতি রবিবার অতুলপ্রসাদ বিকেলে সেবাশ্রমে আসতেন, কিছু ধর্ম-প্রসঙ্গ আলোচনায় উপস্থিত থাকতেন—শেষে খালি গলায় গান করতেন। অতুলপ্রসাদের কণ্ঠে গান শোনার জন্য বহু যুবক সেবাশ্রমে আসতেন।

ধীরে ধীরে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় স্বামী দেবেশানন্দ মহারাজের পরামর্শ মত দুটি বেড সহ বর্হির্বিভাগের জন্য ব্যবস্থা পাকা হ'ল—অতুলপ্রসাদ প্রতি মাসে তার জন্য দেবেশানন্দ মহারাজকে টাকা দিতেন। মহারাজ সেই টাকায় ক্রমে ক্রমে তিনখানা ঘর সমেত বারান্দা তৈরী করলেন এবং যে ঘরে ২টি শয্যা রাখা হল সেখানে operation এর জন্য যাবতীয় যন্ত্রাদি সহ ব্যবস্থা করলেন; তার জন্য অতুলপ্রসাদ পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। এই ঘরটি অতুলপ্রসাদ তাঁর মা'র নামে উৎসর্গ ফলক লাগান। উদ্‌বোধনের দিন নিজে উপস্থিত থেকে কীর্তন করে অনুষ্ঠান করেন।

প্রায় প্রতিদিন অতুলপ্রসাদ কোর্টে যাবার সময় বহির্বিভাগের অপেক্ষামান রোগীদের দেখে যেতেন—তাদের বাসস্থান এবং অন্যান্য খবরাদি সংগ্রহ করতেন। প্রথমে প্রথমে বহির্বিভাগে হোমিওপ্যাথি ঔষধ দেওয়া হত। অতুলপ্রসাদ পরবর্তী সময়ে ২৫ টাকা করে প্রতি মাসে ঔষধের জন্য দিতেন। তিনি তাঁর উইলেও ২৫ টাকা করে দেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

সেসময় অ্যালোপ্যাথি ঔষধের খুব প্রচলন। অতুলপ্রসাদ সেবাশ্রমের গুরুত্ব এবং রোগীদের বিশ্বাস, এই দুইয়ের কথা চিন্তা করে Bengal chemical থেকে তিন-চার শত টাকার ঔষধ এনে দিয়েছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের আনুকূল্যে। প্রতি বৎসর বিনামূল্যে সেই ঔষধ পাওয়া যেত।

অতুলপ্রসাদের ঘরের টান নেই। প্রভা সব সামলাচ্ছেন। তাই কোর্ট কাছারীর পর যতটুকু সময় সুযোগ পান অতুলপ্রসাদ ছুটে যান সেবাশ্রমে। দুঃস্থ গরীব সাধারণ মানুষের সাথে মিশতেন—তাঁদের সাথে কথা বলে তাদের অবস্থা জেনে তার প্রতিকারের জন্য সচেষ্ট হতেন। কখনো নিজে কখনো বা দেবেশানন্দজীর মারফৎ অতুলপ্রসাদ অর্থ-চাল-বস্ত্র দান করতেন। আত্মীয় পরিজনদের আর্থিক সাহায্য দিতেন। কিন্তু কখনো নিজের নাম জানাতেন না—পাছে তাঁরা ক্ষুণ্ণ হন। প্রায়ই মিশনে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা হয়। অতুলপ্রসাদ সমস্ত খরচ বহন করেন এবং নিজে সবাইকে বিনীতভাবে খিচুড়ী-তরকারী-পায়েস—আর একটু দিই, তোমার পাত খালি আর একটু লও—ইত্যাদি মাধ্যমে আর সকলের সঙ্গে পরিবেশন করতেন।

এমনি একবার অরুণপ্রকাশ মিশ'নে এসে দরিদ্র নারায়ণ সেবায় অতুলপ্রসাদের আচরণ ও পরিবেশনে বিস্ময় বোধ করলেন। অরুণপ্রকাশ কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না—এই সেই অতুলপ্রসাদ কী?

অরুণপ্রকাশের বিস্ময় অতুলপ্রসাদ বুঝেছিলেন, তাই সেদিন তিনি তাঁকে বললেন, স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগো থেকে ফিরে বেলুড়ে প্রতিদিন এইভাবে দরিদ্র নারায়ণ সেবার ব্যবস্থা করেছিলেন—স্বামীজীর Practical Vedanta এর প্রত্যক্ষতার এই ঘটনা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অরুণ, মানুষকে ভালবাসতে হবে— মানুষের দুঃখে অংশ গ্রহণ করতে হবে। যতটুকু সম্ভব তাদের সেবা করে করে অহংকারের নাশ করতে হবে। আমি এখানে প্রায়ই ছুটে আসি কেন জানো? এখানে এলে, এই দরিদ্র-নারায়ণদের পরিবেশন করে খাইয়ে যে কী আনন্দ পাই তোমায় বলে বোঝাতে পারব না।

লখনউ-এর সর্বস্তরের যুবকদের কাছে অতুলপ্রসাদ ছিলেন জীবন্ত সোনার কাঠি, প্রেরণা। প্রাক্ অতুলপ্রসাদ, লখনউ-এর জন-জীবনে সেবাকাজের ব্যাপারটা কেউ দেখেনি—অনুভবও করেনি। লখনউ আসার প্রথমদিকে সমিতি গঠনের ভিত্তিতে সেদিন 'মুষ্টি ভিক্ষা'র মাধ্যমে অতুলপ্রসাদ যখন পথে পথে গান গেয়ে চলেছেন—কাতারে কাতারে মানুষ রাস্তায় দাঁড়িয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেছে—দেখেছে তাদের 'ভাইদাদা' মানুষের কান্নায় মানুষের সেবায় নিজে পথে নেমে এসেছেন—এটা কি সম্ভব? লখনউ-এর মানুষ এর আগে এমন ধারা কখনও দেখেনি। একটি মানুষ নিজের ড্রয়িং রুম ছেড়ে, ঘর ছেড়ে তার সকল আর্তি পথের ধূলায় মিশিয়ে দিয়ে সবার রঙে মিশে যেতে পারে—তিনি যে আর কেউ নন, তিনি অতুলপ্রসাদ। তিনি লখনউ-এর আপামর জনসাধারণকে বোঝাতে

চেয়েছেন পরাধীন ভারতে ভারতবাসীর প্রথম প্রয়োজন একতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা। তাই যুব সম্প্রদায় তাঁর আহ্বানে এক হয়—তাঁর নির্দেশে বন্যাপীড়িতদের সাহায্যে দল বেঁধে এগিয়ে আসে। অতুলপ্রসাদও নবীন-তাজা প্রাণের জন্য হৃদয় উজাড় করে দু'হাতে আহ্বান জানাতেন। তাদের কাছে অতুলপ্রসাদ শুধু প্রেরণা নন—তিনি দিশা, তিনি আত্মীয়। অতুলপ্রসাদ সেই তরুণদের গান শোনাতেন, তাদের ভারত-আত্মার ঐতিহ্যের সংবাদ দিতেন। সে এক উত্তেজনাপূর্ণ যুগ। লখনউ-এর যুব সম্প্রদায় দেশ ও দেশবাসীর সেবায়, ভালবাসায় এগিয়ে এল।

তরুণ-কিশোরদের অতুলপ্রসাদ কাছে টেনে নিতেন—তারাও নানা আবদার জানাতেন অতুলপ্রসাদের কাছে। অতুলপ্রসাদ স্নিগ্ধ চিত্তে তা' পালন করতেন। কেউ কেউ বৈশাখী উৎসব করবে—অতুলপ্রসাদকে চাই, সরস্বতী পূজা করবে, ভাইদাদাকে চাই। অতুলপ্রসাদ খুশি হতেন—উৎসাহ দিতেন, অর্থও দিতেন।

এমনি একটি অনুষ্ঠানে দেবেশানন্দ মহারাজের উপস্থিতিতে অতুলপ্রসাদ তরুণদের উদ্দেশ্যে একটি গান গাইলেন—

সবারে বাস্ রে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।
আছে তোর যাহা ভালো
ফুলের মতো দে সবারে।
করি' তুই আপন আপন
হারালি যা ছিল আপন;
এবার তোর ভরা আপণ
বিলিয়ে দে তুই যারে তারে!
যারে তুই ভাবিস ফণি,
তারো মাথায় আছে মণি;
বাজা তোর প্রেমের বাঁশি...
ভবের বনে ভয় বা কারে?
সবাই যে তোর মায়ের ছেলে
রাখবি কারে কারে ফেলে?
একই নায়ে সকল ভায়ে
যেতে হবে রে ও-পারে।।

গানটি শেষ হবার পর সমস্ত পরিবেশ কেমন যেন নীরব হয়ে গেল। সেই অনুষ্ঠানে আখতারউদ্দিন, এক গরীব ভিখারী—বেহালা বাজিয়ে জীবিকা নির্বাহ

করে—গানের সুর বেহালার তারে তুলে হঠাৎ সকল নীরবতা ভেঙ্গে ছড়িয়ে দিল—

।। সবারে বাস্ রে ভালো
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।।

অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ বিস্ময়ে পুলকাশ্রু বর্ষণ করতে করতে আখতারউদ্দিনের কাছে এসে দাঁড়ালেন। আখতারও বিহ্বল আকুতিতে অতুলপ্রসাদের দিকে অনড় দৃষ্টিতে চেয়ে রইল— আর বেহালায় আরো আরো দরদ দিয়ে জানিয়ে দিল ঃ

।। সবারে বাস্ রে ভালো
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।।

আখতারউদ্দিনকে বুকে জড়িয়ে অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ উষ্ণ আলিঙ্গনের সুখ-স্পর্শে মুগ্ধ হলেন।

একসময় তরুণ ছাত্র সমাজকে একতাবদ্ধ করে দেশের কাজে যুক্ত করার জন্য অতুলপ্রসাদ **'গোখলে সোসাল সার্ভিস লীগ'** প্রতিষ্ঠা করে নিরক্ষরতা দূর করার কাজে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—যা লখনউ তথা উত্তরপ্রদেশের কোন সমাজসেবীর কাছে কল্পনার অতীত ছিল। ১৯১২-১৩ সালে অতুলপ্রসাদ লখনউ-এর হরিজন পাড়াতে হরিজনদের কুঁড়েতে গিয়ে তাঁদের নানাবিধ উৎসব-আনন্দে, হোলি খেলায় যুক্ত হয়ে এক অভিনব সমাজসেবার নিদর্শন স্থাপন করেছিলেন—এ কাজ গান্ধীজীর হরিজনদের সেবা কাজের প্রচলনের অনেক আগে অতুলপ্রসাদ নিজে লখনউতে শুরু করেছিলেন। সেদিন অতুলপ্রসাদের সহযাত্রী যাঁরা ছিলেন তাঁরা লখনউ-এর বাসিন্দা নন—তারা অতুলপ্রসাদের পুত্র দিলীপকুমার আর খৃষ্টান বিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষিকা। অতুলপ্রসাদ যখন মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান হন—তিনিই প্রথম কয়েকটি বিদ্যালয়ে হরিজনদের পড়ার সুযোগ করে দেন।

সেসব দিনের কথা স্মরণ করে অতুলপ্রসাদ আজ নিঃসঙ্গ জীবনে আবার সেইদিকে মোড় নিতে চান—সঙ্গে রাখতে চান নবীনদের, যুবকদের। তাঁদের সতেজ হৃদয়ে সেই আদর্শ জাগাতে হবে—নইলে ভারতের ভার একদিন যাঁরা বহন করবে তাঁদের প্রতি যোগ্য উত্তরাধিকারের অধিকার অর্জনের পথকে তুলে ধরার দায়বদ্ধতা পালন করা হবে না। অতুলপ্রসাদ কোর্টের কাজ সেরেই সোজা চলে যান সেই সেবাশ্রমে—যেখানে তাঁর জন্য তরুণদল অপেক্ষা করতেন।

স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে নানা জটিল মতবিরোধ মাঝে মধ্যে প্রকট হয়ে উঠে। তার অনিবার্য প্রভাব পড়ে জনসাধারণের উপর—বিশেষ করে সমাজের নিম্নবর্গীয় জনতার উপর। অতুলপ্রসাদ সেদিকটার প্রতি গভীরভাবে নজর

দিতেন। তরুণদের অন্তরে সহজ আকুতিতে অতুলপ্রসাদ বাউল সুরে গান গেয়ে জানালেন তাঁর অভিমত ঃ

নিচুর কাছে হতে নিচু শিখলি না রে মন।
সুখী জনের করিস পূজা, দুখীর অযতন-মূঢ় মন!
লাগে নি যার পায়ে ধূলি, কী নিবি তার চরণ-ধূলি?
নয় রে সোনায়, বনের কাঠেই হয় রে চন্দন-মূঢ় মন!
প্রেমধন মায়ের মতন, দুঃখী সুতেই অধিক যতন;
এই ধনেতে ধনী যে জন সেই তো মহাজন-মূঢ় মন!
বৃথা তোর কৃচ্ছ্রসাধন; সেবাই নরের শ্রেষ্ঠ সাধন।
মানবের পরম তীর্থ দীনের শ্রীচরণ-মূঢ় মন!
মতামতের তর্কে মত্ত, আছিস ভুলে সরল সত্য;
সকল ঘরে সকল নরে আছেন নারায়ণ-মূঢ় মন!

হেমকুসুম অসুস্থতায় চিকিৎসার জন্য দেরাদুন থেকে লখনউতে অতুলপ্রসাদের আউট্রাম রোডে কিছুদিন থাকার পর পুনরায় মানসিক বিপর্যয়ে বাড়ী ছেড়ে লখনউতে অন্যত্র বাড়ী ভাড়া করে ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই হেমকুসুম তাঁর পিতা স্যর কে. জি. গুপ্তর সঙ্কটপূর্ণ অসুখের সংবাদ পেয়ে কলকাতায় চলে যান। কলকাতায় ৫-৬ মাস কাটিয়ে হেমকুসুম লখনউতেই ফিরে এলেন এবং ক্যানটনমেন্ট রোডে একটি বাড়ী ভাড়া করে একটি নার্সকে নিয়ে থাকতেন। পুত্র দিলীপকুমার নৈনী এগ্রিকালচারাল কলেজের শিক্ষা শেষ করে লখনউতে মা'র কাছেই থাকতেন। দিলীপকুমার মাঝে মাঝে বাবার কাছে যেতেন।

হেমকুসুমও একা, নিঃসঙ্গ। তাঁর ব্যথা আছে, বেদনা আছে, প্রেমের আর্তিতে তিনিও কাঁদেন, অবসন্ন হন। দুঃসহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করতে করতে হেমকুসুমও বর্ষা-রাতে বিছানায় শুয়ে শুয়ে গুন্ গুন্ করে গাইতেন,

... *নিদ্ নাহি আঁখি পাতে*
আমি ও একাকী, তুমিও একাকী
আজি এ বাদল-রাতে...।

প্রিয় প্রাণ-প্রতিম স্বামীকে ত্যাগ করে একাকীত্বের বদ্ধ যন্ত্রণায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠতেন—মন-প্রাণ ছুটে যেতে চায় মিলনের জন্য, কিন্তু দুর্জয় জেদ-অভিমান পথরোধ করে দাঁড়াত—ইচ্ছা থাকলেও মিলতে পারত না। আপন অন্তরের কান্নার দুর্গে নির্বাসিত হয়ে হেমকুসুম মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে গেয়ে আর্তনাদ করতেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

একদিন বিকেলে অতুলপ্রসাদ অন্তরঙ্গ বন্ধু ধূর্জটিপ্রসাদকে নিজের মোটরে তুলে বেড়াতে গেছেন। যেতে যেতে রাস্তার পাশের একটি গলির মুখে গাড়ী থামালেন এবং ধূর্জটিপ্রসাদকে গাড়ীতে বসিয়ে অতুলপ্রসাদ গলি পথে হাঁটতে হাঁটতে নজরের পথে হারিয়ে গেলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ বিস্মিত, এই সুরু গলির ভেতর অতুলপ্রসাদ কেন গেলেন! ধূর্জটিপ্রসাদ গাড়ী থেকে নেমে সেই গলি পথ ধরে অতুলপ্রসাদের খোঁজে নিঃশব্দে চলতে লাগলেন। দেখলেন, অতুলপ্রসাদ একটি ছোট জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে খাটিয়ায় শুয়ে থাকা এক বৃদ্ধের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। বৃদ্ধ ঘুমোচ্ছেন। অতুলপ্রসাদ তাঁকে কিছুমাত্র বিব্রত না করে নিজের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একমুঠো টাকা ঘুমিয়ে থাকা সেই বৃদ্ধের বালিশের তলায় গুঁজে দিয়ে দ্রুত চলে এলেন—সামনেই ধূর্জটিপ্রসাদকে মুখোমুখি দেখতে পেয়ে বেশ একটু বিব্রত হলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওটা কি হ'ল অতুলদা'। অতুলপ্রসাদ গাড়ীতে যেতে যেতে বললেন, আমার সেই ফকীর— যার ভবিষ্যৎ বাণীতে আজ আমি 'ভাই সাহেব'—'সেন সাহেব'।...

অতুলপ্রসাদ কাছারী থেকে ফেরার পর বেয়ারা কোটপাতলুন খুলে নিত— তিনি বারান্দার ডেকচেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিতেই বেয়ারা হাত-পা'র আঙ্গুলগুলি টেনে ম্যাসাজ করে দিত। তারপর চা খেতেন। কিছুক্ষণ চুপ চাপ থেকে ঘরের ভেতরে যেতেন—চিঠিপত্র খুঁজে আনতেন। এমনি একদিন চিঠিপত্রের মধ্যে একটি চিঠি— ইংরেজীতে লেখা—পাঠ করেই চুপ করে রইলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত এসেছেন কিছু জরুরী আলোচনার জন্য। অতুলপ্রসাদ বিনয়বাবুকে বসতে বলেই নিজের হাতে সদ্য পাঠ করা ইংরেজী চিঠিটি পড়তে বললেন। চিঠি পাঠ করে বিনয়বাবুও অস্বস্তিতে জড়সড়।

'এই চিঠির মূল বক্তব্য বুঝলে তো'— অতুলপ্রসাদ বললেন।—'কি করব বল?'

বিনয়েন্দ্রবাবু ধীরে ধীরে বললেন, আপনার স্ত্রী একখানা নূতন মোটর গাড়ী চাইছেন, দিতেই হবে—উপায় কি?

উত্তেজিত অতুলপ্রসাদ বললেন, ...কখনই নয়—এই মোটরগাড়ি নিয়ে তিনি বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়াবেন—বাঙালি, অবাঙালির বাড়ী গিয়ে আমার কুৎসা করবেন, আমার মা ও বোনেদের বিরুদ্ধে নানা কথা বলবেন, আর মহিলারা কপ্ কপ্ করে এসব মিথ্যা কথা গিলে খাবেন।

হেমকুসুম সেই পত্রে অনেক অশোভন ইংগিতপূর্ণ কথা লিখেছেন এবং এও লিখেছেন, আগামী দশ বারো দিনের মধ্যে একখানা নূতন গাড়ী না এলে তিনি অতুলপ্রসাদকে হেয় করতে ছাড়বেন না...

অতুলপ্রসাদ বিরুক্ত, তিক্ত মানসিক যন্ত্রণায় ভেতরটা উলটে-পালটে বিপর্যস্ত।

বিনয়েন্দ্রবাবু পরিবেশটা বদলাবার জন্য বলেন, আপনারা দু'জনে দু'জনকে খুব ভালবাসতেন—বিলেতে গিয়ে বিয়ে করেছেন। শুনেছি, বিলেতে আপনাদের কষ্টের সময় মিসেস সেন তাঁর গহনা বিক্রী করেও সংসার চালাবার জন্য আপনাকে প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন—

—তুমি ঠিকই বলছ, কিন্তু সেটা তো আমাদের সকলের জন্যই খরচ হয়েছে—এক সঙ্গে থাকতে হ'লে দুজনকেই খরচ করতে হয়—অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত শান্তভাবে কৃতজ্ঞ-অনুভূতিতে কথাগুলো বললেন।

...আমার বিলেতে ব্যারিস্টারী পড়ার খরচ সাহানার বাবা, আমার মামা প্যারীমোহন গুপ্ত এবং পানী মামা দিয়েছেন। শুধু তাই নয়, কোন অসুবিধায় যখন পড়েছি তখন আমার বোনেরা—হিরণ, কিরণ অনেক সাহায্য করেছে—তাদের টাকা ফেরতও নিতে চায়নি... কিছুক্ষণ চুপ থেকে... আজ আমার বোনেরা জীবনে সব হারিয়ে আমাকেই অবলম্বন করে আছে—মাঝে মাঝে ওরা আমার কাছে থাকতে চায়—হিরণের স্বামী মাদ্রাজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ছিলেন, অনেক টাকা রেখে গেছেন; দ্বিতীয় বোন আনন্দমোহন বসুর পুত্রবধূ— তাঁরও টাকার অভাব নেই। শুধুমাত্র ছোট বোন প্রভার বড় অভাব। আজ আমি সমাজে ও ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত— এখন আমার কর্তব্য এদের সকলকে দেখাশুনা করা।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কোর্ট থেকে ফিরে বেশ কিছুদিন যাবৎ অতুলপ্রসাদ বাইরের কোন কাজে যান না। শরীরও ভাল নয়, তা'ছাড়া মামলা সংক্রান্ত কিছু জটিলতা তাঁকে বাড়ীতে পড়াশোনায় মনোনিবেশ করতে হয়। দোতলার বারান্দায় বসে চোখ বুজে বিশ্রাম করছেন—বিনয়েন্দ্রবাবু এলেন। তিন চারদিন পর হেমকুসুমের আর একটি পত্র এসেছে—সেটি বিনয়েন্দ্রবাবুকে পড়তে দিয়ে অতুলপ্রসাদ বললেন, যত শীঘ্র পার তোমার পছন্দ মতো একখানা নূতন গাড়ী কিনে তাঁকে পাঠিয়ে দিও—কোম্পানীকে বলবে, বিলটা যেন আমাকে পাঠিয়ে দেয়।

সেইমত 'প্লাইমাউথ' গাড়ী হেমকুসুমকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

বেশ কিছুদিন ধরে হেমকুসুম পত্র ও লোক মারফৎ বিনয়েন্দ্রবাবুকে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য বলছেন। বিনয়েন্দ্রবাবু অতুলপ্রসাদের অনুমোদন ছাড়া সেখানে

যাওয়ার ব্যাপারে কুণ্ঠা বোধ করছিলেন। যখন শুনলেন হেমকুসুম অসুস্থ, খুবই কাতর হয়েছেন তখন অবশেষে তিনি হেমকুসুমের সঙ্গে দেখা করেন এবং অনেক বিষয়ে উভয়ে আলোচনা করেন। বিনয়েন্দ্রবাবু এ খবর অতুলপ্রসাদকে জানিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমের সংবাদে খুশী হয়েছেন কিন্তু রসিকতা করে বিনয়েন্দ্রবাবুকে বললেন, ...'তোমাকে জয় করে ফেললেন না কি? মিসেস সেন কিন্তু অন্যের বেলা খুব মিষ্ট হতে পারেন—তা'ছাড়া তোমরা যা চাও, সুন্দর ইংরাজী বলেন—ভাল বেহালা বাজিয়ে মন খুশী ক'রে দিতে পারেন; কেবল আমার উপরই আক্রোশ আর আমার সব কাজেরই নিন্দা। ...এগুলো তো তুচ্ছ কথা—আমার মাসী-বোন-দাদা এবং অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আমার এত হৃদ্যতা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না—আমি আবার চাই সকলে আসুক, একসঙ্গে আনন্দ করা যাক-ভুল ভ্রান্তি ভুলে যাই—তুমিও এসে থাক—পুরোনো জিনিস পিছনে পড়ে থাক।'

কথাগুলো বলতে বলতে অতুলপ্রসাদ হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। বিনয়েন্দ্রবাবু কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, 'মিসেস সেন চান আপনি দিলীপের বিয়ের জন্য চেষ্টা করুন। আর দিলীপকে হাজার দশেক টাকার মূলধন দিয়ে কোনো ব্যবসাতে যুক্ত করে দিন।

অতুলপ্রসাদ উঠে দাঁড়ালেন, খুবই উত্তেজিত—চোখ মুখ যেন জ্বলে উঠছে। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে বললেন, ...আমাকেও তিনি সেরকম পত্র দিয়েছেন। কিন্তু আমি দিলীপের বিয়ে দেব না স্থির করেছি—বিয়ে করে সেও যে দুঃখ পাবে না, তা' কে বলতে পারে?... তুমি জান না, এ বিষয়ে আমি স্থির করেছি দিলীপকে প্রতি মাসে পঞ্চাশ টাকা করে দেওয়া হবে—আমার উইলে সে ব্যবস্থা আমি করেছি।

বিনয়েন্দ্রবাবু বললেন, পঞ্চাশ নয়, একশো করলে ভাল হয়। দিলীপ আপনার আশানুরূপ হয়নি—কিন্তু মানুষ হিসেবে সে খুব ভদ্র-সৎ-পরোপকারী-সত্যবাদী এবং চরিত্রবান।

অতুলপ্রসাদ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ...আমি চেয়েছিলেম ওকে দূরে সরিয়ে দিতে, নিজের পায়ে দাঁড় করাতে, মানুষ হয়ে যেত—তা আর হল না, পারলাম না—সত্যিকারের দুঃখ তো আমার সেখানেই।'

মা-বাবার জেদাজেদির জন্য পুত্র দিলীপকুমার অনেক সময় স্নেহ ও সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অতুলপ্রসাদ পুত্র সম্পর্কে, তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মাঝে মাঝে ভেবেছেন, বিলেতেও পাঠিয়েছিলেন যদি জীবনে কিছু করার সুযোগ পায়।

কিন্তু কিছুই হয় নি, এটাই দিলীপের যেমন অদৃষ্ট তেমনি পিতা অতুলপ্রসাদেরও গভীর দুঃখ।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

মা হেমন্তশশীর খুব ইচ্ছা ছিল অতুলের একটা নিজস্ব বাড়ী হোক— ওর মুন্সী বাড়ী করছে, অতুলের নিজের কিছুই হ'ল না। মা জীবিত থাকতেই অতুলপ্রসাদ মা'র সম্মতিতেই লখনউ স্টেশনের কাছাকাছি স্থানে ৫ বিঘা জমি কিনেছিলেন। জমি সংলগ্ন যে রাস্তা আছে তার নাম অতুলপ্রসাদের জীবিতকালেই তাঁর অনুপস্থিতিতে লখনউ-এর পৌরবাসীরা রাস্তার **নামকরণ করলেন এ. পি. সেন রোড।**

নিজের বাড়ি হবে— এ ভাবনা অতুলপ্রসাদকে আনন্দ দিয়েছিল। তাই বাড়ির পরিকল্পনা, তার নক্সা নিজেই অনেকদিন নিজের কাজ সেরে একান্তে রাত জেগে করেছিলেন। বন্ধু ইঞ্জিনিয়ার জ্ঞানবাবুর সহযোগিতায় মা'র মৃত্যুর পর এই এ. পি. সেন রোডের উপরই অবশেষে তেত্রিশ হাজার টাকা ব্যয়ে বাগানসহ বাড়ী তৈরী করলেন—বাড়ীর নামকরণ হল মা'র নাম অনুসারে 'হেমন্তনিবাস'।

'হেমন্তনিবাসে'র গৃহে প্রবেশে হেমকুসুম উপস্থিত ছিলেন না। পিতার অসুস্থতাবশতঃ কলকাতায় ছিলেন। হেমকুসুম কাছে থাকেন না—বোনেদের স্বামীহারা শোক—আর মা হেমন্তশশী ও আজ ইহলোকে নেই—অথচ অতুলপ্রসাদ লখনউ এর কেন্দ্রস্থলে স্টেশনের নিকট বাড়ী করলেন—বেদনা দুঃখ-শোক সব মিলিয়ে অতুলপ্রসাদকে কোনভাবেই অবসিত করতে পারে নি—বেদনার ও বিরহের হলাহল নীরবে পান করে শুধু যেন বলতেন

... তুমি যে শিব তাহা বুঝিতে দিও...

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ জোঁড়াসাকোয় কবি-ভবনে 'ঋতুরঙ্গ' অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন। অভিনয় দেখার পর তিনি জরুরী কাজে লখনউ ফিরে গেলেন।

ডিসেম্বর মাস, ১৯২৭। অমল হোম বিবাহ করলেন এবং বড়দিনের ছুটিতে নববধুকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে কবি-সদনে গেছেন। সস্ত্রীক অমল হোম রাত্রিতে যথারীতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করলেন—কথা ও গান শোনা হ'ল। পরদিন অতি প্রত্যুষে কবির কণ্ঠস্বরে অমল হোম জেগে গেলেন—বাইরে এসে দেখলেন রবীন্দ্রনাথ তার ভৃত্যকে একটি ঘর (যে ঘরে অমল হোম আছেন তার পাশের

ঘর) ঠিকঠাক করে রাখবার জন্য নির্দেশ করছেন। অমল হোমকে দেখেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, কাল রাতে অতুলের টেলিগ্রাম এসেছে। সে আজ একটু পরেই এসে পৌঁছবে।

শিমূলতলায় ক'দিন অবসর কাটিয়ে অতুলপ্রসাদ দিলীপ রায়কে সঙ্গে করে সকালেই এলেন শান্তিনিকেতনে কবির সান্নিধ্যে। প্রতিদিন চারবার খাবার টেবিলে কবির অতিথি অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায়, অমল হোম ও নববধূ। সে এক অভাবনীয় রসের আলাপনে সকলেই মুগ্ধ।

রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলে অতুলপ্রসাদ ও দিলীপ রায়ের সঙ্গে কথা বলতেন, রবীন্দ্রনাথের মনের জানালা খুলে যেত— অসংখ্য সংবাদ পরিবেশিত হ'ত।

... আমার 'ছিন্নপত্রে' কিছু ফুটেছে আমি প্রকৃতিকে কী গভীরভাবে ভালবাসতে শিখেছিলাম অল্প বয়সে। বেশ মনে আছে, দিনের পর দিন নিরাভরণাকে কাছে পেতাম, খোলা আকাশের নিচে উদার মাঠে বালুচরে, আর মনের কানায় কানায় ভরে উঠত নিটোল তৃপ্তি। কিন্তু প্রতি লাভের উল্টোপিঠে কিছু-না-কিছু হারাতেই হয়, তাই একলা প্রকৃতির সঙ্গে দহরম মহরম করতে করতে মানুষের সঙ্গে কোলাকুলি, গলাগলি, মাখামাখি করার শক্তির আমার বিকাশ হয়নি তেমন। সব কিছুর মতো মেলামেশার কৌশলটিও বহু চর্চার ফলেই আয়ত্ত হয়। আমার হয়নি চর্চার অভাবে। তাই লোকে অনেক সময়েই ভাবে আমি মানুষকে সত্যি স্নেহ করতে পারি নে। কিন্তু দুঃখের কথা বলব কি, অতুল, যারা আমার এ বদনাম রটায় তারাই আবার শুধু যে পদেপদেই আমার উপর চড়াও হয় তাই নয়— আমার অবসরকে শতচ্ছিদ্র করে দিতে একটুও সংকুচিত হয় না। আমি চেষ্টা করি তাদের নানা দাবী মেটাতে। কিন্তু ঐ যে বললাম, চট্ করে এর-ওর অন্তরঙ্গ হয়ে উঠবার একান্ত অক্ষমতার দরুন পারি নে।...

আমি শুধু প্রকৃতিকেই নয়—মানুষকেও সত্যিই ভালবেসেছি।...

অতুলপ্রসাদ, দিলীপ রায় মন্ত্রমুগ্ধের মত রবীন্দ্রনাথকে দেখছিলেন এবং কবির ভেতরটা থেকে মানুষের ভালবাসার কাঙাল রবীন্দ্রনাথকে অনুভব করছিলেন। পারিপার্শ্বিকতা এবং দেশ জুড়ে যে বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ হচ্ছিল তাতে রবীন্দ্রনাথের সক্রিয় ভূমিকা না থাকায় যে ধরনের মন্তব্য নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছিল, সেদিকটাতে রবীন্দ্রনাথ পীড়িত; আজ মনের মত এমন একজনকে তিনি পেলেন, সেই 'অতুলকে' সব উষ্মা জানিয়ে নিজেকে হালকা করলেন। অতুলপ্রসাদের উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথ গাইলেন,

...... *তোমার বীণা আমার মনোমাঝে*

কখনো শুনি, কখনো ভুলি, কখনো শুনি না যে।
আকাশ যবে শিহরি উঠে গানে
গোপন কথা কহিতে থাকে ধরার কানে কানে—
. . . .

আনন্দিত ও প্রাণ খোলা গানে রবীন্দ্রনাথ সমস্ত পরিবেশকে নিজের মধ্যে নিবিষ্ট করলেন।

অতুলপ্রসাদও সে সুযোগ ছাড়লেন না— তিনি প্রত্যুত্তরে গাইলেন,

আমারে এ আঁধারে
এমন করে চালায় কে গো?
আমি দেখতে নারি, ধরতে নারি,
বুঝতে নারি কিছুই যে গো।
নয়নে নাহি ভাতি,
মনে হয় চিররাতি,
মনে হয় তুমি আমার চিরসাথি;
একবার জ্বালিয়ে বাতি, ঘুচিয়ে রাতি
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো।
এই রাত-কানারে
নয়ন ভ'রে দেখা দে গো।
কাঁদায়ে কাঁটার ক্লেশে
কঠিন এই পথের শেষে
না জানি নিয়ে যাবে কোন্ বিদেশে!
একবার ভালোবেসে, কাছে এসে,
কানে কানে ব'লে দে গো
এ কালারে
কানে কানে ব'লে দে গো।
রয়েছিস যদি সাথে
দারুণ এ আঁধার রাতে,
ক্লান্ত মোরে চালিয়ে নে যা হাতে হাতে।
হস্ত আমার হলেও শিথিল
তুই আমারে ছাড়িস নে গো!
তোর পায়ে পড়ি
তুই আমারে ছাড়িস নে গো।।

বাউল সুরে, পাগলা মনের আকুলতায় অতুলপ্রসাদ তাঁর জীবনের যা কিছু অসার্থকতা, যা কিছু অভিমান—বঞ্চনা-বেদনা সব অঞ্জলি দিয়ে রবীন্দ্রনাথকেই গ্রহণ করলেন—সব পূজা সাঙ্গ করলেন।

দিলীপ রায় শুধু সাক্ষী হয়ে রইলেন—সুরের ও ভাষার মুর্ছনায় এক কবির আত্মনিবেদন আর এক মহাকবির কাছে।

পরের দিন রবীন্দ্রনাথ 'মৃত্যু' প্রসঙ্গ নিয়ে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে আলোচনা করলেন। সে এক অভিনব আত্ম-প্রত্যয়ের ব্যাখা।

অতুলপ্রসাদকে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রাণ খুলে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। ..তরল থেকে গম্ভীর, গম্ভীর থেকে করুণ, করুণ থেকে উদাস—কবিত্ব থেকে গবেষণা, গবেষণা থেকে সমালোচনা—সব রসের রসজ্ঞ রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কথার মধ্য দিয়ে মনের যে স্থানে তার বাঁধনে তা' অনেক উঁচু পর্দায়—সেখানে আমাদের গতায়ত হলেও আমরা আমাদের প্রতিদিনকার চাহিদার অন্ধকারে ডুবে যাই—আলোর সন্ধান পাই না।

অতুলপ্রসাদ তাই আত্ম-সমর্পণে কবির চেতনালোকে সন্তরণের শিক্ষা গ্রহণ করতে উৎসুক।

অতুলপ্রসাদ বললেন, কি জানো দিলীপ, কবি অত্যন্ত স্পর্শকাতর তো, তাই কে, কবে কি বলেছে মনে রেখে ভেবে বসে আছেন যে সবাই তাঁকে ভাবে বে-দরদী, স্নেহহীন। কিন্তু আমি অকুতোভয়ে এজাহার দেবই দেব, আমরা যা দেখেছি যে এমন স্নেহশীল দরদী মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

কথাগুলো বলতে বলতেই অতুলপ্রসাদ সেই গান গাইলেন,

জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পূরব-উজল রবি।
জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারত গৌরব রবি
বঙ্গ মাতার দুলাল রবি
জয় হে কবি!

দিলীপ রায়ও কণ্ঠ দিলেন। সে এক মনোরম ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট হয়ে পুলকিত।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

লখনউ 'হেমন্তনিবাসে' জ্যাঠতুতো দাদা সত্যপ্রসাদ সেন এবং সুবালা মাসি

এলেন অতুলপ্রসাদের কাছে। সুবালা মাসি এই প্রথম লখনউতে এলেন মেয়ে ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে। এসেই অতুলের সংসারে কাজে হাত লাগালেন। অতুলের তদারক করছেন। অতুলপ্রসাদ সারাদিন-রাত পরিশ্রম করছেন—টাকাও উপার্জন করছেন।

সুবালা মাসি জিজ্ঞেস করলেন, অতুল, তুমি তো রাত দিন পরিশ্রম করছ—নিশ্চয় অনেক টাকা উপার্জন কর, কিন্তু এত টাকা তুমি কি কর?

অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত স্বাভাবিক মমতার স্পর্শে মাসিকে আদর করতে করতে বললেন, ...মাসি, আমি পরিশ্রম করি, অর্থ উপার্জন করি সত্য, কিন্তু সব পরিশ্রমই তো টাকা উপার্জনের জন্য করি না। আমার কতরকম কাজ আছে। লোকে সব কাজেই আমাকে ডাকে, ডাকলে তো না যেয়ে পারি না।

অতুলপ্রসাদ সবাইকে নিয়ে থাকতে চান—কিন্তু সবার মধ্যেও আজ হেমকুসুম বাইরে—আলাদা। এটাই তাঁর কাছে গভীর বেদনা, কুণ্ঠার শেষ নেই।

এদিকে পুত্র দিলীপকুমার মাতামহের মৃত্যু সংবাদ বহন করে একা লখনউতে বাবার কাছে এলেন। হেমকুসুম কলকাতায় রয়ে গেলেন।

রাত্রিতে অতুলপ্রসাদ শোবার ঘরে একা। ঘুম-ভাঙ্গানো-মন-ভাঙ্গানো চাঁদের বাঁধ ভাঙ্গা আলো ঘরময় আলোকিত করেছে, যেন বধু এসে অন্ধকার ঘরে জ্বেলে দিল পুরোনো সেই অবহেলিত দীপ, জেগে উঠল আঁচড় দেয়া বেদনা। গুঞ্জন করে অতুলপ্রসাদ সেই পুরোনো দীপের আলোয় এসে গাইলেন,

সবাই কত নূতন কথা কয়।
আমি পুরানো কথা এখনো তো বলা হ'ল না।
সবাই করে নূতন পরিচয়,
আমার আপনজনে এখনো তো জানা হ'ল না।
সবাই ঘোরে দেশবিদেশে নূতন তল্লাশে,
আমি আছি ঘরে ব'সে—
আমার পুরানো বঁধু এখনো তো ঘরে এল না।
সবাই কুড়ায় নূতন কড়ি,
আমি হারাধনের গর্ব করি;
আমার পুরানো দিনের পুরানো কথা এখনো তো পুরানো হ'ল না।
সবার গরব সিংহাসনে,
আমার গরব তপোবনে;
আমার সেই শান্তিমাখা পুরাতনের কোথায় তুলনা?

সবাই কহে, নূতন সুরে গাও,
নূতন প্রেমের নূতন গান শুনাও;
আমি যে গো করতে নারি আর মনের সাথে গানের ছলনা।
গাঁথব কি আর নূতন গাথা,
পরাণে যে পুরানো ব্যথা।
আমার নিত্যনূতন সেই পুরাতন এখনো তো আপন হ'ল না।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অনেকদিন আগে অতুলপ্রসাদ তাঁর পৈত্রিক গ্রামের বাড়ীতে বিদ্যালয় করার জন্য ভেবেছিলেন। সত্যদাদা তা' স্মরণ করিয়ে দিলেন। অতুলপ্রসাদ বিদ্যালয়ের নাম 'গুরুপ্রসাদ রামপ্রসাদ হাইস্কুল' রাখলে টাকা দিতে প্রস্তুত। অবশেষে কিছুটা কাট-ছাট করে 'পঞ্চপল্লী গুরু-রাম হাইস্কুলে'র জন্য সত্যদাদার কাছে টাকা পাঠিয়ে দিলেন।

পুত্র দিলীপকুমার বেকার। কি করা যায়—অতুলপ্রসাদের সে এক চিন্তা। অবশেষে অনেক চিন্তা ভাবনার পর অতুলপ্রসাদ দিলীপকুমারকে বারাণসীতে সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে পাঠিয়েছিলেন—কোন ছাপার প্রেসের কাজ শেখার জন্য। এবং পরে কিছু টাকা সহ প্রেস করে দিয়ে পুত্রকে সেখানে বসাবেন। কিন্তু দিলীপকুমারের তাতে সম্মতি না থাকায় জটিলতা বেড়ে গেল।

দিলীপকুমার ধনী পিতার এবং মমতাময়ী মাতার একমাত্র সন্তান। তাঁর জীবনযাত্রা এবং চলন-বলন সব কিছুর মধ্যে একটা অন্য মানসিকতা গভীরভাবে প্রকট হয়ে উঠত। এবং সেদিকে অতুলপ্রসাদ নজর রাখতেন। 'ভারত সেন্টার' এই নামে একটি জেনারেল মার্চেন্টস স্টোর করে দিয়ে দিলীপকুমারকে তাতে বসালেন। কিন্তু তাতেও দিলীপকুমারের মনে সায় নেই।

অতুলপ্রসাদ ও হেমকুসুমের মানসিক টানা পোড়েনের ফলে একমাত্র পুত্রের প্রতি উভয়ের মমতা ও সহানুভূতির ঘাটতি পড়ত। পিতা মাতার অসহিষ্ণুতা অনেক সময় পুত্রকে নীরবে সহ্য করতে হয়েছে—কার্যত দিলীপকুমার নিজের জীবন গড়ার কোন অনুকূল পরিস্থিতি পান নি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরা'র প্রকাশের খরচাদির ব্যাপারে অতুলপ্রসাদ আবার বিব্রত হলেন। 'উত্তরা' প্রকাশের জন্য যে টাকা তোলার কথা ছিল তা' কার্যতঃ কিছুই হয়নি। সব দায়-দায়িত্ব অতুলপ্রসাদের উপর এসে গেল অনিবার্যভাবে।

Indian Press বকেয়া টাকার জন্য অতুলপ্রসাদকে দায়ী করল। পুরো টাকা পরিশোধ না হলে 'উত্তরা' প্রকাশ বন্ধ থাকবে। এ একটি সমস্যা-সংকটও। অর্থ মেটাতে হবে এবং তার জন্য অবশেষে অতুলপ্রসাদই মেটালেন।

রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যের ধর্ম' প্রবন্ধটি প্রকাশের পর পরই বাঙলা সাহিত্য জগতে তোলপাড়। 'উত্তরা' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র, নরেশ সেনগুপ্ত প্রতিবাদ জানিয়ে পত্র দেন—তা' প্রকাশ হয়। রবীন্দ্রনাথ তা' শুনতে পেয়ে ক্ষুন্ন হন এবং অতুলপ্রসাদকে 'উত্তরা'য় 'জাভাযাত্রীর ডায়েরী' প্রকাশ করতে নিষেধ করে পত্র দেন। অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাকে শ্রদ্ধা করেন; কিন্তু এ বিষয়ে পত্রিকা সম্পাদকের কাজে কোনভাবেই হস্তক্ষেপ করতে রাজি নন। রবীন্দ্রনাথের পত্রটি সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

'উত্তরা'য় প্রকাশিত আধুনিক লেখকদের রচনা প্রকাশের জন্য কলকাতার পাবলিক প্রসিকিউটর রায়বাহাদুর তারকনাথ সাধু 'উত্তরা'র নামে সাহিত্যে অশ্লীলতার অভিযোগ করে মামলা করলেন। যার ফলে অতুলপ্রসাদ, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, সুরেশ চক্রবর্তী জড়িয়ে পড়লেন। অবশেষে রবীন্দ্রনাথের হস্তক্ষেপে তা'মিটে যায়।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯২৯ সাল। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদকে লিখলেন—

..... বরোদা যাবার পথে তোমার দুয়ার ঠেলা দিয়ে যাবার সংকল্প মনে রইলো। যে পর্যন্ত না তুমি মুখভার করো, তোমার ঘর জুড়ে দিন যাপন করবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু একদিকে বরোদায় বক্তৃতার আসর অন্যদিকে 'ভবানীপুর সাহিত্য সম্মিলনী'তে সভাপতির পালা। এই দুয়ের মধ্যবর্তী সময়টি সংকীর্ণ অতএব আগমনী এবং বিজয়ার মধ্যে দীর্ঘ আয়োজন তোমাকে করতে হবে না .....

রবীন্দ্রনাথ ডিসেম্বরে লখনউতে এসেছিলেন, অতুলপ্রসাদের 'হেমন্তনিবাসে' উঠেছিলেন। অতুলপ্রসাদ বিব্রত হয়েছিলেন—ঘরে গৃহিনী নেই—লখনউতে হেমকুসুম আলাদাবাড়ী ভাড়া করে থাকেন। তা'ছাড়া হেমকুসুম অসুস্থ। রবীন্দ্রনাথের পরিচর্যা করবে কে? অবশেষে ভ্রাতৃজয়া ললিতা দাস সব ব্যবস্থা করলেন।

রবীন্দ্রনাথের আগমন সংবাদ বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। 'হেমন্তনিবাস' কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। অতুলপ্রসাদ সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বরণ করলেন। গান গাওয়া, গান নিয়ে চর্চা করা সে এক অভিনব সমাবেশ। অতুলপ্রসাদ নিজে

এবং পাহাড়ী সান্যাল অতুলপ্রসাদের গান শুনিয়ে শুনিয়ে গানের আসর-মজলিসকে প্রাণময় আনন্দোজ্জ্বল রসধারায় রসময় করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথও গান শুনিয়েছিলেন। সেই সময় অতুলপ্রসাদের আমন্ত্রণে রস-সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও রবীন্দ্র-সান্নিধ্য লাভে লখনউ এসেছিলেন।

লখনউতেই রবীন্দ্রনাথ সকালে খাচ্ছেন পায়েস ও ফলের রস আর অতুলপ্রসাদকে দেওয়া হয়েছে তাঁর প্রিয় খাদ্য ওট মিলের পরিজ। রবীন্দ্রনাথ আড়চোখে অতুলপ্রসাদের খাবার দেখে বললেন, অতুল, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান বলে জানতুম। কিন্তু পরমান্ন ফেলে যে ঘোড়ার খাদ্য খায় তাকে আর বুদ্ধিমান বলি কি করে।

অতুলপ্রসাদ প্রাণখোলা হাসি হেসে সমস্ত পরিবেশকে ভরিয়ে দিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ মাঝে মধ্যে হেমকুসুমের জন্য, তার স্বাস্থ্যের খবর জানার জন্য ব্যাকুল হতেন। কিন্তু সুযোগ পেতেন না। হেমকুসুম কিন্তু অতুলপ্রসাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব ঘটনার খবর রাখতেন। সামাজিক কিছু কিছু অনুষ্ঠানে আবার উভয়ের দেখা হয়ে যেত—তখন অতুলপ্রসাদ কাতরভাবে হেমকুসুমের দিকে চেয়ে থাকতেন—পরক্ষণেই আবার নিজেকে সংবরণ করতেন। বেঙ্গলী ক্লাবের একটি অনুষ্ঠানে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত—বসে আছেন নির্ধারিত আসনে। পাশের আসনটিও নির্ধারিত হেমকুসুমের জন্য। বার বার উৎকণ্ঠিত চাউনিতে খুঁজে দেখছেন হেমকুসুম এল বুঝি! কিন্তু হেমকুসুম এলেন না। অতুলপ্রসাদ বেশ অস্বস্তিতে অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে উঠে চলে এলেন বাড়ীতে। বাড়ীতে এসেই অতুলপ্রসাদ শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ শোয়া থেকে উঠেই গান লিখতে লিখতে গাইলেন,

আর কত কাল থাকব বসে দুয়ার খুলে—
বঁধু আমার?
তোমার বিশ্বকাজে আমারে কি রইলে ভুলে—
বঁধু আমার?
বাহিরের উষ্ণ বায়ে মালা যে যায় শুকায়ে,
নয়নের জল বুঝি তাও, বঁধু মোর, যায় ফুরায়ে।
শুধু ডোরখানি হায় কোন্ পরাণে তোমার গলায় দিব তুলে—
বঁধু আমার?

হৃদয়ের শব্দ শুনে চমকি' ভাবি মনে,
ওই বুঝি এল বঁধু ধীরে মৃদুল চরণে!
পরাণে লাগলে ব্যথা ভাবি বুঝি আমায় ছুঁলে।—
বঁধু আমার!
বিরহে দিন কাটিল, কত যে কথা ছিল,
কত যে মনের আশা মন-মাঝে রহিল;
কী লয়ে থাকব বলো তুমি যদি রইলে ভুলে?—
বঁধু আমার!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯৩০ সাল। গান্ধীজীর আহ্বানে সারা দেশ জুড়ে অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। রাজশক্তির অত্যাচার এবং পীড়ন একদিকে, অপরদিকে দেশের নেতাদের জেলে পুরছে— একটা প্রচণ্ড অস্থিরতা এবং জন-জাগরণের দুর্বার বাধাহীন প্রবল উন্মাদনা। যুব শক্তির চিন্তা ও চেতনায় স্বাধীনতা লাভের অনিয়ন্ত্রিত দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার প্রস্তুতি। অতুলপ্রসাদের হৃদয়-মনও উত্তেজনায় ফুট্‌ছে। কিন্তু তাঁকে গেন্ডারা তালুকের মামলার ব্যাপারে আবার বিলেত যেতে হবে। শরীরও তেমন সুস্থ নয় তবুও স্বাস্থ্য উদ্ধার হতে পারে এই আশায় এবং মামলার গুরুত্বে বিলেতে গেলেন—একা। বিলেতে লোকেন পালিতের স্ত্রীর 'গোলডার্স গ্রীনে'র বাড়ীতে উঠলেন।

রবীন্দ্রনাথও রাশিয়া থেকে ফেরার পথে লন্ডনে এসেছিলেন এবং বিড়লাদের আর্যভবনে উঠেছিলেন। লন্ডনে অতুলপ্রসাদ আছেন এ কথা শোনার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে লোক পাঠালেন। সেকি আনন্দ অতুলপ্রসাদের! দ্রুত ছুটে এলেন রবীন্দ্র-প্রণামে। আবার সেই 'মধুর মিলন'। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের দিকে তৃপ্তির হাসি হেসে বন্ধু-অনুজ আত্মীয়কে কাছে টেনে নিলেন। সে এক পরম আরামের উৎসারিত মানসিক আনন্দ, যার ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়— দু'জনের কারো পক্ষে। তাই কথা যতটা না, উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে অন্তঃস্থলের গূঢ় তন্ময়তায় বিভোর হওয়ার আকুলতা গভীর ও আন্তরিক।

রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে তখন চার চিত্র শিল্পী—ললিতমোহন সেন, সুধাংশু রায়চৌধুরী, রণদা উকিল এবং ধীরেন দেববর্মা। রবীন্দ্রনাথ অতুলপ্রসাদের সঙ্গে চার চিত্র শিল্পীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এদিকে লন্ডন প্রবাসী ভারতীয়রা—বিশেষ করে বাঙালীরা অতুলপ্রসাদের

আগমন সংবাদ শুনে মিসেস পালিতের কটেজে এসে হাজির। সেসময় লন্ডনে অতুলপ্রসাদের গানের প্রচারক রণজিৎ সেন উপস্থিত হয়েছেন। তিনি যাঁর গান গেয়ে গেয়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন একটি মানুষের অন্তর নিঙড়ানো সঙ্গীত, সেই মানুষটিকে, সেই অতুলপ্রসাদকে কাছে পেয়ে সেকি তাঁর আনন্দ! অতুলপ্রসাদও ভাবতে পারেননি বিলেতে প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে তাঁর গানের কদর এতখানি! তাই প্রাণ খুলে সমাগতদের নানা প্রশ্নের উত্তর দিলেন—অনুরোধ অনুসারে নিজের গান গেয়ে শোনালেন। রণজিৎ সেন অতুলপ্রসাদের গানের স্বরলিপি সম্বন্ধে জানতে চাইলে অতুলপ্রসাদ সহজভাবে সাবলীলভাবে বলেন,

... **স্বরলিপি হল সুরের ও তালের কাঠামো। নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যেই যে সুরকে আটকে রাখতে হবে তা' তো নয়।** অবশ্য কয়েকটি গান ছাড়া, যেমন আমার জাতীয় সঙ্গীতগুলি। সেগুলি সমবেত কণ্ঠে ভাল শোনায়, তাই সেগুলো নির্দিষ্ট সুরে একভাবে গাইতে হবে যাতে কারো অসুবিধা না হয়। কিন্তু অন্য গানের বেলায়, যেমন খেয়াল, ঠুংরী, গজল ইত্যাদি যেখানে গায়ক একা গাইছেন, সে বন্ধন থাকতে পারে না। **শিল্পী গাইবার সময় গানের ভাবধারাটিকে সম্পূর্ণ বজায় রেখে যদি তাল বিস্তার করেন, সুরের কোন রকম অঙ্গহানি না করে যদি সুরবিহার করেন, তা'হলে সেটা দোষনীয় নয়। শিল্পীর স্বাধীনতা আমি মানি, তবে যথেচ্ছাচার নয়; আমার গানে কালোয়াতী নয়, উচ্ছ্বাস থাকলেও সংযম থাকবে।** শিল্পী যদি পারদর্শী হন, তিনি যদি গলার সূক্ষ্ম কাজ বার করতে পারেন তাতে ক্ষতি নেই, বরং তাতে গানের সৌষ্ঠব আরো বাড়বে। **শুধু স্বরলিপির উপর চোখ বুলিয়ে গাইলে সে গান মেকালিক্যান, প্রাণশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা।...**

এ বিষয়ে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত সচেতন ভাবে রেনুকা দাশগুপ্তাকে একবার বলেছিলেন, ... আমার গানগুলি আমি চলে যাবার পর যা' তা সুরে গাওয়া হবে ভাবলে আমার অসহ্য মনে হয়।

একসময় অতুলপ্রসাদ হিমাংশু দত্ত মশায়কে তাঁর গানের স্বরলিপি করিয়ে দেবার কথাও ভেবেছিলেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ কখনও গাইয়ের অধিকারকে অস্বীকার করেন নি। প্রতিটি গান, তার ভাষা ও সুর সম্পর্কে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত মমত্বপূর্ণ চেতনায় সজাগ ছিলেন। তাঁর গানে যেমন সমবেদনা, আশা, আকুতি, ভালবাসা তার সঙ্গে মিশেছে প্রাণের আবেগ। দুঃখ ও নৈরাশ্য তাঁকে বার বার বিব্রত করেছে কিন্তু তাঁকে নিঃশেষ করতে পারেনি—ব্যথার ব্যথী হয়ে আশার আলোকের সন্ধান করার জন্য সারাটা জীবন তিনি পথিকের মত চলেছেন। সহজ প্রাণখোলা আত্মপ্রকাশের ও আত্মনিবেদনে একান্তভাবে নিজের কথাকে সকলের করে দিয়ে গেছেন অতুলপ্রসাদ তাঁর গানে।

লন্ডনে রণজিৎ সেন অতুলপ্রসাদের গানের প্রসার ও প্রচারে অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত। তাই অতুলপ্রসাদ রণজিৎ সেনের কাছে অকপটে সব কথা বলেছিলেন। রণজিৎ সেন অতুলপ্রসাদের কাছে তাঁর নিজস্ব রুচিমত কয়েকটি গান শুনতে চান। অতুলপ্রসাদ খুবই বিব্রত হন। কিন্তু উপায় নেই—মিসেস পালিতও অতুলপ্রসাদকে অনুরোধ জানান।

অতুলপ্রসাদ গজলের সুরে গাইলেন।

কে গো তুমি বিরহিনী, আমারে সম্ভাষিলে?
এ পোড়া পরাণ-তরে এত ভালোবাসিলে?
কভু হরিত বসনে সাজি',
কুসুমে ভরিয়া সাজি,
মধুমাসে মধু হাসে মম পানে হাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে?
শারদ নিশীথে যবে
বিরহে রহি নীরবে,
পীত কায়ে মৃদু পায়ে মম পাশে আসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে?
কভু বাদলে ঢাকি বয়ান
করিলে গভীর মান,
দামিনীর গুরু ভাষে আঁখি-নীরে ভাসিলে।
কে আমারে সম্ভাষিলে?
আমি শ্যাম, তুমি রাধা,
তাই বঁধু, এত বাধা;
তুমিও হায় উদাসিনী, মোরেও উদাসিলে
কে আমারে সম্ভাষিলে?

রণজিৎ বাবু বললেন, আপনার গানে একটা উদাস ভাব, মনে হয় অনেকটা বিষাদে মাখা।

অতুলপ্রসাদ হাসতে হাসতে বলেন, এ কথা আমাকে স্বদেশের অনেকেই বলেন। কিন্তু আমার গানে কি আনন্দ নেই? দুঃখ ও ব্যথা যেখানে, গভীর আনন্দও সেখানে। এই বলে তিনি গাইলেন,

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধনী-কূলে-কূলে।

কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে;
কখনো ছুটি মোরা ফুল-ফল-হরণে।
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি
তা গেছি ভুলে।
খেলি লুকোচুরি কভু বনে,
মাতি নিধি-সনে কভু রণে,
ভাসি আকাশে নীরদ-সনে
শত পাল তুলে।
যখন থাকি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী—
গহন নদী, নিধি, নভে মেঘ-তরণী।
পুনঃ জাগে হরষে মোদের পরশে
নয়ন খুলে।

এ গানটি নটমল্লারের। তবে নৃত্যের তালে তালে ভাল শোনাবে। আবার শোনো—

ঝরিছে ঝর-ঝর গরজে গর গর
স্বনিছে সর সর শ্রাবণ মাঃ।
তটিনী তর তর, সরসী ভর ভর,
ধরণী থর থর, সিকতা গা।
বিরহী ধর ধর, মানিনী সর সর,
চাহিছে খর খর সুলোচনা।
বালিকা দলে দলে চলিছে গলে গলে,
বিটপীতলে-তলে ঝোলে-ঝুলা।
কৃষক হলে হলে, বলাকা জলে জলে,
নাচিছে ট'লে ট'লে শিখীর পা।
পরান পলে পলে পড়িছে ঢ'লে ঢ'লে,
উঠিছে ব'লে ব'লে তুমি কোথা?

মিসেস পালিতের অনুরোধে বাউলসুরে অতুলপ্রসাদ আবার গাইলেন,

কোথা হে ভবের কাণ্ডারি!
একা আমি জীবন-তরী বাইতে নারি।
ভেবেছিনু নাই-বা এলে
ওহে ভবনদীর মাঝি,

যাব চলে আপন পালে
অবহেলে।
এখন মাঝ-গাঙেতে টুটল দড়ি,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
হে কাণ্ডারী, ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
আমি দেখি নাই হে,
ভাঙা নায়ে উঠল বারি।
আজি এই বিপদকালে
ওহে কাল-খেয়ার মাঝি,
এসো তুমি আমার হালে
আমার পালে।
তোমার টানের তানে নূতন গানে,
আমি শুধু গাইব সারি।
হে কাণ্ডারি, আমি শুধু গাইব সারি
তুমি নাও চালাবে,
আমি শুধু গাইব সারি
চাহি ঢেউয়ের পানে
অভয় প্রাণে গাইব সারি।।

সঙ্গীতের ভাষা ও সুরের নিবিড়তায় কেমন যেন শ্রোতাদের মন-প্রাণ অবশ হয়ে গেল। অতুলপ্রসাদও গান গাইতে গাইতে সেই পরমের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে একাত্ম হয়ে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কয়েকটা দিন বিলেতের জলবায়ু ও আনন্দ-উৎফুল্ল পরিবেশে মনটাকে সতেজ করে অতুলপ্রসাদ স্বদেশে ফিরলেন সরাসরি লখনউতে। লখনউ পৌঁছেই শুনলেন তাঁর ছুট্‌কী অর্থাৎ প্রভার স্বামী শেষাদ্রি আয়েঙ্কার পরলোকে। শোকার্ত প্রভার হাহাকার হৃদয়ের বেদনা নিজের বুকে উদ্বেল হয়ে উঠল— ছোট বোনকে নিজের বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমি আছি ভাবনা করিস নে।

সন্ধ্যায় উপাসনায় বসলেন অতুলপ্রসাদ। কিন্তু স্থির হতে পারছেন না। বার বার প্রভার মুখখানা ভেসে আসছে। কিছুক্ষণ পরে কাতর কণ্ঠে খুব আস্তে আস্তে হৃদয়ের সকল অনুভূতির রসে গাইলেন—

মন রে আমার,
তুই শুধু বেয়ে যা দাঁড়।
হালে যখন আছেন হরি,
তোর যেমন ফাগুন তেমন আষাঢ়।
যখন যুঝবে তরী স্রোতের সনে—
মন রে আমার—
তুই টানিস আরো পরাণ-পণে;
যখন পালে লাগবে হাওয়া
সময় পাবি রে জিরোবার।
মাঝির সেই গানের তানে—
মন রে আমার, মন রে আমার—
চল্ সাথির সনে সমান টানে;
চাস নে রে তুই আকাশ-পানে,
হোক-না ফরসা, হোক-না আঁধার।

কাজ কী জেনে কোথায় যাবি—
মন রে আমার—
কখন ঘাটে নাও ভিড়াবি,
কখন গাঙে লাগবে ভাঁটা,
কখন ছুটে আসবে জোয়ার।
মনে রাখিস নিরবধি—
ভোলা— মন রে আমার, মন রে আমার—
যাঁহারি নাও, তাঁরি নদী;
যে ফেলবে তোরে বানের মুখে
সেই তো তরীর কর্ণধার।।

প্রভার বৈধব্যে অতুলপ্রসাদ খুবই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন। কোর্টে যান না, সামাজিক-সাহিত্য আসরেও প্রায়ই অনুপস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত অতুলপ্রসাদ, সহকর্মিদের ভাবিয়ে তুলেছে। সন্ধ্যায় 'হেমন্তনিবাসে' এসে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন বিশ্বেশ্বরনাথ-অরুণপ্রকাশ। বিশ্বেশ্বরনাথ অতুলপ্রসাদের বেদনা অনুভব করে বলছেন, সবই তাঁর ইচ্ছা। আপনি এ'ভাবে স্তব্ধ হয়ে গেলে যে হারিয়ে যাবো মিঃ সেন।

অতুলপ্রসাদ সজল আঁখিতে ওঁদের দিকে তাকালেন—ঘরের প্রতিটি সাজানো গোছানো জিনিষের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভা এল—দাদার কাছে যাঁরা এসেছেন তাঁদের জলখাবার দিলেন। প্রভা যেন মূর্তিমতী বেদনা। অতুলপ্রসাদের অন্তর্জীবনে ও বহির্জীবনে যে বেদনার তোলপাড় ঘটছে তাকে সমালানো খুবই কষ্টকর। হেমকুসুম থেকেও নেই, এ যে কত বড় কঠিন দুঃখ তা বোঝানো যায় না। অতুলপ্রসাদ যে মমতার জন্য, প্রেমের জন্য কাঙাল। তাঁর সমস্ত জীবন-ধারায় হেমকুসুমের জন্য যে আর্তি তার পরিমাপ কিভাবে, কাকে জানাবেন!

সব পেয়েছেন তিনি, কিন্তু সবই ব্যর্থ হয়েছে প্রিয়জনের সীমাহীন বঞ্চনায়। তাই তো অরুণপ্রকাশের দিকে তাকিয়ে অতুলপ্রসাদ গাইলেন,

হৃদে জাগে শুধু বিষাদরাগিণী,
কেমনে গাহিব হরষ-গান?
আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।
সংসারের মহোৎসবে কভু এই ক্ষীণ কণ্ঠ
আপন উল্লাসে গাহিত গান;
এবে নয়নে অশ্রু, লয়ে হাসির ভান
কেমনে গাহিব হরষ-গান?—
আমায় বোলো না, বোলো না গাহিতে গান।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এর পর থেকেই অতুলপ্রসাদের অসুস্থতা মাঝে মাঝেই দেখা দিত। ডাক্তারের পরামর্শে খাবার দাবার নিয়মে বাঁধা। কাজের ভারও অনেকটা কমিয়ে দিয়েছেন। বন্ধু বিরাজ গুপ্ত প্রায়ই অতুলপ্রসাদের খোঁজ খবর নিতেন। 'হেমন্তনিবাসে'র সেই আমেজ যেন তেমন আর নেই। তবুও যাঁরা আসতেন তাঁরা নানা হালকা গল্প ও লখনউ-এর সামাজিক জীবনের নানা ঘটনা বলে তাঁকে হাল্‌কা কবতে চাইতেন।

কিন্তু অতুলপ্রসাদ বিশ্রাম চাইলেও যে তাঁর বিশ্রাম নেবার সুযোগ কোথায়! সেন সাহেব, ভাইদাদাকে ছাড়া লখনউ-এর কোন বড় কাজ, সকলের জন্য কোন কাজ যে সম্ভব নয়। তাই 'হেমন্তনিবাসে'র অতুলপ্রসাদের আহ্বান আসে নানাবিধ কাজের সহযোগী, নেতৃত্ব দেবার। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যা সমাধানে, নীতি নির্ধারণে, রাজনৈতিক সভা-সমিতিতে উপস্থিত থাকার জন্য, সেবাশ্রমের অগ্রগতি ও সমস্যার সমাধানের জন্য—আহ্বান আসে, অনুরোধ আসে। অতুলপ্রসাদ চুপ করে থাকতে পারেন না—ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে বিশ্রাম গ্রহণের কথা বলে তাঁদের কাতর অনুনয়কে ফিরিয়ে দিতে পারেন না। ছুটে যান, তাঁদের সঙ্গ দেন।

এদিকে ভারতের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন-এর ঢেউ সর্বত্র প্রবলভাবে আছাড় খেয়ে খেয়ে তছ্ নছ্ করছে সমস্ত রকম ভাবনাকে। 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি', 'গোলটেবিল বৈঠক' জাতীয় জীবনের প্রতিটি স্পন্দনকে প্রভাবিত করছে অনিবার্যভাবে। দেশের নেতৃস্থানীয় মানুষ ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রূপকল্পনায় গভীরভাবে চিন্তিত। গান্ধীজীর লবণ আইন ভঙ্গ—দণ্ডি অভিযান—গ্রামবাসীদের বিলেতি বস্ত্র ত্যাগ, খদ্দর পরিধান করার আহ্বান, নিজেদের আদালত প্রতিষ্ঠা, গভর্নমেন্টের সহিত সকল প্রকার সহযোগিতা বর্জন করা—গান্ধীজীর গ্রেপ্তার—আরউইনের চুক্তি 'ভারতের পূর্ণ-স্বাধীনতা' স্বীকার, আইন অমান্য বন্ধ করা আরউইনের প্রস্তাব, লর্ড উইলিংডন ভারতে এসেই দমননীতির প্রবর্তন—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে গান্ধীজী-মদনমোহন মালব্য-সরোজিনী নাইডু সহ ইংল্যান্ডে উপস্থিতি—বৈঠকের শুরুতে গান্ধীজী নিজেকে ভারতের চল্লিশ কোটী নরনারীর প্রতিনিধি ঘোষণায় মিঃ মহম্মদ আলি জিন্নার আপত্তি—মিঃ আম্বেদকরের আপত্তি—গান্ধীজী ভারতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটা মিলনের চেষ্টা করার জন্য মিঃ জিন্নাকে Blank cheque দিয়ে অনুরোধ—মিঃ জিন্নার দাবী মানা অসম্ভব—অবশেষে গোলটেবিল বৈঠক ভেঙ্গে গেল।

দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের বিপর্যিত ঘটনাবলী ভারতের নেতৃবৃন্দকে অস্থির অসহিষ্ণু করে তুলছে অনবরত। অতুলপ্রসাদকে ঘিরে উপরোক্ত রাজনৈতিক ঘটনার উত্থানপতনের বিশ্লেষণ এবং লখনউ সহরের হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের গড়ে উঠা স্বতঃস্ফূর্ত মিলনবোধ যাতে এতটুকু চিড় না ধরে তার জন্য অতুলপ্রসাদ প্রতিদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন।

জহরলাল নেহেরু দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ইংরেজের অশোভন চালাকির সমুচিত জবাব দেবার জন্য সংগঠিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করছেন—অপেক্ষা শুধু গান্ধীজীর ভারতে আসা।

গান্ধীজী ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বোম্বেতে পৌঁছনোর অব্যবহিত পরে জহরলাল আইন-অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন। সে এক প্রচণ্ডতম প্রবাহ, দেশজুড়ে ইংরেজের শঠতার জবাবে ক্ষিপ্ত ভারতবাসী হিন্দু-মুসলমান একই সঙ্গে।

ইংরেজও চুপ করে নেই, সমানে দমননীতি চালাতে লাগল, অর্ডিন্যান্সের পর অর্ডিন্যান্স জারী করে বিধ্বস্ত ভারতবর্ষকে ক্ষিপ্ত করে তুলল—বন্দী হলেন মতিলাল নেহেরু-জওহরলাল নেহেরু এবং আরো অনেকে,—রাখা হল লখনউ জেলে।

অতুলপ্রসাদ লখনউ জেলে নিজে গিয়ে তাঁদের থাকার ও খাবারের ব্যাপারে

খোঁজ খবর নিলেন—নিজের বাড়ীর কার্পেট, চাদর-বিছানা এবং আলাদা বাসনপত্র ব্যবহারের জন্য দিয়ে এলেন। সারাদিন নানাবিধ কাজের মধ্যে নেতাদের বন্দী জীবন এবং ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশের বিচ্ছিন্ন মানসিকতা অতুলপ্রসাদকে গভীরভাবে পীড়া দিয়েছিল। সেই সময় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন অরুণা গাঙ্গুলি। (পরবর্তী সময়ে আসফ আলিকে বিবাহ করে অরুণা আসফ আলি হন)। পাঞ্জাবের অন্তর্গত কালকার বাঙালি ব্রাহ্ম পরিবারের অরুণা গাঙ্গুলি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে রাজনৈতিক চিন্তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি হেমকুসুমের সঙ্গেও দেখা করেন। অরুণা গাঙ্গুলি অতুলপ্রসাদের উপাসনা সভায় উপস্থিত হলেন। অতুলপ্রসাদ উপাসনান্তে গাইলেন—

তব চরণতলে সদা রাখিয়ো মোরে;
দীনবন্ধু করুণাসিন্ধু, শান্তি-সুধা দিয়ো চিত্ত-চকোরে
কাঁদিছে চিত 'নাথ' 'নাথ' বলি
সংসার-কান্তারে সুপথ ভুলি;
তোমার অভয় শরণ আজি মাগি—
দেখাও পথ আজি তিমিরে।
মন্দ ভালো মম সব তুমি নিয়ো,
দুঃখী-জন-হিত সাধিতে দিয়ো;
হে নারায়ণ, দীন রূপে আসিয়ো
বাঁধিয়ো সবে মম প্রেমডোরে।

গানটি শোনার পর অরুণা গাঙ্গুলির চোখ দুটো পরমের চরণে নিবেদনে নিবদ্ধ। অতুলপ্রসাদও নিবেদিত। ব্রাহ্ম পরিবারের প্রত্যেক রবিবারের উপাসনার সময়টুকু অরুণা গাঙ্গুলি রাজনৈতিক কর্মধারা বাইরে রাখতেন। ব্যস্ত 'ভাইদাদা'র (সাহানা দেবীর বন্ধু অরুণা গাঙ্গুলি) কণ্ঠে উপাসনায় যে মন্ত্র উচ্চারিত হ'ল তা' সারাজীবন তাঁকে দুর্গম পথে ভরসা দিয়েছিল। অভাবনীয় সাহসিকতায় প্রজ্বলিত শিখার প্রতিশ্রুতি নিয়ে অরুণা গাঙ্গুলি সেদিন লখনউ ত্যাগ করেছিলেন। পাঞ্জাবের দৃঢ় মাটির আস্বাদন আর বাঙলার কোমল স্নেহ-সিক্ত মানসিকতা এ দুয়ের মিলনে অরুণা গাঙ্গুলি নিজেকে তৈরী করেছেন। আবুলকালাম আজাদের খুবই ঘনিষ্ঠ অরুণা গাঙ্গুলি কখনো কোনদিন কারো কাছে কোন প্রকার ভাবনাকে বিকিয়ে দেন নি। এমন কী গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েও অরুণা গাঙ্গুলি গান্ধীজীর সব নির্দেশ মানতে পারেননি। লিবার‍্যাল ফেডারেশনের নেতা অতুলপ্রসাদ। অতুলপ্রসাদের সঙ্গে ফেডারেশনের চিন্তা ও পথ সম্পর্কেও অরুণা গাঙ্গুলি সেসময় ব্যাপক আলোচনা করেছেন।

এমনি এক সন্ধ্যায় জজ যতীন বসু এবং বন্ধু বিরাজ গুপ্ত 'হেমন্তনিবাসে' এলেন। অতুলপ্রসাদ কিছুক্ষণ আগেই লখনউ জেলে জওহরলালের সঙ্গে কথা বলে এলেন। যতীন-বাবু এবং বিরাজবাবু উভয়ে ভারতের রাজনৈতিক কর্মধারা এবং পরবর্তী কি উপায়ে দমনমূলক অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত রাখা যায়, নেতৃত্বের ভাবনা চিন্তা কি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করলেন।

অতুলপ্রসাদ বললেন, বিরাজবাবু, এ সম্পর্কে আমার চিন্তা একটি গানে রেখেছিলাম, নিজে কয়েকবার গেয়েছিও। আজ সেই গানটি গাইছি, শুনুন—

খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় ব'সে।
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি,
দুয়ারখানি দে রে তুলি।
বুকের জ্বালা যাব ভুলি
মেঘ-পরশে-শীতল মেঘের পরশে।
থাকবে নীচে ধরার ধূলি;
ভুলব পরের বচনগুলি।
বলব আবার আপন বুলি
মন-হরষে-আপন মনের হরষে।

গান শেষ করেই তিনি বললেন, আমাদের এখন সবচেয়ে প্রয়োজন লখনউ-এর হিন্দু-মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যে মিলন ও ঐক্য আছে, তাকে কোনভাবেই যাতে কিউ বিষিয়ে না দেয় তার জন্য সজাগ থাকা। ইংরেজ এই বিষিয়ে দেবার কাজে পটু। তাই আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দদের ঘরের দুয়ার খুলে বেরিয়ে আসতে হবে; যেখানে প্রতিদিনের দেনা-পাওনার সামান্যতম অজুহাতে প্রলয় কাণ্ড না বাঁধে, সেদিকে গভীর মনোনিবেশ করা। অতুলপ্রসাদ সে সময় লখনউ-এর সর্বত্র নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায়-নেতাদের সঙ্গে গভীরভাবে যোগাযোগ রাখছিলেন—হিন্দু-মুসলমান যুবকদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতবর্ষের ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ছবিটি সামনে তুলে ধরতে ছোটছোট সভা-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করছেন নিজের খরচে।

অতুলপ্রসাদ মানুষের দুঃখ দেখলেই তা' নিরসনে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এটা তাঁর স্বাভাবিক মানসিকতা। তিনি গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা করতেন, ভালবাসতেন। কিন্তু তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে গভীরভাবে পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার আগে—আমাদের নিজেদের

রেষারেষির শেকল ভাঙ্গা দরকার। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ সংগঠিত উত্তেজনা উদ্রেকবাহী-ভাবনাকে সামাল না দিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে আন্দোলন কোনভাবেই ভারতের পক্ষে শোভন নয়।

পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।

. . . .

হা রে মুর্খ, হারে অন্ধ,
ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব!
দেশের শক্তি করিস মন্দ—
তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই—
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই!
তাই মন্দিরে মসজিদে লড়াই!
প্রবেশ ক'রে দেখ রে দু ভাই
অন্দরে যে একজনাই।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ছোট ছোট সভা-সমিতি করে হিন্দু-মুসলমান যুবকদের কাছে অতুলপ্রসাদ দু'হাত প্রসারিত করে বুক ভরা আকুলতায় কাতর অনুনয়ে আত্ম-উদ্‌বোধনের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দেবার জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আবার 'হেমন্তনিবাসে' দেশের জন্য নিজের জন্য উপাসনা করতেন। বন্ধুদের কাছে রাষ্ট্র নায়কদের গতিবিধি সম্পর্কে আলোচনার পর একান্তে ঘরের আলো নিবিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ গানের অঞ্জলি দান করতেন পরমের কাছে। প্রভা দাদার কাছে বসে উপাসনায় অংশ গ্রহণ করতেন।

অতুলপ্রসাদ দীনবন্ধুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করে গাইলেন,

তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর কোন মুখে?
শাসন তোমার যতই গুরু, ততই টেনে লও বুকে।
সুখ পেলে দিই অবহেলা,
শরণ মাগি দুখের বেলা;
তবু ফেলে যাও না চলে, সদাই থাক সম্মুখে।
প্রতিদিনের অশেষ যতন
ভুলায়ে দেয় ক্ষণিক বেদন;

নিত্য আছি ডুবিয়ে তাই পাসরি প্রেমসিন্ধুকে।
সুখের পিছে মরি ঘুরে,
তাই তো সুখ পালায় দূরে;
সে আনন্দ, ওরে অন্ধ, বন্ধ মনের সিন্দুকে।
ভুলে যাই সবাই আমার,
নই তো ভিন্ন আমি সবার;
দশের মুখে হাসি রেখে কাঁদব আমি কোন্ দুখে?
ভবের পথে শূন্য থালি,
বেড়াই ঘুরে দীন কাঙালি।
দৈন্য আমার ঘুচবে যবে পাব দীনবন্ধুকে।

প্রভার চোখে জল। অতুলপ্রসাদ প্রভাকে ধরলেন—প্রভা হঠাৎ চমকে গেলেন দাদার গা জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি উঠে বলল, দাদা তোমার জ্বর, এসো শোবে।

বেশ কিছুদিন যাবৎ অতুলপ্রসাদের শরীর ভাল যাচ্ছে না। কিন্তু তার অবসর নেবার সময় নেই। প্রভা দাদাকে সেবা করতে করতে বলল, দাদা আমি বৌদির কাছে যাবো তাকে এখানে আনার জন্য—

মুদিত নয়নে অতুলপ্রসাদ কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, ...না ছুটকী, ওকে বিব্রত করিসনে। তা'ছাড়া ও বড় জেদী, তোকে হয়তো অপমান করবে। দরকার নেই। একটু পরে বললেন যা, তুই শো গিয়ে।

অতুলপ্রসাদের চোখ দুটো ছল্ ছল্ করছে। হেমকুসুমের জন্য মনে মোচড় দিচ্ছে—এপাশ ওপাশ করতে করতে নানা সুখ-স্মৃতির টুক্‌রো টুক্‌রো ঘটনার নেশা যেন ঘিরে রয়েছে।

অতুলপ্রসাদ একটু আনমনা হয়ে খুব আস্তে আস্তে গাইলেন—

ব'লে দে, ওরে নিঠুর মনের মালী,
কেন তুই কাঁটা-বনে ফুল ফোটালি?
এ ফুলে হয় না মালা,
শুধু তায় ভরে ডালা;
মিছে তুই কাঁটার ঘায়ে হাত রাঙালি।
মিছে তুই বঁধুর আশে দিন খোয়ালি।
ভবের এ ফুলের মেলায়
গেল দিন অবহেলায়;

মিছে তুই প্রেমের পাতে ফুল কুড়ালি।
লয়ে তোর ভরা সাজি
ফিরে যা ঘরে আজি,
কেন তুই এমন ভুলে মন ভুলালি?
ডালি আজ কাহার পায়ে করবি খালি?

স্বগত মনে বলছেন,—হেম, তুমি কেন আমায় ছেড়ে! তোমার কি আমার জন্য কাতরতা আসে না?

হেম, কী হবে অভিমান করে; দিন তো ফুরিয়ে এসেছে—এখনও কী তোমার রাগ কমেনি? এমনি নানা চিন্তা-ভাবনায় অতুলপ্রসাদ রাত্রির কোলে হারিয়ে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ভোরে উঠেই বিছানায় বসে অতুলপ্রসাদ কাতরভাবে প্রার্থনায় ডাকলেন,

হরি, তোমারে পাব কেমনে?
যেতেছে সময়, ওহে দয়াময়, দয়া করো দীনজনে।
ভুলেছিনু যবে ভবের খেলায়
হারাইনু কত সুদিন হেলায়,
বুঝি নাই প্রভু, চলিবে না কভু তোমার চরণ বিনে।
বুঝাইলে হরি, বুঝালে এবার,
সবাকার হতে তুমি আপনার;
তোমারে পাইলে সরস সংসার, বিরস তোমা বিহনে।
তাপিত চিতে এ মিনতি করি,
লুকাইয়ে আর থাকিয়ো না হরি,
দেখিলে তো তুমি তোমারে পাসরি কাটাই দিন কেমনে?
কাটো হে আমার স্বার্থের পাশ,
তব প্রিয় কাজে করো মোরে দাস,
সাধো এ জীবনে তব অভিলাষ হরষে কিম্বা বেদনে।

শরীর খুবই ভেঙ্গেছে। প্রভা দাদার কথা কলকাতায় বোনেদের সব জানালেন। কিরণ পত্র লিখল—দাদা, তুমি আমার কাছে এসো, তোমার ভালভাবে চিকিৎসা দরকার, আমি তোমার সেবা করব। তুমি চলে এস।

কোর্টের কাজ কমিয়ে দিলেন অতুলপ্রসাদ। জুনিয়রদের হাতে কাজগুলি দিয়ে দিলেন।

এদিকে প্রতিদিনকার প্রিয় বন্ধুরা—হেমন্ত ঘোষ, কিরণ ঘোষাল, গোলাপচাঁদ শ্রীমল, মিস্টার টমাস, বীরেন্দ্রনাথ, মুরাশীষ হোসেন একে একে কাজের টানে অন্যত্র চলে গেছেন। প্রায় নিঃসঙ্গতা—ঘরে বাইরে।

স্থির করলেন কলকাতায় যাবেন। মুন্সী জানকীপ্রসাদকে সব বুঝিয়ে দিয়ে অতুলপ্রসাদ কলকাতায় গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ কলকাতায় বোন কিরণের বাড়ীতে উঠলেন। ডাঃ নীলরতন সরকারকে দেখানো হ'ল। ডাঃ সরকারের নির্দেশ অনুসারে গান গাওয়া বন্ধ, পুরো বিশ্রাম।

এ যে বিষম শাস্তি! অতুলপ্রসাদ কলকাতায় আসার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। যাঁরা দেখা করতে আসছেন তাদের কুশলসংবাদ জানতে চান—এবং আরো আরো নিকট জনদের, সাহিত্য আসরের সংবাদাদি জানার উৎসুক আগ্রহ।

কিন্তু যাঁরা আসতেন তাঁরা গান শুনতেই আসতেন। অতুলপ্রসাদের গান তাঁর নিজ কণ্ঠে শোনা—এ যে পরম সুযোগ। অতুলপ্রসাদও গান ছাড়া থাকবেন কি করে? তাই মাঝে মাঝে ছলনার আশ্রয় নিয়ে কিরণের অন্যত্র ব্যস্ত থাকার সুযোগে আস্তে আস্তে সমাগতদের গান শোনাতেন। কণ্ঠের স্বর অত্যন্ত ছোট করে তিনি নিবেদিত প্রাণের অঞ্জলি দিয়ে গাইলেন,

আমি তোমার ধরব না হাত,
নাথ, তুমি আমায় ধরো।
যারা আমায় টানে পিছে
তারা আমা হতেও বড়ো।
শক্ত ক'রে ধরো হে নাথ,
শক্ত ক'রে আমায় ধরো।
যদি কভু পালিয়ে আসি
তারা কেমন ক'রে বাজায় বাঁশি!
বাজাও তোমার মোহন বীণা
আরো মনোহর।
তাদের চেয়েও মধুর সুরে
বাজাও মনোহর।।

ক্লান্ত অথচ ভাব-তন্ময়তায় উত্তেজিত অতুলপ্রসাদ সকল চেতনাকে এক করে আবার মৃদু কণ্ঠে রামপ্রসাদী সুরে গাইলেন,

আর, 'দে দে' বলব না তোরে।
যা দিলি তুই কাঙাল রাণী,
তাই তো আবার নিলি হ'রে।
নে মা, আমার ধন পদ মান
জীবন-ডালা শূন্য করে;
আমি শূন্য ডালা দিব তব পায়
যদি পূজার মালা না দিস মোরে।
দিস যদি মা, দুঃখ বিপদ
তুলে দে মা, মাথার 'পরে,
যখন বোঝা হবে ভারী
তুই নাবাবি আপন করে।
তোর নেবার মতো নই মা আমি,
তবু কেন এ দীনের দ্বারে?
তুই মা আমার পরশমণি,
আদরে নে পরশ ক'রে।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯৩১ সাল। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন চলছে। অমল হোম জানতে পারলেন অতুলপ্রসাদ কলকাতায়। ছুটলেন বালিগঞ্জে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করতে এবং রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে। অমল হোমের কাছে রবীন্দ্রনাথের জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের কথা শুনে অতুলপ্রসাদের সে কী আহ্লাদ, সে কী আনন্দ! অমল হোমকে বললেন, নিশ্চয় যাবো—এমন সুযোগ আবার কবে পাবো! অবশ্যই যাবো।

আপনাকে কিছু বলতেও হবে—অমল হোম অনুরোধ করলেন।

অতুলপ্রসাদ ঘরের এদিক ওদিক তাকালেন—তারপর আস্তে আস্তে বললেন, তা' বলব, কিন্তু কিরণ শুনতে পারলে আমায় যেতে দেবে না—ডাঃ সরকারের কড়া নির্দেশ।

অমল হোম কিছুটা হোঁচট্ খেলেন—অতুলপ্রসাদের অসহায় এবং অসুস্থতার কথা ভেবে বললেন, তবে থাক অতুলদা। অতটা Risk না নেওয়াই ভাল।

তা'হয় না অমল, রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের আয়োজন করছ

তোমরা—আমি কলকাতায় আছি, যাব না! এটা কি করে সম্ভব। অতুলপ্রসাদ বেশ অসহায়ভাবে কথাগুলো বললেন।

যথাসময়ে প্রিয়জনদের অনুরোধ না শুনে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্র-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে হাজির হলেন। সে কী আনন্দ তাঁর! একটি ছোট ভাষণ দিলেন এবং রবি-বন্দনা করে ধীরে ধীরে গাইলেন ঃ

গাহো রবীন্দ্রজয়ন্তী-বন্দন,
ভকত জনে আনো পুষ্প চন্দন।
ব[illegible] বরেণ্যে, জগতমান্যে,
মুখর যাঁর গানে কাব্যকানন।
সাহিত্য-আকাশে ভাতে যত রবি,
ইন্দ্র সবাকার, তুমি ওহে কবি,
গৌড় গৌরবে তোমার সৌরভে
বিশ্ব বিমোহিত, মুগ্ধ গুণীজন।
হে অমর কবি, থাকো মরলোকে
[illegible] বহু আরো মোদের সম্মুখে;
বঙ্গবীণা আরো বাজাও গুণী,
মহান্ মোহন বাণী কহো শুনি।
রচো এ ভুবনে 'শান্তিনিকেতন'
পূর্ণ হউক তব পুণ্যসাধন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কলকাতা ছেড়ে আবার লখনউতে এলেন অতুলপ্রসাদ। আবার শুরু হল কর্ম্মমুখর ব্যস্ততার জীবন।

অতুলপ্রসাদ আউধ বার অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয়, যিনি সেই বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের পদে ভূষিত হলেন—জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেই পদে আসীন থেকে বার অ্যাসোসিয়েশনের এবং কাউন্সিলের মর্যাদা ও বিশ্বাসযোগ্যতাকে সকলের কাছে বিদিত করেছিলেন। অতুলপ্রসাদ নিরপেক্ষভাবে আইন ব্যবসায়ীদের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতেন। এক সময়ে আইন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে চিফ্ জাস্টিসের বিরোধ গভীর হ'ল। নানা কারণে আইন ব্যবসায়ীগণ চিফ্ জাস্টিসের কাজে সন্দেহ প্রকাশ করতেন—পক্ষপাতিত্বের দোষে প্রায়শই বিচারের রায়ে লখনউ-এর কোর্টের বদনাম হচ্ছিল। বিরোদ যখন তীব্র

এবং নানাভাবে আইনের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ হবার পথে, তখন একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও অতুলপ্রসাদকে নেতৃত্ব নিতে হয়েছিল। কর্তব্যের খাতিরে বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের মর্যাদায় তিনি যে সাহস, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা দেখিয়েছিলেন তাতে সারা উত্তরপ্রদেশে এ. পি. সেনের নামে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বহু কৃতি আইনব্যবসায়ী ব্যক্তিগতভাবে অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্য এলাহাবাদ থেকে লখনউতে আসতেন 'হেমন্তনিবাসে' কিম্বা কোর্টে। এলাহাবাদের লালগোপাল মুখার্জী, সুরেন সেন, পিয়ারীলাল ব্যানার্জী, সতীশ ব্যানার্জী, তেজবাহাদুর সপ্রু, মতিলাল নেহেরু, কৈলাসনাথ কাট্‌জু প্রভৃতি বাঘা বাঘা আইনবিদ্ ও ব্যবসায়ীগণ এ. পি. সেনের দুর্জয় সাহস ও কর্তব্যপরায়ণতার ভূয়সী প্রশংসা করে কখনো সাক্ষাতে কখনো বা পত্রে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ৭০ বছর জন্ম-জয়ন্তী বড় আকারে করার ব্যাপারে অমল হোমের উদ্যোগ অতুলপ্রসাদ খুবই আন্তরিকভাবে সমর্থন করেন। কলকাতার টাউনহলে রবীন্দ্র সংবর্ধনা! লখনউ থেকে বার বার পত্র লিখে অতুলপ্রসাদ অমল হোমকে উৎসাহিত করছেন—কতদূর কী কী হবে জানার জন্য।

প্রবাসী বাঙালিরা যাতে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা উৎসবে যোগদান করতে পারেন তার জন্য অমল হোম সেবছর প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য সম্মেলন সভাপতি স্যর লালগোপাল মুখোপাধ্যায়'কে অনুরোধপত্র দিয়েছিলেন। এ'খবর জানা মাত্র অতুলপ্রসাদ সোৎসাহে নিজে লালগোপাল মুখোপাধ্যায়কে অমল হোমের অনুরোধ বিবেচনা করার জন্য পত্র দিলেন এবং নিজের সম্মতিও জানিয়ে দিলেন; এবং 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশ চক্রবর্তীকে সম্মেলনের সদস্যদের নাম ঠিকানা অমল হোমকে পাঠাবার জন্য টেলিগ্রাম করলেন।

রবীন্দ্রজয়ন্তীর উৎসব কার্যালয় টাউনহলে। প্রদর্শনীর স্টল বাঁধা হচ্ছে, চিত্রশালা সাজানো হচ্ছে—এমনি এক সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদ সেখানে হাজির। অমল হোম অতুলপ্রসাদকে দেখে আনন্দে উৎফুল্ল। অতুলপ্রসাদ বললেন, অমল, রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে যোগদান করার জন্য আমার দু'জন মারাঠী বন্ধু সঙ্গে আছেন—'নটীর পূজা'র অভিনয়ের প্রবেশপত্র তাদের দরকার। কি করা যায়! অমল হোমের পক্ষে টিকিট সংগ্রহ করে দেওয়া সাধ্যাতীত। অতুলপ্রসাদ তা' অনুভব করে অমল হোমকে আশ্বস্ত করলেন।

২৭ ডিসেম্বর—রবীন্দ্র-জয়ন্তীর কবি সংবর্ধনা। কাতারে কাতারে দেশ-বিদেশ থেকে মান্য গুণীজনের সমাগম শুরু হয়েছে, স্বেচ্ছাসেবকরা নির্দিষ্ট আসনে

সদস্যদের বসবার সহযোগিতা করছেন। সহসা অতুলপ্রসাদ দ্রুত অমল হোমের কাছে এসে বললেন, অমল আমি কি আমার সিট আর-একজনের সঙ্গে বদলিয়ে নিতে পারি?

...আপনার এত সামনে সিট তা' ছেড়ে দূরে চলে যেতে চাইছেন কেন? অমল হোম বললেন,

...আমার একটি বন্ধুর পাশে বসতে চাই—অতুলপ্রসাদ বিনীত হাস্যোজ্জ্বল কণ্ঠে বললেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

শুধু কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে অতুলপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন তা' নয়। এলাহাবাদে এবং দিল্লীতে অতুলপ্রসাদের উদ্যোগে রবীন্দ্র-জন্ম-উৎসব খুবই আন্তরিক পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়। দু'জায়গাতেই—এলাহাবাদে এবং দিল্লীতে—অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য লিখিতভাবে পাঠ করেন। এলাহাবাদে অতুলপ্রসাদ বলেন,

রবীন্দ্রনাথের ভক্তবৃন্দ,

অদ্যকার রবীন্দ্রজয়ন্তী উৎসবের সভাপতির উচ্চাসনে বসাইয়া আপনারা যে অভাবনীয়ভাবে আমাকে সম্মানিত করিলেন তজ্জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। আজ প্রাতে এলাহাবাদ আসার পর বন্ধুবর জাস্টিস্ লালগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে জানাইলেন যে আমাকে এই পদ গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্ব হইতে তাই প্রস্তুত হইয়া আসিতে পারি নাই। ক্ষমা করিবেন।

আপনারা সকলেই জানেন যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা অসামান্য ও বহুমুখী। তিনি বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিলে বেশি অত্যুক্তি হয় না। গদ্য-সাহিত্যেও তাঁহার স্থান কাহারও নিম্নে নহে। প্রবন্ধ, সমালোচনা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। বৈচিত্র্যে তাঁহার সমকক্ষ সাহিত্যিক বোধহয় আজকাল জগতে কেহই নাই। তিনি অশ্রান্ত কর্মী, জননেতা, চিন্তানায়ক, বিশ্বের মহান বার্তাবাহক। বিধাতা যেন অন্যমনস্ক হইয়া তাঁহার বিচিত্র দান-সম্ভার রবীন্দ্রনাথকে নিঃশেষ করিয়া ঢালিয়া দিয়াছেন; মনে হয় যেন তাঁর সম্বন্ধে বিধাতা একটু পক্ষপাতিত্ব করিয়াছেন। বাহিরে এবং ভিতরে কোন দিক দিয়াই তিনি বঞ্চিত হন নাই। বাল্যে, যৌবনে, প্রৌঢ়াবস্থায়, এমনকি বার্ধক্যেও তাঁহার মত সুদর্শন পুরুষ খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার চেহারা দেখিলেই লোক আকৃষ্ট হয়। তাঁহার হস্তলিপি এত সুন্দর যে আজ শিক্ষিত বাঙালিরা অনেকেই তাঁহার হস্তাক্ষর অনুকরণ করেন দেখিতে পাই।

আমি আজিকার সভায় কবির এমন দু'একটি কুশলতার কথা বলিতে চাই যা হয়ত সাধারণের কাছে বিদিত নয়। আমি তাঁহার আলাপ-কুশলতার কথা কিছু বলিব। আমি তাঁহার মত সুনিপুণ কথা-কুশলী পুরুষ জীবনে দেখি নাই। এমন সর্বাঙ্গসুন্দর কথোপকথন জগতে বিরল। তাঁহার আলাপ তাঁহার গানের চেয়ে কোনও অংশে কম চিত্তাকর্ষক নয়।

প্রথমে তাঁহার আলাপ-মাধুর্যের নজিরের দিকটার কথা বলি।

তিনি সুকণ্ঠ। তাঁহার আলাপের কণ্ঠস্বরেই শ্রবণ তৃপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন তাঁহার কণ্ঠস্বর একটু মেয়েলী, কেননা তা গুরুগম্ভীর নয়। কিন্তু গুরুগম্ভীর না হইলেও বড় শ্রুতিমধুর।

তাঁহার শব্দোচ্চারণ অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট। তিনি যখন দ্রুত কিংবা অনর্গল কথা কহেন তখনও প্রত্যেকটি কথা খুব স্পষ্ট শোনা যায় ও বোঝা যায়। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গীও বড় চমৎকার। ইংরাজীতে যাকে modulation বলে তাঁহার কণ্ঠস্বর ও উচ্চারণে তা যথেষ্ট থাকাতে তাঁহার আলাপ বড় শোভন ও শ্রুতিমিষ্ট হয়।

কথা কহিতে কহিতে তাঁহার মুখসৌষ্ঠব যেন আরও উজ্জ্বলভাব ধারণ করে। তাই নয়ন ও কর্ণ দুই একসঙ্গে মুগ্ধ হয়। নয়ন ও কান দুই দিয়াই তাঁহার কথা শুনিতে হয়।

তাঁহার আলাপ শ্রবণ, মন ও হৃদয়ের পরম সম্ভোগের বস্তু।

তাঁহার কথোপকথনের ভাষা উৎকৃষ্ট সাহিত্য। সে ভাষা সহজ ও সরল হইলেও খুব মার্জিত ও উপযোগী। যেমন লিখিত সাহিত্যে তেমন আলাপের ভাষায় এমন শোভন ও উপযোগী শব্দ ব্যবহার করেন, মনে হয় পূর্বে কেহ বাংলাভাষায় এমন সুন্দর করিয়া মনোভাব প্রকাশ করেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন তাঁহার পূর্বেকার কবিতার তুলনায় তাঁহার আজকালকার কবিতা বুঝিতে পারা তত সহজ নয়। তাহা যেন মনোজগতের বড় উচ্চস্তরের ভাষা, সাধারণের ততটা বোধগম্য নহে।

কিন্তু আলাপাদিতে তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিবার ভাষা ও ভঙ্গী সরল ও সহজবোধ্য।

তিনি কখনও বাংলাভাষায় আলাপ করিবার সময় বিদেশী ভাষা ব্যবহার করেন না।

আমাদের 'খামখেয়ালী' নামে একটি সভা ছিল। খেয়ালী সভার একটি নিয়ম ছিল—প্রত্যেক বিদেশী শব্দের জন্য একআনা জরিমানা। শুধু রবিবাবু জরিমানা দেন নাই। সামান্য কথাবার্তাতেই চিন্তাশক্তি প্রকাশ পায় ও মৌলিকতারও পরিচয় দেয়।

সামান্য আলাপেও তাঁহার সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, চিন্তাশীলতা ও মনস্বিতার পরিচয় পাই। এমন কোন বিষয় নাই যে সম্বন্ধে লোক তাঁহার সঙ্গে আলাপ করিয়া নূতন কিছু শিখিতে না পারে বা আনন্দ না পায়। আমি অনেক সময় অবাক হইয়াছি তাঁহার জ্ঞান ও বুদ্ধির শক্তির বৈচিত্র্য দেখিয়া এবং সাধারণ আলাপেও তাঁহার অদ্ভুত প্রকাশ করিবার ক্ষমতা দেখিয়া। রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, ধর্মনীতি, এমনকি দৈনন্দিন জীবনের খণ্ড খণ্ড ঘটনা সমূহেও তাঁহার আলাপে তাঁহার বুদ্ধিশক্তির বিচক্ষণতা ও মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁহার আলাপের এক প্রধান আকর্ষণ হাস্যরস। সে হাস্যরস নির্দোষ, সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ। সে হাস্যরসে একটুও তরলতা নাই। অথচ সামান্য কথাও এমন গুছাইয়া এবং রস-সংযোগ করিয়া বলেন যে তাতে যেমন আনন্দ পাওয়া যায় তেমনি তাঁহার বচন-কুশলতায় মুগ্ধ হইতে হয়।

আমাদের পরম সৌভাগ্য যে এমন সর্বাঙ্গসুন্দর, সর্বগুণসম্পন্ন, এমন প্রতিভাশালী মহাত্মার জন্ম আমাদের বাঙালি জাতির মধ্যে হইয়াছে। আজ তাঁহার গরবে আমরা গরবী। তিনি বিশ্বসাহিত্যে বাংলাভাষাকে চিরস্মরণীয় করিয়াছেন। আজ তাঁহারই জয়ন্তী উৎসবে আমরা আনন্দ প্রকাশ করি এবং তাঁহাকে আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জানাই। তিনি এখন সত্তর বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন; বিশ্বনিয়ন্তা তাঁহাকে আরও দীর্ঘায়ু করুন। দীর্ঘকাল বাঁচিয়া রবীন্দ্রনাথ বাঙালির, ভারতবাসীর, বিশ্বমানবের গৌরব-বর্ধন করুন।

ভাষণ শেষ করে অতুলপ্রসাদ স্বরচিত সেই

জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পূরব উজল রবি।
জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারতগৌরবরবি,
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি—
জয় হে কবি।

গানটি গেয়ে শেষ করেন।

এলাহাবাদ থেকে ফিরে অতুলপ্রসাদ লখনউ ফিরে এলেন। লখনউতে এসেই আবার নিত্য কর্ম-পদ্ধতি। তবে পরিশ্রম কম করতেন। শান্তিনিকেতন থেকে ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর জামাতা অধ্যাপক শৈলেন দাশগুপ্ত ও কন্যা মমতার কাছে লখনউতে এলেন। সেসময় বিনয়েন্দ্র দাশগুপ্ত তার মাসতুতো ভাই অগ্রজ ক্ষিতিমোহনবাবুকে অতুলপ্রসাদের বাড়ীতে নিয়ে যান। ক্ষিতিমোহনবাবু

শান্তিনিকেতনের নামকরা সুরসিক 'ঠাকুরদা' এবং রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গসহচর। অতুলপ্রসাদ ক্ষিতিমোহনবাবুকে পেয়ে খুবই আনন্দিত। উভয়ের হালকা আলোচনায় হাসির ফোয়ারা উঠত। ঢাকা ও মৈমনসিংহের টানে কথাবার্তায় নানা ছড়া ও গ্রাম্যতাদোষযুক্ত শব্দ প্রয়োগে অতুলপ্রসাদ তাঁর শৈশবের দিনগুলির কথা মনে করতেন এবং উভয়ে পরম সুখানন্দ অনুভব করতেন। অতুলপ্রসাদ ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর কাছে শুনতে চাইতেন মধ্যযুগের মুসলমান সাধকদের কথা, দাদু-কবির-রজ্জব এবং হিন্দু সাধক তুলসীদাস-সুরদাস-জগন্নাথদেবের কথা। ইতিহাসের বিচিত্র কাহিনীর-আবু-রিহান অল্‌বিরুনীর কথা, আব্দুর রহিম খান-খানার কথা, দারাসেকোর কথা।

অতুলপ্রসাদ সেসময় নিজেকে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত করতে খুবই আনন্দ পেতেন।

ক্ষিতিমোহন সেন খুবই রসিক মানুষ। তাই কথার মাঝে মাঝে অতুলপ্রসাদের ভেতরটা খুলে দিতে চাইতেন—বেদনার পর্দা সরিয়ে দেবার প্রয়াস করতেন। তিনি নিজেই কোন দোঁহা বলতে বলতে অতুলপ্রসাদকে বিহ্বল করে তুলতেন। তখন অতুলপ্রসাদ আরো যেন ডুব দিতেন গানের সুরে—

যখন তুমি গাওয়াও গান তখন আমি গাই
গানটি যখন হয় সমাপন তোমার পানে চাই।
আরও কি মোর গাইতে হবে?
নয়ন-জলে নাইতে হবে?
আরও মোর চাইতে হবে—
দিলে না যা তাই?
যে সুর তুমি গেয়েছিলে,
যে কথাটি কয়েছিলে,
বারে বারে আমি তারে যাই যে ভুলে যাই।
এবার তুমি বিজন রাতে
গানটি ধরো আমার সাথে,
তোমার ওই তানপুরাতে সুরটি মোর মিলাই।।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদের আহ্বান এলো দিল্লী থেকে। রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে ভাষণ দেবার জন্য অতুলপ্রসাদ প্রভাকে সঙ্গে করে দিল্লী গেলেন।

দিল্লী যাবার পথে অতুলপ্রসাদ বেশ অবসন্ন, কিন্তু রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে উপস্থিত থাকার আনন্দ অবসাদকে তেমন আমল দিলেন না। তিনি স্বাভাবিক কথাবার্তায় তা বুঝতেও দিতেন না। সেদিনই যে গানটি রচনা করলেন তা' প্রকাশ্যে গাওয়া হয়নি কিন্তু খাতায় লিখতে লিখতে গুন্‌গুন্ করে গেয়েছিলেন—

রইল কথা তোমারি, নাথ, তুমিই জয়ী হলে।
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ-তলে।

কুড়িয়ে সবার ভালবাসা
ভবের ডালে বাঁধনু বাসা,
ঝড় এসে এক সর্বনাশা
হে নাথ, ফেলল ভূমিতলে।
পক্ষ আমার গেল ভেঙ্গে,
বক্ষ আমার গেল রেঙে,
তুলতে যারে বলছি মেঙে
হে নাথ, সেই চলে যায় দ'লে।
নয় তো তোমার দুয়ার বন্ধ,
আমারি নাথ, দু চোখ অন্ধ,
মিছে তোমায় বলি মন্দ—
হে নাথ, আজ কে দিল ব'লে!
তাই তো তোমায় দেখতে নারি,
দাও হে দেখা হে কাণ্ডারি,
দর্প আমার, দর্পহারী
হে নাথ, ফেলে এলাম জলে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

দিল্লীতে রবীন্দ্র-জয়ন্তীতে অতুলপ্রসাদের অভিভাষণ—

আমার কয়েকটি রবীন্দ্র-স্মৃতি

রবীন্দ্রনাথের জীবনের আলোচনা এবং তাঁহার কাব্যের সমালোচনা হয়ত অনেকেই করিবেন। আমি তাহা করিব না। তাঁহার সম্বন্ধে আমার নিজের কয়েকটি স্মৃতির কথা বলিব।

অল্প বয়সে যখন স্কুলে পড়িতাম তখন তরুণ বন্ধুদের মধ্যে তর্ক হইত বাংলার কবিদের মধ্যে কে বড়। রবীন্দ্রনাথ তখন নবীন কবি। মাইকেল মধুসূদন দত্তের

শ্রেষ্ঠত্ব তখন সর্ববাদীসম্মত ছিল। ঝগড়া হইত হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে লইয়া। হেমচন্দ্রের শিঙা তখনও খুব সজোরে বাজিতেছে। পলাশীযুদ্ধের কামান কর্ণকুহর কম্পিত করিতেছে; রবীন্দ্র তখন বেণু বাজিতেছেন। সে বেণু একটু আদিরসাত্মক, গুরুগম্ভীর নয়, সেজন্য প্রবীণদের মনঃপূত হইতেছিল না। তাই তরুণরাও অনেকে না বুঝিয়া সে মতে সায় দিত। আমি তখন অজাতশত্রু, আমাদের দল ছোট তবু আমি রবীন্দ্রনাথের পক্ষ লইয়া অভিমন্যুর মত তাহাদের সঙ্গে লড়িতাম। তাহারা বলিত—রবিবাবুর কবিতার ভাষা নিতান্ত সহজ, কোমল ও মেয়েলি—সংস্কৃত শব্দের পাণ্ডিত্য নেই, জোর নেই ইত্যাদি। উত্তরে, আমি নানা প্রকার পশুপক্ষীদের রবের উপমা দিয়া তাহাদের মতের সমীচীনতার প্রতিবাদ করিতাম। তখন কোন্ দলের জয়, কোন্ দলের পরাজয় হইয়াছিল ঠিক স্মরণ নাই; আমি কিন্তু মনে করিতাম আমাদেরই জয়, বিপক্ষ তা' স্বীকার করিত না। তাহারা তখন 'ভারত-ভিক্ষার' দোহাই দিত। আমি তখন গান ধরিয়া দিতাম—'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক। হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্—মুখ তুলি আজি চাহরে'। আজ বহু বৎসর পরে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী বাল্যবন্ধুদের মধ্যে যাঁহারা জীবিত আছেন তাঁহারাও স্বীকার করিবেন যে আমার রাজারই জিত। এখনও হেমচন্দ্রের ও নবীনচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতা আমার বেশ ভাল লাগে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? অতুলনীয়!

আজ একবাক্যে সকলেই স্বীকার করিতেছেন যে রবীন্দ্রনাথ বাংলার শ্রেষ্ঠতম কবি।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় যখন আমি ১৮৯৫ সালে বিলাত হইতে ফিরিয়া আসি। তখন আমার বয়ঃক্রম প্রায় একুশ, বাইশ। শ্রীমতী সরলাদেবী আমাকে লইয়া গিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেন। প্রথম দর্শনেই প্রেম।

ইতিপূর্বে তাঁহাকে ছবিতে দেখিয়াছিলাম এবং তাঁহার কবিতার অনুরাগী ছিলাম; নয়নের সম্মুখে যখন তাঁহার অনিন্দ্যসুন্দর স্নিগ্ধকান্তি দেখিলাম, মুগ্ধ হইয়া গেলাম। ছেলে বয়সেই গোপনে একটু-আধটু কবিতা লিখিতাম, দু'একটি গানও রচনা করিয়াছিলাম। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বা আত্মীয় ছাড়া আর কাহাকেও তা শোনাই নাই; তাও আমার কবিতার খাতা ধরা পড়িয়া গিয়াছিল বলিয়া। আমার মনে আছে কোন চায়ের নিমন্ত্রণে কবি উপস্থিত ছিলেন, আমিও একজন নিমন্ত্রিত। সেখানে তাঁহার গান হয়—মনে আছে বড় ভাল লাগিয়াছিল তাঁহার গান। সেই সময় আমার একজন দুষ্টু বন্ধু তাঁহাকে বলিয়াছিল—'দেখুন, অতুল গান করে আর নিজেও কিছু কিছু গান রচনা করে।' আমার ত তখন লজ্জায় ও সংকোচে 'পৃথিবী

দ্বিধা হও' ভাব। আমি প্রতিবাদ করিলাম, কবি শুনিলেন না, বলিলেন—'সে ত খুব ভাল কথা, আপনি নিজের রচিত একটি গান করুন।' তখন ছিলাম 'আপনি!' ও 'অতুলবাবু' এখন সৌভাগ্যক্রমে হয়েছি 'তুমি' ও 'অতুল'। আমি এড়াইবার অনেক চেষ্টা করিলাম, পারিলাম না। বুঝিতেই পারেন, তখন আমার শরীরের ও মনের কি দুরবস্থা। ভারতের শ্রেষ্ঠতম গীতিকবি ও একজন সুগায়কের নিকট আমাকে নিজ-রচিত গান গাহিতে হইবে। তিনি বুঝিলেন, আমি বিব্রত হইয়া পড়িয়াছি। তিনি আমাকে খুব আশ্বাস দিয়া গাহিতে বলিলেন। আমি কম্পান্বিত কলেবরে ও কম্পিত-কণ্ঠে গাহিলাম। আমার অবস্থা সকলেই লক্ষ্য করিল। শিষ্টতার প্রতিমূর্তি রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিলেন তাহাতে আমি অনেকটা আশ্বস্ত হইলাম, যদিও আমার মুখের উষ্ণ ও রক্তিম ভাব কাটিতে বেশ সময় লাগিয়াছিল। যাহা হউক, তিনি যাহা বলিলেন তাহাতে আশ্বস্ত হইলাম ত বটেই, উৎসাহিতও হইলাম। সে সহৃদয় উৎসাহটুকু আমার রচনার জীবনী-শক্তি।

আনন্দ ও উৎসবের মধ্য দিয়া সাহিত্য ও সংগীতের প্রচার রবীন্দ্রনাথের এক বিশেষ কৃতিত্ব। তিনি সাহিত্য, কবিতা ও গানকে আনন্দের বিকাশ বলিয়া মনে করেন। তাঁহার অনেক রচনাতে ইহার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। তাঁহার এই বৈশিষ্ট্যের একটি দৃষ্টান্ত দিই।

১৮৯৬ সালে তাঁহার নেতৃত্বে 'খামখেয়ালী সভা' নামে একটি সাহিত্য ও সংগীতমণ্ডলী স্থাপিত হয়। আমি এ সভার সর্বকনিষ্ঠ সভ্য ছিলাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, লোকেন্দ্রনাথ পালিত প্রমুখ অনেক সাহিত্যিক ও সুরসিক 'খামখেয়ালী'র সদস্য ছিলেন। এ সভার কার্যপ্রণালী ছিল একটু খামখেয়ালী, নিয়মের কোনো বাঁধাবাঁধি ছিল না। উদ্দেশ্য ছিল—হাস্যরসের উদ্দীপনা করা, সাহিত্যকে আনন্দে সরস করা, নানাবিধ সংগীতের দ্বারা সভ্যদের চিত্ত আকৃষ্ট করা এবং সভান্তে জঠরের সম্যক তুষ্টি সাধন করা। এ খামখেয়ালীর মজলিসকে মসগুল রাখিতেন পরম হাস্যরসিক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তিনি আমাদিগকে হাসির বন্যায় ভাসাইতেন তাঁহার হাসির গান গাহিয়া। আমরা সকলে তাঁহার হাসির গানের কোরাসে যোগ দিতাম, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কোরাসের নেতা। সকলের মুখে হাসি। কণ্ঠে গান, হাসির উচ্চরোলে সভাস্থল কম্পান্বিত হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল গাহিতেন—'হোতে পাত্তেম আমি একজন মস্ত বড় বীর' আর রবীন্দ্রনাথ মাথা নাড়িয়া কোরাস ধরিতেন—'তা বটেইত, তা বটেইত'। দ্বিজেন্দ্র গাহিতেন—'নন্দলাল একদা করিল ভীষণ পণ', রবীন্দ্র গাহিতেন—'বাহারে নন্দ বাহারে নন্দলাল'। দ্বিজেন্দ্রলাল

আমাদের নাচাইতেন হাসির উদ্বেল তরঙ্গে, রবীন্দ্র আমাদের মুগ্ধ করিতেন তাঁহার অনুপম সূক্ষ্ম হাস্যরসের সৃষ্টি করিয়া। খামখেয়ালীর আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকানাথ গোস্বামী তাঁহার উচ্চাঙ্গের তান লয় মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে তিনি গান বাঁধিতেন এবং কবির সে নবরচিত গানগুলি রাধিকানাথ খামখেয়ালীর আসরে গাহিয়া শুনাইতেন। তন্মধ্যে একটি গান মনে আছে—'মহারাজা একি সাজে এলে হৃদয়পুর মাঝে, চরণতলে কোটি শশী চন্দ্রমার লাজে'। খামখেয়ালী মজলিসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিকারী। আমরা ছিলাম তাঁহার সাঙ্গপাঙ্গ। সেই আসরে কবি কত যে নূতন ও অনুপম স্বরচিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন তাহা জনমে ভুলিতে পারিব না। সেই সময়কার বিখ্যাত গানের কয়েকটি মনে আছে—'মম যৌবন-নিকুঞ্জে গাহে পাখী, সখী জাগো—জাগো!' 'বধূ হে ফিরে এসো; মম সজল জলদ স্নিগ্ধ কান্ত অন্তরে ফিরে এসো'; 'জাগি পোহাল বিভাবরী' ইত্যাদি গান ছাড়াও খামখেয়ালীর মজলিসের জন্য বিবিধ অপরূপ কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিয়া আমাদের শুনাইতেন, আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তাহা শুনিতাম। তাঁহার আবৃত্তি করিবার ক্ষমতা অসাধারণ। সে আসরে নাটোরের মহারাজা বাঁয়া তবলা বাজাইতেন। এ বাদ্যে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে 'রাজন' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এস্রাজ বাজাইতেন বিশ্ববিখ্যাত চিত্রশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রচনা পাঠ করিতেন আরও অনেক সাহিত্যিক। তন্মধ্যে বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আমাদিগকে সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত করিত। বলেন্দ্রনাথ অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করেন, কিন্তু সে-বয়সেই তিনি যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে অনেকেই মনে করেন যে ঠাকুর পরিবারে তিনিই সাহিত্য-সম্বন্ধে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকারী।

'খামখেয়ালী'র অধিবেশন এক-একজন সদস্যের বাড়িতে হইত। তিনিই সকলকে নিমন্ত্রণ করিতেন এবং ভোজের সুব্যবস্থা করিতেন। সে-ব্যবস্থাতেও কলাশিল্পীর আবির্ভাব দেখিতাম। একটি দিনের কথা আমার খুব মনে আছে। সেবার বলেন্দ্রনাথের পালা। কবিবরের কবিতা ও অন্যান্যের রচনা পাঠ। সংগীত, হাসির গান ইত্যাদি খামখেয়ালীর উৎসবানন্দ সম্ভোগের পর স্বল্পভাষী ও বিনয়ী বলেন্দ্রনাথ আমাদিগকে আহারের জন্য অন্য একটি ঘরে লইয়া গেলেন। সেঘরটি এমনভাবে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত ছিল যে মনে হইতেছিল নন্দনের ফুলকুঞ্জে প্রবেশ করিলাম। মাঝখানে দেখিলাম একটি জলাশয়, তাহার মাঝে মাঝে দু'একটি বনস্পতি, জলে রাজহংস, জলপদ্ম, সরসীর তটের চারিপার্শ্বে নবদুর্বাদল—সকলেই

প্রকৃতির অনুকারী। কিন্তু হংস, তরুলতা, দুর্বাদল সকলই কৃত্রিম। সেই কাচ-নির্মিত সরোবরের চারিপাশে নিমন্ত্রিতের বসিবার স্থান; প্রত্যেকটি আসনের সম্মুখে নানা প্রকার খাদ্যসম্ভার, তাহাতেও বিচিত্র বর্ণবিন্যাস। আমরা যেই খাইতে বসিলাম অমনি কোন এক প্রচ্ছন্ন স্থান হইতে মৃদু-মধুর সানাই বাজিতে লাগিল। আমাদিগের উচ্চহাসির ও আহার্য গ্রহণের পূর্বকালীন মুখব্যাদান সেই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া আমাদের হাসির মাত্রা আরো বাড়াইতে লাগিল। আর বাক্যশিল্পী, আলাপকুশলী, হাস্যরসিক রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, জগদীন্দ্র রায়, অর্দ্ধেন্দু মুস্তফী আমাদিগকে তখন এমন হাসাইতে লাগিলেন যে, সে আলোড়নে সুখ-খাদ্য কোথায় যে তলাইয়া যাইতে লাগিল বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এরূপ নানাবিধ আনন্দের বিচিত্র সমাবেশ আমি কখনও সম্ভোগ করি নাই। এই প্রণালীতে আমাদের সাহিত্যামোদের ক্ষুধা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। মনে আছে, যেদিন আমার বাড়িতে খামখেয়ালীর অধিবেশন হয় সেদিন কবি বাড়ি গেলেন রাত্রি বারোটার পরে, মহারাজ নাটোর গেলেন বাড়ি একটা-দু'টার সময় আর দ্বিজেন্দ্রলাল ও আমরা কয়েকজন সারারাত কীর্তন শুনিয়া ও তাঁহার হাসির গান শুনিয়া কাটাইলাম। তার পরদিন প্রাতে হাস্যরাজকে আমি বাড়ি পৌঁছাইয়া আসি। মনে আছে, তাঁহার স্ত্রী বড়ই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার শিশুপুত্র মন্টু (দিলীপকুমার রায়) বাবার কোল ধরিয়া ভাঙা ভাঙা সুরে 'আ, আ' করিতে লাগিলে, দ্বিজেন্দ্র বলিলেন,—'বেটা বোধহয় গাইতে পারবে না।' এই রস-উৎসবের স্রষ্টা ও অধিনায়ক শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বপ্রেমিক হইলেও তাঁহার স্বদেশীয়তা ও দেশভক্তি সর্বজনবিদিত। বিশ্বের ভাষার ভাণ্ডারে তাঁহার রচিত জাতীয় সংগীতের তুলনা আর নাই। আগ্রাবাসী বাঙালি কবি গোবিন্দ্রচন্দ্র রায় দুইটি জাতীয় সংগীত রচনা করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন—'কতকাল পরে বল ভারত রে দুখ-সাগর সাঁতরি পার হবে', 'পর দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে' এবং 'নির্মল সলিলে বহিছ সদা তটশালিনী সুন্দরী যমুনে ও'! আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁহার কয়েকটি স্বদেশ সংগীত লিখিয়াই কবিতা লিখিতে বিরত হইতেন, তাহা হইলেও তিনি গীতরচনায় ভারতের শ্রেষ্ঠতম কবি বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহার একটি স্বদেশ সংগীতের ইতিহাস বলি। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে কলিকাতায় একবার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ভারতের নানা প্রদেশ হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য প্রতিনিধিরা আসিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদিগকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রবাসীরা বাংলা জানেন না, অন্তত প্রাঞ্জল প্রচলিত বাংলা বোঝেন না অথচ অনেকেই সংস্কৃত জানেন; তাই সংস্কৃতবহুল একটি অপূর্ব ভারত-সংগীত

রচনা করিয়াছিলেন। তিনি নিজে আমাদের অনেককে সেই গানটি শিখাইয়াছিলেন। মনে আছে বহুকণ্ঠে ও বহু বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে আমরা সেই গানটি গাহিয়াছিলাম। আমাদের সকলকেই—পুরুষ ও মহিলা—শুভ্রবসন পরিধান করিতে হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ নিজে আমাদের নেতা। গাহিয়াছিলাম—

'অয়ি ভুবনমনমোহিনী...'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগীতের উল্লেখ করিতে গিয়া মনে হইতেছে বঙ্গবিভক্তি ও স্বদেশী-আন্দোলনের সময় তাঁহার জাতীয় সংগীতের প্রভাব। সে সময়কার গানগুলি বঙ্গভাষায় ও বাঙালির প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার বোধহয় সেসময় বঙ্গদেশে যে দেশপ্রীতির স্রোত বহিয়াছিল তাহার উৎস রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলার ঘরে ঘরে শোনা যাইত 'আমার সোনার বাংলা'। পথে পথে শুনা যাইত—'বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু বাংলার ফল, পুণ্য হোক পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান।' আর একটি চিত্র আমার মনে পড়িতেছে। আমি সেসময় কলিকাতায় গিয়াছিলাম। গঙ্গার ধারে গিয়া দেখিলাম, দেশপ্রেমিকেরা গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছেন—বঙ্গবিচ্ছেদের অভিশাপ ক্ষালন করিবার জন্য। শোভাযাত্রার সর্বপ্রথমে একটি অল্পবয়স্ক বালক একটি সুস্থকায় ভদ্রলোকের স্কন্ধে চড়িয়া, হাত তুলিয়া সুললিত কণ্ঠে গাহিতেছে—'বাংলার মাটি...'। আর সকলে সহস্র কণ্ঠে সে গানের পুনরাবৃত্তি করিতেছে। সে বালকটি মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিশুপুত্র—অধুনা মহারাজা। সে-দৃশ্য এত হৃদয়স্পর্শী যে আমার চোখে জল আসিল। রবীন্দ্রনাথও নতশিরে সে-স্নানযাত্রায় যোগ দিয়াছিলেন। যুবকরা সেসময় স্ফীতবক্ষে গাহিত—'যদি তোর ডাক শুনে...।' ভারতকে উদ্দেশ্য করিয়া কবি যে অপূর্ব দেশ-সংগীত রচনা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ গান।

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এ দেশে...

কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে...

জগতের গীতিসাহিত্যে এমন হৃদয়স্পর্শী গান আর একটি আছে কি না জানি না। সে-সময়ে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি বাংলার প্রাণকে যেমন করিয়া আন্দোলিত করিয়াছিল, বিপুল জনসভায় ওজস্বী বক্তারা তেমন করিতে পারেন নাই। এমন কি বিপ্লববাদীরাও তাঁহার গান গাহিয়া আত্মোৎসর্গের পথে অগ্রসর হইত। তাঁহার জাতীয় সংগীতে প্রতিহিংসা বা সংকীর্ণতার লেশমাত্র নাই। অথচ তাঁহার গানে লোকের মনে আসিত দেশপ্রেম, সাহস ও শক্তি। তাঁহার স্বদেশ-গীতির মন্ত্রশক্তি অবর্ণনীয়।

তাঁহার গীত-সম্ভারের একটি পরম সম্পদ তাঁহার বর্ষার গান। চিরদিনই বর্ষাঋতু ভারতের কাব্য-সাহিত্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কালিদাসের মেঘদূতের 'আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে' হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাপতির 'এ ভরা বাদর মাহ ভাদর' ইহার প্রমাণ দিয়াছে তৎপরে রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষা' কবিতা ও বর্ষা-সংগীত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম উপাদান জোগাইয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, কোনো কালে বা কোনো দেশে রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ বর্ষা-কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার সে-কবিতাগুলি একত্র করিলে ন্যূনকল্পে শতাধিক হইবে। তাঁহার তরুণ বয়সের 'রিমঝিম ঘন ঘনরে' এবং পরিপক্ক বয়সের 'ওই আসছে বরষা... নিখিল চিত্ত ভরসা' ইত্যাদি অপূর্ব বর্ষা-সংগীত বাংলাভাষার পরম সম্পদ। আমার মনে আছে বহুকাল পূর্বে রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বর্ষাকালে যাতায়াত করিতাম। তিনি আমাকে সেসময়ে দ্বিপ্রহরের পরে আসিতে বলিতেন এবং সেখানেই চা-পান করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে বাড়ি ফিরিতাম। জোড়াসাঁকোতে একটি ছোট ঘর ছিল। সেখান হইতে মেঘ ও বর্ষা দেখা যাইত। প্রায়ই আমরা তিনজন সেখানে বসিতাম। কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বর্ষার কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বর্ষার গান গাহিতেন, আর লোকেন্দ্রনাথ পালিত (তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু) ইংরাজি, ফরাসী ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষায় সেই কবিতাগুলির সমভাবাপন্ন কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং বুঝাইয়া দিতেন। আমি মুগ্ধের ন্যায় তন্ময় হইয়া শুনিতাম। লোকেন্দ্রনাথ বলিতেন—জগতের কোন ভাষায় রবীন্দ্রনাথের বর্ষার কবিতা ও বর্ষা-সংগীতের তুলনা নাই।

আর একটি ঘটনার কথা বলি। প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে রবীন্দ্রনাথ একবার কুমায়ুন প্রদেশের রামগড় পর্বতের উচ্চদেশে একটি বাড়ি ক্রয় করিয়া কয়েক মাস সেখানে থাকেন। আমাকে তিনি কয়েকদিন তাঁহার সঙ্গে রামগড়ে থাকিতে নিমন্ত্রণ করিলেন। আমি লখনৌ হইতে রামগড়ে ছুটিলাম। একদিন বৈকালে প্রবল বেগে বর্ষা নামিল এবং অনেক রাত্রি পর্যন্ত অবিরাম বৃষ্টি হইল। সেদিন আমাদের বর্ষার আসর বসিল। বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত কবি একাধারে বর্ষার কবিতা পাঠ করিলেন আর বর্ষার গান গাহিলেন। সেদিনটি আমি কখনও ভুলিব না। রাত্রি আটটার সময় খাবার প্রস্তুত। কবির কন্যা ও পুত্রবধূ দ্বারে দাঁড়াইয়া আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছেন। কবির কিংবা আমাদের কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। বর্ষাগীতির মাদকতা আমাদের বাহ্যজ্ঞান রহিত করিয়াছে, ক্ষুৎপিপাসা তিরোহিত হইয়াছে, মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কবির বর্ষার গান ও বর্ষার কবিতা শুনিতেছি। অফুরন্ত তাঁহার বর্ষার ভাণ্ডার। আকাশ অবিশ্রান্ত বারি বর্ষণ করিতেছে—আর কবি

অবিশ্রান্ত সুধা বর্ষণ করিতেছেন। এ প্রসঙ্গে একটি হাসির কথা মনে হইতেছে। সে-আসরে একবার রবীন্দ্রনাথ আমাকে আদেশ করিলেন—'অতুল, তোমাদের দেশের একটি হিন্দী গান গাওত হে'। আমি গাহিলাম—'মহারাজা, কেওরিয়া খোলো, রসকি বুঁদ পড়ে।' সময়োপযোগী বলিয়া সকলের সে-গানটি ভাল লাগিল। কবি সে গানটি আমার সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। আমাদের সকলকেই বর্ষার মোহ আচ্ছন্ন করিয়াছে। এমন কি সংগীতে অজ্ঞ রেভারেন্ড অ্যানড্রুজ সাহেবকেও এই গানের ছোঁয়াচে ধরিল, তিনি আমার সঙ্গে অদ্ভুত উচ্চারণ করিয়া এবং ততোধিক বেসুরো কণ্ঠস্বরে আমাদের সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন, মহারাজা, কেওরিয়া খোলো...। তাঁহার সংগীতের আকস্মিক উচ্ছ্বাস রোধ করা দুষ্কর দেখিয়া আমরা তাঁহাকে বাধা দিবার ব্যর্থ প্রয়াস করিলাম না।

সেবারে রামগড়ে কবির গান রচনার একটি স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিলাম। তিনি যে ঘরে শুইতেন, আমার শয্যা সেই ঘরেই ছিল। আমি লক্ষ্য করিতাম, তিনি প্রত্যহ ভোর না হইতেই জাগিতেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বেই তিনি বাটির বাহির হইয়া যাইতেন। একদিন আমার কৌতূহল হইল। আমিও তাঁহার অলক্ষিতে তাঁহার পিছু পিছু চলিলাম। দেখিলাম, তিনি একটি সমতল শিলার উপর উপবেশন করিলেন। যেখানে বসিলেন তাহার দুদিকে প্রস্ফুটিত সুন্দর শৈলকুসুম। তাঁহার সম্মুখে অনন্ত আকাশ এবং হিমালয়ের তুঙ্গ গিরিশ্রেণী। তুষারমালা বালরবি-কিরণে লোহিতাভ। কবি আকাশ ও হিমগিরির পানে অনিমেষ তাকাইয়া আছেন। তাঁহার প্রশান্ত ও সুন্দর মুখমণ্ডল ঊষার মৃদু আভায় শান্তোজ্জ্বল। তিনি গুন্‌গুন্ করিয়া তন্ময় চিত্তে গান রচনা করিতেছেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর'। আমি সে স্বর্গীয় দৃশ্য মুগ্ধ নয়নে দেখিতে লাগিলাম এবং তাঁহার সেই অনুপম গানটির সদ্য রচনা ও সুরবিন্যাস শুনিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ তাহা দেখিলাম ও শুনিলাম এবং তিনি নামিয়া আসিবার পূর্বেই পালাইয়া আসিলাম। আর একদিন প্রাতে শুনিলাম তিনি তেমনি করিয়া গান রচনা করিতেছেন—'ফুল ফুটেছে মোর আসনের ডাইনে বাঁয়ে, পূজার ছায়ে।' এরকম করিয়া প্রায় প্রতি প্রাতে লুকাইয়া তাঁহার গান রচনা শুনিতাম আর বাণীর বরপুত্রের সেই দেবমূর্তি হিমালয়ের কোলে উপবিষ্ট দেখিতাম। একদিন ধরা পড়িয়া গেলাম। পালাইয়া আসিবার সময় তিনি আমাকে দেখিয়া ফেলিলেন। সুচতুর কবি বুঝিলেন যে, গোপনে আমি তাঁহার গান শুনিতেছিলাম। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'অতুল, এখানে এত ভোরে যে? কোথায় ছুটে যাচ্ছ?' আমি দেখিলাম ধরা পড়িয়াছি; আর উপায় নাই। বলিলাম—'লুকিয়ে আপনার গান শুনছিলাম।' তার দু' তিন দিন পরে তিনি যখন

আমাদের শুনাইলেন—'এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর'—আমি বলিলাম—'ওই গানটি আমি পূর্বেও শুনেছি।' তিনি বলিলেন—'পূর্বে কি করে শুনলে? আমি ত মাত্র দু' তিনদিন হল ওই গানটি রচনা করেছি।' আমি বলিলাম—'রচনা করবার সময়েই শুনেছিলাম।' কবি বলিলেন—'তুমি ত ভারি দুষ্টু, এইরকম করে রোজ শুনতে বুঝি?' আমরা সকলেই খুব হাসিলাম।

রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ের আবেগ অন্তঃসলিলা। বাহিরে সচরাচর প্রকাশ হয় না। সে-কয়দিন রামগড়ে তাঁহার অন্তর্নিহিত আবেগের বহিঃপ্রকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলাম। তাঁহার শিশুর মত হাসি; দ্রুতগতি ও আনন্দোচ্ছ্বাস বড়ই মনোরম বোধ হইতেছিল। একদিন বৈকালে বাহিরে বসিয়া আমরা চা ও গৃহজাত নানাপ্রকার সুখাদ্যের সম্ভোগে ব্যস্ত ছিলাম, কবি হঠাৎ পিছন হইতে আসিয়া 'অতুল এস' বলিয়া আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিলেন। তাঁহার কন্যা ও পুত্রবধূ বলিয়া উঠিলেন—'বাবা ও কি! অতুলবাবুর যে খাওয়া এখনো শেষ হয়নি।' 'তা হবে এখন' বলিয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। তাঁহার বালকের মত উৎসাহ আমার বড় মধুর লাগিল। আমি আগ্রহে সঙ্গে চলিলাম। তিনি অনতিদূরে লইয়া গিয়া পরম রমণীয় পত্রপুষ্প-শোভিত একটি সুন্দর নির্জন স্থান আমাকে দেখাইলেন। সত্যই মুগ্ধ হইবার মত সে স্থান। তিনি বলিলেন,—'আমি রোজ এখানে আসি, এখানে বসি, গান গাই এবং গান রচনাও করি।' আমি অনুরোধ করিবামাত্র কয়েকটি গান সেখানে বসিয়া আমাকে শুনাইলেন। কি যে ভাল লাগিয়াছিল বলিতে পারি না। ফিরিয়া আসিলে কবির কন্যা বলিলেন,—'বাবা, তোমার যে কাণ্ড, অতুলবাবুকে না খাইয়ে কোথায় এতক্ষণ ধরে রেখেছিলে?' তিনি বলিলেন,—'অতুলকে জিজ্ঞাসা কর্।' আমি বলিলাম, 'আমি সেখানে খুব ভাল জিনিস খেয়ে এসেছি।' কথাটা প্রকাশ হওয়ায় সকলে খুব হাসিলেন।

কবির অন্তরে একটি নৃত্যশীল শিশু আছে, সে ভিতরেই নৃত্য করে। তাঁহার গীতিকবিতা বোধহয় সেই নৃত্যেরই বিকাশ। জননী প্রকৃতি বোধহয় সেই গীতনৃত্যশীল শিশুকে সস্নেহে ডাকিয়াছিলেন। তাই সে বাহির হইয়া আমাদিগকে শৈলমন্দিরের অঙ্গনে দেখা দিলে।

রামগড়ের সে দশদিনের অবিরাম আনন্দ ও গীতোৎসব কখনও ভুলিব না। আমাদের জয়ন্তী উৎসব তেমনি আনন্দে সরস ও সার্থক হোক। তাঁহার ভক্তবৃন্দ আমরা তাঁহার আরও দীর্ঘায়ু কামনা করি। অমর কবি বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে অমর করিয়াছেন। তিনি জগতের কাব্য-সাহিত্যকেও অমর করিয়াছেন। সেই অমর কবিকে আমরা আজ ভক্তি ও শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হই।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এলাহাবাদ ও দিল্লীতে রবীন্দ্র-জন্ম উৎসবে যোগদানের পর ১৯৩১ সালে লখনউতে এসেই অতুলপ্রসাদ আবার অসুস্থ হলেন। এবার 'গাউট' বেশ জাঁকিয়ে অতুলপ্রসাদকে পঙ্গু করেছে। লখনউ-এর নিকট বন্ধুরা হেমকুসুমের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু হেমকুসুম অটল নীরবতার কঠিনতম প্রকোষ্ঠ থেকে কোন মন্তব্য না করে সবাইকে ফিরিয়ে দিলেন। চিকিৎসার জন্য অতুলপ্রসাদ অবশেষে কলকাতায় গেলেন। এবার কলকাতায় চিকিৎসার সাথে সাথে তাঁর প্রথম গানের বই 'কয়েকটি গান' যা ১৯২৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তা' নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় আরো কিছু গান তাতে যুক্ত করে 'গীতিগুঞ্জ' নামকরণ করে প্রকাশ করেন।

কিছুটা সুস্থ হলেও ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাশিটাতে অতুলপ্রসাদকে খুব দুর্বল করেছে। সেভাবেই আবার লখনউতে—আবার কোর্ট-সাহিত্য-সেবাশ্রম প্রভৃতি নিত্য কাজের মধ্যে ডুবে গেলেন। এদিকে প্রভার মেয়ে রমলার বিয়ে। হিরণ-কিরণ ছেলে মেয়ে সহ লখনউতে 'হেমন্তনিবাসে'। এসেছে সুবালা মাসীও। 'হেমন্তনিবাস' আনন্দ আর হৈ হৈ কলরোলে ভরপুর। গান-হাসি-গল্প তারই মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা। অতুলপ্রসাদ সবটাতেই খুবই সক্রিয়—কিন্তু শরীর আর বইতে পারছে না, খুবই ভেঙ্গে পড়েছে। রোগ আর হেমকুসুমের অনমনীয় মানসিকতা গভীরভাবে অতুলপ্রসাদকে বিধ্বস্ত করছে অনবরত। প্রাণখোলা হাসি হাসছেন, কোথায় যেন একটা 'কিন্তু' প্রতিনিয়ত তাড়া করছে।

বিবাহের কাজকর্ম সাড়া হবার পর আত্মীয় পরিজন পরিবৃত অতুলপ্রসাদ। কিন্তু সবার কাছেই একটি মাত্র জিজ্ঞাসা, একটিমাত্র অন্বেষণী আকাঙ্খা—সবাই আছে তবুও সব শূন্য। ধন-সম্পদ-ঘর ঐশ্বর্য, কিন্তু নেই মাধুর্য নেই পার্বতী। অতুলপ্রসাদ সবাইকে আপন করেছেন কিন্তু আপন হল না সবার চেয়ে যিনি আপন। এ যে বড় শূন্যতা, বড় রিক্ততা! তাকে অন্য কিছু দিয়ে ভরাট করা যায় না।

সুবালা মাসী অতুলপ্রসাদের কাছে বসে আন্তরিক সুধাঝরা সহানুভূতির সুরে কথা বলছেন—অতুল, একটা গান গাও। অতুলপ্রসাদ সবার দিকে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে হঠাৎ হৃদয়টা খুলে বাউল গাইলেন—

তোমার ভাবনা ভাবলে আমার ভাবনা রবে না
আর আমার ভাবনা রবে না।
সবাই যখন বলবে ভালো
তখন তোমায় দেখাব মোর মনের কালো—
আর আমার ভাবনা রবে না।
যখন সবাই করবে তিরস্কার

তখন বুকে ধরব চেপে তব পুরস্কার—
আর আমার ভাবনা রবে না।
যদি জীবন-পথে করি শত ভুল,
আমার পায়ে লাগুক কাঁটা, সবার পায়ে ফুল—
আর আমার ভাবনা রবে না।
হারাই যদি সব ভালোবাসা
সকল আশা ছেড়ে করব তোমারি আশা—
আর আমার ভাবনা রবে না
পড়ব যতই দুঃখে বিপদে
ততই মোরে করব নত তব শ্রীপদে—
আর আমার ভাবনা রবে না।
শেষে ডাকবে যখন 'ঘাটে আয় রে আয়'
তোমার বোঝা করব বোঝাই তোমারি খেয়ায়—
আর আমার ভাবনা রবে না।

সুবালা মাসি, কিরণ-হিরণ অন্যান্য মাসতুতো ভাইবোনেরা এবং ভ্রাতৃবধুরা সবার চোখ মুখ কেমন যেন ঝরা বাদলে আচ্ছন্ন, কিছু বলতে পারছে না, কিন্তু সহ্য করতেও মর্ম যাতনা। তাই একে অন্যের দিকে অসহায় চাউনিতে তাদের অতুলপ্রসাদের কথা ভাবছে—আর ভাবছে হেমকুসুমের কথা! সবার কাছেই হেমকুসুমের ব্যবহার এবং অনমনীয় জেদের ব্যাপারটা সমালোচনার, কথা হবার মত। কিন্তু অতুলপ্রসাদের প্রতি সহানুভূতি জানাতে গিয়ে হেমকুসুমের অন্যায়-অবোধ-অভিমান ও আলাদাভাবে ছেড়ে থাকার বিষয়ে কোন মন্তব্য করতে সাহস হয় না। অতুলপ্রসাদ তা' শোনার জন্য এতটুকু উৎসাহী নন। তা'ছাড়া অতুলপ্রসাদ হেমকুসুমকে চায়, আরো আরো কাছে, প্রতিদিনের কর্মপ্রবাহের অংশীদার করে। কিন্তু তাঁর কোন ইচ্ছায় তাঁকে আঘাত করা প্রেমিক অতুলপ্রসাদের কাছে সহজ নয়। তাই বৃক্ষ যেমন নীরবে কেঁদে কেঁদে ব্যথার রক্ত ঝরায়—প্রতিবাদ পর্যন্ত করে না—তেমনি কাঁটার সাথে ফুলের সুবাসের আকাঙ্খায় অতুলপ্রসাদও নীরবে সব সহ্য করছেন।

এদিকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন উপাচার্য নির্বাচিত হবেন। নূতন উপাচার্যপদে অতুলপ্রসাদের নাম উঠেছিল—অতুলপ্রসাদ গররাজি নন। শিক্ষার সাথে নবীনদের সাথে চিন্তা ভাবনা বোঝাপড়ার সুযোগ বাড়বে এই মানসিকতায় অতুলপ্রসাদ মত দিয়েছিলেন—কিন্তু যখন তিনি বুঝতে পারলেন উক্তপদে

অতুলপ্রসাদের নির্বাচন সর্বসম্মতভাবে হবে না তখন স্বাভাবিকভাবেই এতটুকু বিলম্ব না করেই সেই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন।

এর কিছুদিন আগে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের গঠনমূলক কাজের বিষয়ে যে প্রস্তাব উঠেছিল নাগপুর কংগ্রেসের অধিবেশনে, তাতে সম্মতি জানিয়েছিলেন চিত্তরঞ্জন দাশ-মতিলাল নেহেরু-লালা রাজপত রায় প্রভৃতি জন-নায়কগণ। কেবলমাত্র বিপিনচন্দ্র পাল এবং মহম্মদ আলি জিন্না তার বিরোধিতা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বাঙলাদেশে গান্ধীজীর গঠনমূলক কাজের পরিকাঠামো সম্পর্কে সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। কলকাতায় এ বিষয়ে সহযোগী হলেন সতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা। বিহারে নেতৃত্ব দিলেন বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ; যুক্তপ্রদেশে মতিলাল, মদনমোহন, বোম্বাইতে দীনবন্ধু এ্যাণ্ডুজ, পাঞ্জাবে লালা রাজপত রায়, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি ভাতৃদ্বয়। তা'ছাড়া নানাভাবে যুক্ত হলেন ডাঃ আনসারি, হাকিম আজমল খাঁ, হজরত মোহানি, আবুল কালাম আজাদ। চিত্তরঞ্জন লোক মারফৎ লখনউ-এর অতুলপ্রসাদের কাছে বিষয়টি অনুধাবন করার জন্য জানিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদ কোন মন্তব্য করেন নি; বিশেষ করে কলকাতায় যখন ছাত্ররা পড়াশোনা ত্যাগ করে 'গেলাম খানায়' যাওয়া বন্ধ করল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যানসেলর। তিনি চিত্তরঞ্জনকে ডেকে বলেছিলেন, ছেলেদের মাথা খাইবার জন্য এ কাজ করছ কেন? চিত্তরঞ্জন সদর্পে তার উত্তরে বলেছিলেন, 'ছাত্ররা ন্যাশান্যাল কলেজে পড়বে'। আশুতোষ প্রশ্ন করলেন, ন্যাশ্যানাল কলেজ করতে টাকা দেবে কে? চিত্তরঞ্জন বললেন, টাকা দেশের লোকের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে হবে। আশুতোষ বললেন, এক কোটি টাকা পেলে আমিই এই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে ন্যাশান্যাল কলেজে পরিণত করব, তোমরা আমার কথা শোন—আমার কাজ করতে বাধা দিও না।

এই ঘটনার পর অতুলপ্রসাদ লখনউ-এর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে তাঁর মনের কথা জানালেন। তিনি বললেন, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়কে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে হবে। সরকারী অর্থের জন্য আমাদের ভাবনাকে খাটো করলে চলবে না অর্থ আমাদের সংগ্রহ করতে হবে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অতুলপ্রসাদ 'অল ইণ্ডিয়া লিবারল্ ফেডারেশনের' একজন নামজাদা প্রবক্তা।

শিক্ষায়-ব্যবসাক্ষেত্রে চালচলনে-কথাবার্তায়-ব্যবহারের উদারতায় দান-ধ্যানে আভিজাত্যের অতি নিকটত্ব থাকলেও অতুলপ্রসাদ অতি সাধারণ সমাজের 'নিচু' মানুষের সঙ্গ পেতে, তাদের সঙ্গে কাজ করতে, তাঁদের অভাব অভিযোগ পূরণ করতে সকল সময় উদ্যোগী—লখনউ অতি সাধারণ মানুষ থেকে অভিজাত পরিবারের মানুষের তা' প্রতিদিনের ঘটনা। তাই 'লিবারেল পার্টি' সমর্থক অতুলপ্রসাদ—এ-বিষয়টির প্রভাব লখনউ-এর সাধারণ মানুষের কাছে গভীর।

তাই সংযুক্ত প্রদেশের লিবারেল পার্টির এলাহাবাদে ১৯৩৩ সালে সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে অতুলপ্রসাদ নেতৃত্ব দেবেন—এটা স্বাভাবিক ক্রমপর্যায়ে স্থির হয়েছে। স্যর তেজবাহাদুর সপ্রু, হৃদয়নাথ কুঞ্জরা, জয়াকর, চিন্তামণি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী নেতৃবৃন্দ অত্যন্ত প্রীতির চক্ষে দেখতেন অতুলপ্রসাদকে।

অতুলপ্রসাদ সভাপতির ভাষণে বলেন, ... The constitution proposed in the white paper is certainly not Dominion Status nor any real self-government. It is a catalogue of safeguards rather than proposal for real autonomy. ...... I deplore separate electorates more than British dominion has to be maintained no better means could be devised than separate electorats. ...... We are not the architects of our own destiny but suppliants before another nation for favour. No self-respecting India can help feeling humilitation for such an object position.

অতুলপ্রসাদ তাঁর ভাষণে ...... pleaded for communal unity and reconstruction of Hindu Society whose number were gradually dwindling. Unless the Hindu Society looked sharp, its majority would before long be reduced to a minority.

অতুলপ্রসাদ গান্ধীজীর সমাজ সংস্কার ও হরিজন উন্নয়নের জন্য প্রশংসা করে পরেই কংগ্রেসের বিষয়ে বলেন, ... Revolutionary violence was morally sinful and politically undefensible. তিনি গভীরভাবে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ... to withdraw the Civil Disobedience Movement.

গান্ধীজীকে শ্রদ্ধা জানিয়েও অতুলপ্রসাদ ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে সায় দিতে পারলেন না, কারণ তখন সারা দেশে সর্বত্র হিংসাত্মক রেষারেষি এবং দেশ-নেতাদের সীমাহীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের লড়াই ও বাগ-বিতণ্ডা। অতুলপ্রসাদের ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে তখন কংগ্রেসের মূল-ধারা থেকে সরে এসেছেন অনেক নেতা—স্যর অতুল চ্যাটার্জী—স্যর বি. এল মিত্র—অধ্যাপক এম. এম. ঘোষ, সরোজিনী নাইডু-সি আর দাশ-অরবিন্দ ঘোষ-গোখলে-

জগদীশ বসু-স্যর এন. এন. সরকার-আর, পরাঞ্জপে-লর্ড সিংহ-স্যর সপ্রু এবং আরো অনেকে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

১৯৩৩ মে মাসে অতুলপ্রসাদ কার্শিয়াং গিয়েছিলেন—ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য। কার্শিয়াং-এ সেসময় নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর তাঁর দল নিয়ে নৃত্যচর্চায় বিশেষভাবে মনোনিবেশ করছেন। খবর হল, অতুলপ্রসাদ কার্শিয়াং-এ আছেন। খোঁজ করে উদয়শঙ্কর অতুলপ্রসাদকে তাঁর আস্তানায় নিয়ে এলেন। সে-কি আনন্দ! উদয়শঙ্করকে অতুলপ্রসাদ তাঁর ভবনে আমন্ত্রণ জানান। দু'জন গল্প আর গানের আসরে বিভোর—সময় যে কোথা দিয়ে চলে যায় দু'জনের কেউ তা' বুঝতে পারলেন না। এমনি এক রাত্রিতে অতুলপ্রসাদের সঙ্গেই উদয়শঙ্কর খাবার খেলেন। উদয়শঙ্কর বললেন, অতুলদা হেমবৌদিকে সঙ্গে আনলে খুব ভাল হত'। অতুলপ্রসাদ উদয়শঙ্করের দিকে তাকালেন—হাসলেন। সেদিন সকালেই হেমকুসুমের একটি পত্র পেয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ। পত্রটি পাবার পর পরই মনের ক্লান্তি যেন কমে এল—একটি গানও সে-সময় রচনা করলেন। টেবিলে রাখা পত্রটির দিকে ইঙ্গিত করলে উদয়শঙ্কর গভীর উৎসাহে পত্রটি হাতে তুলে পাঠ করলেন। পাঠ করার পর অতুলপ্রসাদের কাছে গেলেন।—অতুলপ্রসাদ জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গানটি গেয়েছিলেন—

কেন এলে মোর ঘরে আগে নাহি বলিয়া?
এসেছ কি হেথা তুমি পথ তব ভুলিয়া?
তোমার লাগিয়া আজ
পরি নি মিলন-সাজ;
বিরহশয়নে ছিনু আঁখি ছলছলিয়া।
কে জানিত ছিল মোর দোরখানি খুলিয়া!
ধরিব তোমার কর,
দাঁড়াও পথিকবর,
গেঁথে নি' কুসুমমালা তুলি প্রেম-কলিয়া।
না হইতে মালা গাঁথা যেয়ো নাকো চলিয়া।

উদয়শঙ্কর মুগ্ধ—কিন্তু কোথায় যেন একটা চাপা বিরহ-না পাবার বেদনা-হতাশার কাতরতা অনুভব করলেন। এই বলে অতুলপ্রসাদ একটু অন্যমনা হয়ে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

এদিকে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের এলাহাবাদ অধিবেশনের (১৯৩২) পর সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রচার ও প্রসার বিষয়ে কর্মকর্তাদের মধ্যে নানাবিধ মানসিক বিরোধ গভীরভাবে প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ব্যক্তিগত রুচি ও চিন্তার দ্বারা সম্মেলনের দিগ্ নির্ণয় করার প্রচণ্ডতম প্রয়াস তীব্র। বিহার-উড়িষ্যা-দক্ষিণ ভারতে সম্মেলনের প্রচার ও কাজ করার পরিকল্পনা হয়েছে—কিন্তু বঙ্গদেশে সাহিত্য সম্মেলনের কি ভূমিকা হবে তা' নিয়ে মতবিরোধ বেশ পরিলক্ষিত হ'ল।

রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্ম-জয়ন্তী সমারোহে অমল হোম লালগোপাল মুখোপাধ্যায়ের কাছে বহির্বঙ্গের এই প্রিয় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধিদের আন্তরিকভাবে উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন। অতুলপ্রসাদও আন্তরিকভাবে চেয়েছিলেন বাঙালির এই মহৎ কাজে বহির্বঙ্গের বাঙালীদের একমাত্র প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ কলকাতায় উপস্থিত হ'য়ে রবীন্দ্র-শ্রদ্ধায় যোগদান করুক। তারজন্য পরবর্তী অধিবেশন স্থগিত করা হয়েছিল। কিন্তু কার্যতঃ মাত্র ২জন প্রতিনিধি, শ্রীযুক্তা প্রতিভা মুখোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক কিরণচন্দ্র সিংহ, এলাহাবাদ থেকে সাহিত্য সম্মেলনের প্রতিনিধি হয়ে উপস্থিত ছিলেন। সাহিত্য-সম্মেলনের কর্মকর্তাদের মধ্যে এবিষয়ে নানা প্রশ্ন জেগেছিল। ক্ষুব্ধও হয়েছিলেন অনেকে। বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এর সত্ত্বার পরিচয় কতটুকু কার্যকর হবে—?

এলাহাবাদ অধিবেশনের মূল সভাপতি সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভাষণে এ বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। বিষয়টি পরবর্তী সময়ে অতুলপ্রসাদের নজরে আসে। অতুলপ্রসাদ ব্যথিত, গভীরভাবে চিন্তান্বিত—তাঁরই কর্ণিকে যার প্রতিষ্ঠা, তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কর্মকর্তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর অলস ও ভ্রষ্ট ভাবনায়।

গোরক্ষপুরের ললিতমোহন কর মহাশয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় কলকাতায় অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করেন। অতুলপ্রসাদ এলাহাবাদের সম্মিলনের কর্তাব্যক্তিদের মনোভাবে ক্ষুণ্ণ—এ-কথা সরাসরি জানালেন। রামানন্দবাবু সেজন্যই আগামী গোরক্ষপুর অধিবেশনে অতুলপ্রসাদকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জানান। অতুলপ্রসাদকে মূল সভাপতিপদে পাবার জন্য ললিতবাবু খুবই পীড়াপীড়ি করলেন। অতুলপ্রসাদ অসুস্থ—কিন্তু সাহিত্য সম্মেলনের ভবিষ্যৎ রূপরেখার শেষ কথাটি বলার জন্য রাজি হলেন মূল সভাপতির পদ গ্রহণে।

অতুলপ্রসাদ কলকাতা থেকে লখনউ এলেন—সেখানে দু'দিন থেকে এলাহাবাদে গেলেন—আসন্ন সাহিত্য সম্মেলনের ভাষণ লেখার জন্য। অসুস্থ, ডাক্তারের কড়া নির্দেশ—কিন্তু অতুলপ্রসাদ সাহিত্য সম্মেলনের আহ্বান উপেক্ষা করতে পারলেন না।

যথাসময়ে অতুলপ্রসাদ গোরক্ষপুরে প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের একাদশ অধিবেশনে (১৯৩৩) মূল সভাপতির ভাষণ দান করলেন। ভাষণে অতুলপ্রসাদ বললেন,

...বাংলাদেশ আমাদের আপন দেশ, আমাদের মাতৃভূমি, বাঙলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষা। প্রতি বৎসর এ সম্মেলন আমাদের এ-কথাটি নতুন করে মনে করিয়ে দেয়।

...বাংলাদেশ আমাদের জননী এ কথাটি মনে রাখা দরকার।

এ সম্মেলনে প্রতি বৎসব আমরা যেন আমাদের সেই সুজলা সুফলা 'মা'টিকে সম্মিলিতভাবে স্মরণ করি। ...

দীর্ঘ লিখিত অভিভাষণ এক নাগাড়ে পাঠ করে অতুলপ্রসাদ খুবই ক্লান্ত। সেদিকে তাঁর নজর নেই। তিনি ভাষণ শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমেই কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট চারুচন্দ্র দাস মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হয়েছে কি?'

'না' কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর দিলেন।

...'আমি তাঁর বাড়ীতেই আছি, চলুন না—দেখাটাও হয়ে যাবে। আমি আজই চলে যাব ভাবছি'—অতুলপ্রসাদ খুব ক্লান্তভাবে বললেন।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিককে সঙ্গে নিয়ে অতুলপ্রসাদের নির্দেশ অনুসারে চললেন।

অতুলপ্রসাদের ব্লাড-প্রেশার বেড়েছিল।

কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, না আসাই আপনার উচিত ছিল।

অতুলপ্রসাদ সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'উচিত তো অনেক কিছু থাকে, ক'টা পারলুম? ভদ্রলোকদের কথা দিয়েছিলুম যে।'

শুধু কি তাই, স্থানীয় বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকার অনুরোধে অতুলপ্রসাদকে একটি গানও গাইতে হয়েছিল।

যারা তোরে বাসলো ভালো,
যারা দিল প্রাণে ব্যথা,
যাবার আগে বন্ধু জেনে
সবার পায়ে নোওয়া মাথা।
যাদেরে তুই পর ভাবিলি,
যাদের চোখে জল আনিলি,
ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে

জানা রে আজ প্রাণের কথা।

জীবনে যা পাবার ছিল,
সবাই তোরে তাই তো দিল;
যা পেলি তাঁর চরণধূলি—
আর তবে তোর ভাবনা কোথা?
পাবার বাকি আছে যাহা
পাবি না তুই হয়তো তাহা।
খুলিস না আর খেয়ার ঘাটে
পাওনা-দেনার জমার খাতা।

অধিবেশন শেষ হবার পর অতুলপ্রসাদ লখনউ ফিরে গেলেন। খুবই অসুস্থ শরীর—কোনরকমে ঔষধ খেয়ে একটু সুস্থ হলেন—আবার নিয়মিত কোর্টে যাওয়া। বিশ্রাম নিতে পারতেন; কিন্তু কোর্টে না গেলে টাকা উপায় হবে না—নিজের জন্য নয়; অতুলপ্রসাদের কাছে কত প্রার্থী প্রতিদিন প্রতি মাসে তাঁরই দেওয়া অর্থের আশায় থাকে—জীবিকার ন্যূনতম সম্বলটুকুও সেই অতুলপ্রসাদ থেকে 'ভাই সাহেব' থেকে আনতে হয়। তা'ছাড়া হেমকুসুমের আলাদা বাড়ীর ভাড়া—জীবিকা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রতি মাসে দিতে হয় অতুলপ্রসাদকেই।

ডাক্তারের পরামর্শে কোর্টের কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে নিজেকে তেমনভাবে যুক্ত করতে পারছেন না। তাই 'হেমন্তনিবাসে'র অফুরন্ত অবসরে শুধু গান, গান গাওয়া আর গান রচনা। ধূর্জটিপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রায়ই আসেন—তাঁদের নূতন নূতন গান শোনাবার জন্য অপেক্ষা করেন। গান শুনিয়ে তবে তাঁর শান্তি।

অতুলপ্রসাদের প্রিয় রতনঝঙ্কারও আসেন, আসেন নাটু মহারাজ। তাঁদের গাওয়া ওস্তাদী গানের সুর ও শব্দ বাংলা গানে সঞ্চারিত করে অতুলপ্রসাদ বাংলা গানের পরিধি বাড়িয়ে দিলেন। যখন খুবই একা থাকতেন—কেউ তখনও আসেননি, অতুলপ্রসাদ ধ্যানস্থ হয়ে আপন চেতনার কপাট খুলে রচনার মুহূর্তের সুর-সঙ্গমে তৎক্ষণাৎ গাইতেন—

মিনতি করি তব পায়—
তুমি যাও চলি তরী বাহি।
আমার কূলে এসো না ভুলে,
বেঁধো না হেথা তব তরী!

তুমি তো বেলা হলে যাবে বন্ধন খুলে;
তবে কেন আসিছ গান গাহি?
তব তরণী-তরঙ্গ করে কত রঙ্গ;
রাখিতে নারি হৃদি ঢাকি।
তুমি তো নিবে না মোরে তোমার তরী'পরে;
তবে কেন ও মুখপানে চাহি?

পরক্ষণেই আবার গাইলেন—

কে তুমি ঘুম ভাঙায়ে, কেন মোরে,
ডাকিলে গো এ আঁধারে?
স্বপ্নে যারে চেয়েছিনু
সে বুঝি চাহে আমারে।
কেন তবে দাও না ধরা?
কেন খোঁজাও সারা ধরা?
কেন বাজাও মন-হরা
ও মুরলী বারে বারে?
মরু-আঁধার ছিল ভালো,
কুঞ্জ-আঁধার আরো কালো।
কে তুমি গো রাত-ভুলানো,
সন্ধ্যাবেলায় প্রভাত-আলো?
ঘুম-ভাঙ্গানো রাত-জাগানো
কে জানে সে অজানারে!

গান গাইতে গাইতে নিজেকে হারিয়ে ফেলতেন—হৃদয় গভীরে ডুব দিয়ে অরূপরতনের আশায় সকল আকুতি অঞ্জলিবদ্ধ করে সকল দুঃখ, বেদনা—না পাওয়ার যা কিছু হতাশা সব সমর্পণ করে আবার গাইলেন,

আমারে ভেঙ্গে ভেঙ্গে
করো হে তোমার তরী;
যাতে হয় মনোমত
তেমনি ক'রে লও হে গড়ি।
এ তরুতে নাই ফুল ফল,
শিকড়গুলি বাড়ছে কেবল;
দিয়ে আঘাত জীবন-মূলে

লও হে তারে ছিন্ন করি।
শক্ত তারে করবে ব'লে
ফেলে রেখো রৌদ্রে জলে,
পুড়িয়ে তারে কোরো বাঁকা
যখন তুমি গড়বে তরী।
যাদের ধন আছে অপার
সোনার নায়ে কোরো হে পার;
আমার বুকে করিয়ো পার
যাদের নাইকো পারের কড়ি।
তোমার ঐ মাঝ-গাঙে
এ তরীটি যদি ভাঙ্গে
তবে সে অতল তলে
আমায় কুড়িয়ে নিয়ো হে শ্রীহরি।

কান্নায় কান্নায় অতুলপ্রসাদ লাভ করলেন পরম শান্তি, পরম আনন্দ—সমর্পণের অনন্তলোকে।

বোন প্রভা পাশের ঘরে নীরবে বসে দাদার আর্তির নিবেদন শুনছিলেন আর চোখ বুঁজে পরম করুণাময়ের কাছে আকুল প্রার্থনা করছিলেন। কী সংসার কী হয়ে গেল! স্নেহ মমতাহীন একটা নিঃসঙ্গ জীবনের কাতরতা আজ হৃদয় উজাড় করে দিয়ে সব সমর্পণ করতে চাইছে। একদিন এই সংসারে ফুল ছিল, প্রেম ছিল—পিয়ানোতে গানের স্বর-ছন্দ মাতোয়ারা হয়ে উঠত—আজ সবই 'আমায় ভেঙ্গে ভেঙ্গে কর হে তোমার তরী'র বাসনা।

শরীরের অবস্থা দিন দিন খারাপ হচ্ছে। কোর্টেও যাবার অবস্থা নেই অতুলপ্রসাদের। পারিবারিক ডাক্তার ভিয়াস ভালভাবে পরীক্ষা করলেন—রক্তের চাপ খুবই বেশী।

কোর্টে নিয়মিত উপস্থিত না থাকতে পারলেও বাড়ীতে অতুলপ্রসাদ নানাভাবে মক্কেলদের পরামর্শ দিতেন। আবার লখনউ-এর বন্ধু-বান্ধবরা এলে অফিসঘর ছেড়ে বসবার ঘরে চলে আসতেন। বন্ধুরা তাতে আপত্তি জানালে তিনি বলতেন, ব্যবসা তো চলবেই—মক্কেলরা ঘন্টা-খানেক অপেক্ষা করলে তাদের কি ক্ষতি হবে? আমি একটু নিজের মনটাকে তাজা করে নিই—মাথাটাকেও একটু বিশ্রাম দিই তোমাদের সঙ্গে হাল্‌কা আলোচনায়।

এমনি একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত অতুলপ্রসাদের

স্বাস্থ্য সম্পর্কে খোঁজ করতে 'হেমন্ত-নিবাসে' এলেন। অতুলপ্রসাদ খুবই খুশি—তিনি বললেন, কয়েকদিন একনাগাড়ে পরিশ্রম করলেই তো রক্তের চাপ বাড়ে—এখন চাপটা বেড়েছে—শীগ্‌গিরই কলকাতায় যাবো ঠিক করেছি—দশ বারো দিনের জন্য। কলকাতায় গিয়েই স্টীমারে গোয়ালন্দ যাব—আট-দশদিন গঙ্গার উপরে স্টীমারে কাটালে চাপটা কমে আসে—বিশ্রামও পাব। তারপর ফিরব।

বোন কিরণ দাদাকে কলকাতায় আসার জন্য লিখল। অতুলপ্রসাদ কলকাতায় গেলেন—কিরণের বাড়ীতেই উঠলেন। ডাক্তার নীলরতন সরকার চিকিৎসা করছেন—নানা ধরনের পরীক্ষা। গোয়ালন্দ ট্রিপটা নেওয়া হয়নি। তবে একদিন সুন্দরবন ডিস্‌প্যাচে গিয়ে ফিরে এলেন।

কাশী থেকে রস সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধূর্জটিপ্রসাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে কলকাতায় অতুলপ্রসাদের খোঁজ পান এবং কাশী থেকে আমলকীর মোরব্বা নিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। আমলকীর মোরব্বা পেয়ে অতুলপ্রসাদ খুবই খুশী। খাবার দাওয়ার খোঁজ করায় অতুলপ্রসাদ হাসতে হাসতে বললেন, 'ডারউইন' লোকটা ঠিক ধরেছিল, দেখুন না, ফল খেয়ে বেশ আছি, একটু বল পেয়েছি, সকাল বিকাল বেড়াতে পারছি।

কলকাতার একডালিয়া রোডে ধূর্জটিপ্রসাদের নতুন বাড়ি। লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছুটিতে ধূর্জটিপ্রসাদ নতুন বাড়িতে এসেছেন ছুটি কাটাতে। অসুস্থ অতুলপ্রসাদ একডালিয়া রোডে তাঁর মামাতো ভাই যতীন্দ্রনাথ গুপ্তের বাড়িতে এসেছেন। ধূর্জটিপ্রসাদ তা জানতেন। একদিন সন্ধ্যায় তিনি সাইগলকে নিয়ে এলেন অতুলপ্রসাদকে সাইগলের গান শোনাবার জন্য। সাইগল বড়ো ওস্তাদ নন, কিন্তু তাঁর মিষ্টি গলা। সাইগলের গান শুনে অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ, আনন্দিত। অতুলপ্রসাদও নিজের লেখা 'কয়েকটি গান'-এর বই থেকে বেছে গান করলেন। হিরণকুমার সান্যালের অনুরোধে সাইগলের উপস্থিতিতে অতুলপ্রসাদ অসুস্থ শরীরে ধীরে ধীরে গাইলেন,

কে যেন আমারে বারে বারে চায়।
আমি তো চিনি নি তারে, সে চেনে আমায়।
যবে থাকি ঘুমঘোরে
কে দোরে আঘাত করে;
'কে তুমি' ব'লে ডাকিলে
কে যেন পালায়।
কুসুমের গন্ধে রূপে

সে আসে গো চুপে চুপে;
মেঘের আড়াল হতে
ডাকে, 'আয় আয় আয়'।
কত প্রেমে কত গানে
সে যেন আমারে টানে;
চলেছি বিরহী তাই
কে জানে কোথায়।
হে মোর অচেনা বঁধু,
লুকায়ে থেকো না শুধু;
এসো, করি পরিচয়
মালায় মালায়।

সাইগল অতুলপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বিমুগ্ধ বিস্ময়ে আরো আরো একান্ত করে জানতে চাইলেন একটি মানুষের—বড় মাপের মানুষের অন্তর-জীবনের কোন এক অদৃশ্য আঙিনায় কাহার আনাগোনা ধরাছোঁয়ার আলো আঁধারে বিরহীর ব্যাকুলতা!

অতুলপ্রসাদ আবার গাইলেন,

কেন তারে পাই নে দেখা নয়নে?
লুকিয়ে সে ব'সে আছে জীবনে কোন্ গোপনে।
যখন থাকি আপন মনে,
কয় সে কথা ক্ষণে ক্ষণে;
তার সকল ভাষা বুঝতে নারি,
কী ভাষা তার কে জানে?
ভাসিয়ে আমার গানের তরী
তারে ঘাটে ঘাটে খুঁজে মরি;
ভাবে সবাই ঘর ছেড়েছে
আমারি সন্ধানে।
নয়নে যে ধরে কায়া,
বুঝেছি সব তারি ছায়া!
নয়নে যে দিল না ধরা
দিবে কি সে পরাণে-কে জানে?

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

কলকাতায় ডাঃ নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় অতুলপ্রসাদ সাময়িকভাবে সচল হলেন—সুস্থ অনুভব করায় তাঁর সাধন-স্থল সেই লখনউতে চলে গেলেন। লখনউতে আসার পর তাঁর নিকটে সহমর্মী সুজনবৃন্দ পরম তৃপ্তি ও সানন্দে তাঁদের 'সেন সাহেব'কে অভ্যর্থনা জানালেন—এবং সাবধানে কম পরিশ্রম করতে কেউ নির্দেশ দিলেন, কেউ অনুরোধ করলেন। অতুলপ্রসাদ যে লখনউ-এর আপন-জন, একই সংসারের একজন! অনুশাসন যাঁরা দিয়ে গেলেন, তাঁরাই আবার নানা কাজে 'সেন সাহেবের' দ্বারস্থ হয়ে নানা পরামর্শ চান। অতুলপ্রসাদ যে একা থাকতে চান না—'সবারে বাসরে ভালো' আক্ষরিক ব্রতে লখনউ-এর আপামর জনসাধারণকে তাঁদের অতি নিকট, নির্ভর হয়ে উঠেছেন। সেখানে আপন, আপন সুখ, আপন স্বাচ্ছন্দ্য যে সম্ভব নয়। 'হেমন্তনিবাসে' বন্দী জীবন অতুলপ্রসাদের কাম্য নয়—সহজ আরাম ও বিশ্রাম-সুখ তাঁর জীবন নয়। তা' ছাড়া গান আর আড্ডা তো জীবন-দায়ী প্রেরণা! তা' থেকে সরে আসা তো সম্ভব নয়। তাই নানা ছল-চাতুরীর গোপনীয়তায় অতুলপ্রসাদ লুকোচুরি খেলছেন। কোর্টে যান—অল্প অল্প কাজ করেন, আবার বাড়ী আসেন। সন্ধ্যায় উপাসনায় নিজেকে ব্যাকুল করে সমর্পণ করেন। মাঝে মধ্যে অন্তরের নিবিড় গোপন দুয়ার খুলে হেমকুসুমের জন্য উদাস হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকেন, চোখের কোণের শুষ্ক পর্দায় সিক্ত শীতলতার প্রবাহানুভূতিতে জেগে ওঠেন।

তখন অতি আস্তে আস্তে শান্ত স্বর-তরঙ্গ ভেতর থেকে বেরিয়ে এল—

এসো গো একা ঘরে একার সাথি।
সজল নয়নে বল রব' কত রাতি?
সুনীল আকাশে চন্দ্র বিকাশে,
তামস নাশে;
এ আঁধারে হাসিবে কবে তব মুখ-ভাতি?
তোমারে গোপন ব্যথা জানাব গোপনে,
তোমারে কুসুমমালা পরাব যতনে।
তব সঙ্গ মাগি আছি আমি জাগি,
সরব-তেয়াগি;
তব চরণ লাগি আছি কান পাতি।

জয়-জয়ন্তী রাগে অতুলপ্রসাদ বেদনার হতাশা-মুক্ত ছিন্ন-চেতনাকে বার বার প্রিয়ার সন্দর্শন আকুতিতে সকল সমর্পণ করে করে অমৃতকুম্ভ পূরণ করছেন।

আবার অসুস্থ হলেন। সবাই চিন্তিত। ডাক্তার ভিয়াস পরামর্শ দিলেন হাওয়া

বদলের। রটে গেল এ-সংবাদ মুখে মুখে। 'হেমন্তনিবাসে' আবার জমায়েত হচ্ছে সবাই সকলের আত্মীয় অতুলপ্রসাদের স্বাস্থ্যের খবর নেবার জন্য। স্থির হল, পুরী যাবেন। সমুদ্রের হাওয়ায় বিশ্রাম-সুখ অতুলপ্রসাদকে আরাম ও আরোগ্য দিতে পারে—তাই লখনউ-এর প্রিয়জনদের সন্তোষ-আশীর্বাদ পাথেয় করে অতুলপ্রসাদের পুরী যাত্রার আয়োজন হচ্ছে। সবই হল, কিন্তু টাকা নেই, দীর্ঘদিন পুরীতে থাকতে হবে তার জন্য টাকা নেই। একেই বলে অদৃষ্ট! যাঁর প্রশস্ত দু'হাত লখনউ-এর দরিদ্র, বিধবাদের এবং সর্বত্র সাহায্যের দুয়ার উন্মুক্ত, কেউ কাছে এসে হাত না পাতলে ছুটে গিয়ে চুপি চুপি বালিসের নিচে কখনো বা গাছের আড়ালে থেকে গোপনে টাকার ঝুলি রেখে ছুটে পালাতেন—নানা প্রতিষ্ঠানের উৎস মুখ থেকে শুরু করে তার যৌবন-রস ধারার রসদ জোগান দিতেন অকপটে—আজ সেই মানুষটি কত অসহায়, কত নিঃস্ব-কত রিক্ত-নিজের জন্য-সকলের জন্য স্বাস্থ্য উদ্ধারে পুরী যাবার টাকা নেই!

কোর্টে যাওয়া বন্ধ—অর্থাগমও নেই। নিজের রোগের খরচ, হেমকুসুমের আলাদা সংসারের খরচ তার উপর স্বাভাবিক বাধ্যতামূলক দান-ধ্যান তো আছেই।

অবশেষে অতুলপ্রসাদ বাধ্য হয়েই, নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক থেকে আট হাজার টাকা ওভারড্রাফট নিলেন।

পুরী যাবার দিন হিন্দু-মুসলমান প্রিয়জনরা—কেউ মন্দিরের ফুলবেলপাতা, কেউ পীরের দরগার কাপড় নিয়ে তাদের 'ভাইসাহেব'কে শুভেচ্ছা জানাতে এলেন। প্রার্থনা আর দোয়া যাজ্ঞা করে মন্দিরে-মসজিদে বিশেষ প্রার্থনাও হয়েছে।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

পুত্র দিলীপকুমার, ছোট বোন ছুটকী (প্রভা) এবং তাঁর কন্যা কুন্তলা অতুলপ্রসাদের সঙ্গে পুরী রওনা হবেন, সব আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ। সেইসময় তাঁর গাড়ীর ড্রাইভার জয়চাঁদ কাছে এসে মাথা নত করে কিছু টাকার দরকার বলে জানালেন। অতুলপ্রসাদ জয়চাঁদের টাকার দরকারের গুরুত্ব বুঝতে পেরে তাঁকে পাঁচশত টাকা দিলেন। তারপর অতুলপ্রসাদ পুরীর পথে কলকাতায় এলেন।

১৯৩৪ সাল—এপ্রিল মাস। পুরীতে অতুলপ্রসাদ। পাথরপুরীর রায়বাহাদুর মহেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের বাড়ীতে অতুলপ্রসাদ উঠেছেন। সকাল-বিকাল প্রভা-দিলীপকুমার আর কুন্তলা অতুলপ্রসাদকে পুরীর সমুদ্রবেলাভূমিতে নিয়ে যান। তা' বেশ ভাল লাগে অতুলপ্রসাদের। সমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতার কিছু অংশ স্মৃতি থেকে বলে যান—প্রভাও মাঝে মাঝে হারিয়ে

যাওয়া লাইন জুড়ে দেন। সমুদ্রের উত্তাল রূপ অতুলপ্রসাদের হৃদয় ও মনকে কেমন যেন শান্ত-সংযত একান্ত প্রসন্নতায় ভরিয়ে দিল। অতুলপ্রসাদ ধীরে ধীরে ক্লান্তির অবসন্নতার দুয়ার ভেদ করে একটা সুস্থ সহজ আনন্দ খুশিতে অভিষিক্ত হচ্ছেন প্রতিটি দিন।

জানতে পারলেন লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জ্ঞানেন্দ্র চক্রবর্তী সস্ত্রীক পুরীতে রয়েছেন। উপাচার্যও যখন শুনলেন অতুলপ্রসাদ পুরীতে—উভয়ের দেখা হবার পর সে কি আনন্দ ও উল্লাস!

এদিকে সন্ধ্যার পর অতুলপ্রসাদ ঘরে ফিরে প্রতিদিন উপাসনায় বসেন। সঙ্গে থাকেন ছুটকী। উপাসনায় অতুলপ্রসাদ অতি ধীরে ধীরে গাইলেন—

আমি ব'সে আছি তব দ্বারে;
কত যে ডাকি বারে বারে।
দেখো, বিরহী বিহগ করুণ গাইল,
কুসুমে সাজি' অরুণ আইল।—
দুয়ার খোলো, লহো আমারে।
এসেছি হেথা অনেক ঘুরে,
যাইতে হবে অনেক দূরে;
পথের অতিথি চাহে তোমারে।
এসেছি হেথা তোমার তরে,
চরণে বেদনা, কুসুম করে।—
এ বনমালা দিব কাহারে?

এদিকে কিরণও এলেন পুরীতে—দাদার কাছে।

পুরীতে অতুলপ্রসাদের সমাজসেবা নেই, কোর্টে হাজিরা নেই, হরিজন পল্লীতে, সেবাশ্রমে যেতে হচ্ছে না—সাহিত্যের আড্ডা নেই, কিন্তু গানের আমেজ আছে, গান আছে, গানের আসর আছে। পুরী শুধু তীর্থস্থান নয়—স্বাস্থ্য-উন্নত করার, একঘেয়েমির জীবনকে সবুজ করে নেবার আগ্রহে বাঙালির কাছে পুরী রমণীয়—পুরী অতি নিকট। বাইরে থেকে আসা এবং স্থানীয় বাঙালিদের মধ্যে যখন জানাজানি হয়ে গেল, 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী'; 'বঁধুয়া নিদ্ নাহি আঁখি পাতে', 'মোদের গরব মোদের আশা', 'পাগলা মনটারে তুই বাঁধ'র অতুলপ্রসাদ পুরীতে রয়েছেন—তখন আর পালাবার, লুকিয়ে থাকা সম্ভব নয়। দলে দলে সবাই আসছেন অতুলপ্রসাদকে দেখবার জন্য, গান শুনবার জন্য। কিরণ-প্রভার ইচ্ছা নয়,

দাদা আবার গানের আসর করেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদের প্রাণকে স্তব্ধ করে প্রাণময় করা সম্ভব নয়। গানই প্রাণ, গানই জীবন—অতুলপ্রসাদের গানই জীবন-তরী। সেই তরী বাইতে হবে যতক্ষণ কণ্ঠে গান আছে। তাই বোনেদের বারণ শুনতে চান না অতুলপ্রসাদ।

বলেন, ওরা আমায় ভালবাসে, আমার গান শুনতে চায় কিরণ। কথা দিচ্ছি বেশি গান গাইব না—তাড়াতাড়ি চলে আসব।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় পুরী এসেছেন। তিনি অতুলপ্রসাদের সঙ্গে দেখা করলেন—তাঁকে উৎফুল্ল ও সতেজ দেখে তৃপ্ত হলেন।

অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

আপনার হিত ভেবে ভেবে
দিন কাটালি, মূঢ়মতি!
তোর নিয়মে বাঁধা কি রে
জগবন্ধু জগপতি?
নিজের ভাবনা ভাবলি যত
ভাবনার ভার বাড়ল তত;
ভাঙল আশা শত শত,
তবু আশার নাই বিরতি।
সাগর সাজায় শৈলের শির,
শৈল দেয় নিজ বুকের নীর;
শিষ্য হয়ে প্রকৃতির
শেখ্‌রে পরের অনুগতি।
বসে আপন বন্ধ ঘরে
কাঁদলি কত নিজের তরে;
দু'-ফোঁটা জল দে রে পরে
যারা দীন দুঃখী অতি।

সেদিনের গানের আসরে অতুলপ্রসাদের গান শুনে কি এক অনির্দেশ্য নিষ্ক্রমণের ইঙ্গিত পেলেন রাধাকুমুদবাবু! কিন্তু কিছুই কাউকে তা' বললেন না।

রাধাকুমুদকে পেয়ে অতুলপ্রসাদের সে কী আনন্দ! তাঁকে বললেন, ...তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল ভালই হয়েছে। সেদিন লখনউ থেকে তোমাকে সঙ্গী পেয়েছিলাম—প্রতাপগড় স্টেশনে তুমি অন্যত্র চলে গেলে—তোমাকে গানটি

আজ শোনাব। রাধাকুমুদবাবু চাইছিলেন না, অতুলদা আবার গান গেয়ে ক্লান্ত হন। কিন্তু কিছু বলার আগেই অতুলপ্রসাদ গান ধরলেন,

যারা তোরে বাসলো ভালো,
যারা দিল প্রাণে ব্যথা,
যাবার আগে বন্ধু জেনে
সবার পায়ে নোওয়া মাথা।
যাদেরে তুই পর ভাবিলি,
যাদের চোখে জল আনিলি,
ক্ষমা চেয়ে সবার পায়ে
জানা রে আজ প্রাণের কথা।
জীবনে যা পাবার ছিল,
সবাই তোরে তাই তো দিল;
যা পেলি তাঁর চরণধুলি—
আর তবে তোর ভাবনা কোথা?
পাবার বাকি আছে যাহা
পাবি না তুই হয়তো তাহা।
খুলিস না আর খেয়ার ঘাটে
পাওনা-দেনার জমার খাতা।

রাধাকুমুদবাবু শুধু তাকিয়ে থাকেন অতুলদার দিকে। অনেক কথা বলার জন্য মনটা আঁকুপাঁকু করছে—কিন্তু শ্রান্ত ক্লান্ত অতুলদাকে কেমন যেন আলাদা অতুলপ্রসাদ বলে তাঁর মনে হল। 'সবার পায়ে নোওয়া মাথা'—তিনিও সর্বাঙ্গ অতুলদা'র চরণে নুইয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

গান্ধীজী সারা দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করতে করতে বিহারের প্রবল ভূমিকম্পে মুঙ্গের, দ্বারভাঙ্গা, মজঃফরপুর এবং মতিহারী—ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থানগুলির ত্রাণকার্য পরিদর্শন করে পুরীতে এলেন হরিজনদের সেবার জন্য। গান্ধীজী শুনলেন অতুলপ্রসাদ সেন পুরীতে আছেন। আগে কয়েকবার অতুলপ্রসাদের গান তিনি শুনেছেন। অতুলপ্রসাদ গান্ধীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন—তাঁর রাজনৈতিক মতবাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না, কিন্তু সেবাকাজে বিশেষ করে হরিজনদের সেবাকাজে গান্ধীজীকে অতুলপ্রসাদ গভীরভাবে মান্য করতেন। গান্ধীজী অতুলপ্রসাদকে খবর পাঠালেন গান শোনাবার জন্য। এ সংবাদে অতুলপ্রসাদের ক্লান্ত-অবসন্ন দেহে আনন্দের জোয়ার এল। গান্ধীজী পুরীতে! গান শুনতে আমাকে আহ্বান করেছেন!

সে কি সত্যি! গান্ধীজীকে গান শোনাতে হবে? কিরণ-প্রভাদের ডেকে সব জানালেন। পুত্র দিলীপ কুমারকে সঙ্গে করে অতুলপ্রসাদ গান্ধীজীর কাছে যাবেন। খুবই কৃতার্থ হবেন। কিরণ-প্রভাও দাদার সঙ্গে গেলেন।

গান্ধীজী অতুলপ্রসাদকে বক্ষে জড়িয়ে অভিনন্দন জানালেন—বেশ কিছুক্ষণ; যেন তৃপ্তির সমুদ্রে উভয়ে হাবুডুবু খাচ্ছেন। অতুলপ্রসাদের চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে গড়িয়ে গান্ধীজীর চরণযুগলে ঝরে পড়তেই গান্ধীজী দু'হাতে আবার দৃঢ়ভাবে বুকে-জড়িয়ে ধরলেন অতুলপ্রসাদকে।

গান্ধীজী অতুলপ্রসাদের জীর্ণ অবসন্ন দেহ দেখে খুবই বিব্রত হলেন। অপলক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ অতুলপ্রসাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন এবং হাতটি প্রসারিত করে অতুলপ্রসাদের দেহে বুলিয়ে দিলেন।

গান্ধীজী অতুলপ্রসাদকে বললেন, অতুলবাবু আপনাকে এমনভাবে ভেঙ্গে পড়লে চলবে না—অনেক কাজ যে বাকী। আপনার হরিজন সেবা, স্বদেশ ভাবনা আপনাকে আবার শুরু করতে হবে। দেশ আজ খুবই বিপন্ন অতুলবাবু! আপনাকে জরা ঝেড়ে উঠতেই হবে—

তারপর দু'হাতে অতুলপ্রসাদের হাত দুটি ধরে বললেন, অতুলবাবু দেশ আপনাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন—গান্ধীজীও বিহ্বল হলেন—সেই অতুলপ্রসাদ আজ এই অতুলপ্রসাদ! কিছুক্ষণ পরে গান্ধীজী স্মিতহাসিতে বললেন, একটা গান কর অতুলবাবু! বহুদিন তোমার গান শুনিনি।

অতুলপ্রসাদের চোখ দুটি জলে ভেসে গেল। কিরণ একটি রুমালে দাদার চোখের জল মুছে দিতেই স্বগতভাবে মনের মধ্যে জেগে উঠল—আমি যে নিঃশেষ হয়ে গেছি! আমার হৃদয় কুঞ্জবন শুকিয়ে গেছে গান্ধীজী! আপনার কথায় আমার কুঞ্জবনে নতুন করে জীবনের বাঁশি বেজে উঠছে! কিন্তু গান্ধীজী, সেই শক্তি কোথায়!

এমনি হতাশার মধ্যে গান্ধীজীর কথায় শক্তির, প্রাণের জোয়ারের অনুভবে মনের মধ্যে খেলে গেল।

গান্ধীজীর ইচ্ছানুসারে অতুলপ্রসাদ গাইলেন—

কে আবার বাজায় বাঁশি　　এ ভাঙ্গা কুঞ্জবনে।
হৃদি মোর উঠল কাঁপি　　চরণের সেই রণনে।
কোয়েলা ডাকল আবার,　　যমুনায় লাগল জোয়ার;
কে তুমি আনিলে জল　　ভরি মোর দুই নয়নে?

আজি মোর শূন্য ডালা, কী দিয়ে গাঁথব মালা?
কেই এই নিঠুর খেলা খেলিলে আমার সনে?
হয় তুমি থামাও বাঁশি, নয় আমায় লও হে আসি—
ঘরেতে পরবাসী থাকিতে আর পারি নে।

গান্ধীজী মুগ্ধ—বাঙলা তিনি বুঝতে পারেন—তা সত্ত্বেও অতুলপ্রসাদ গানটি হিন্দীতে অনুবাদ করে শুনিয়েছেন।

গানটি শেষ হবার সাথে সাথে গান্ধীজী আসন থেকে উঠে অতুলপ্রসাদের হাত দুটি ধরে তাঁকে আবার অভিনন্দন ও উষ্ণ প্রীতি জানালেন। আনন্দে ও অযাচিত অভ্যর্থনায় অতুলপ্রসাদ বেশ বিমূঢ়। কোন কথা নেই, শুধু অপ্রত্যাশিত আনন্দের চাপা তৃপ্তি, ধন্য-ধন্যভাব-সমৃদ্ধতায় পরিপূর্ণ। শুধু গান্ধীজীর প্রতি অপলক সজল নয়নে তাকিয়ে তাকিয়ে কৃতজ্ঞতার অঞ্জলি প্রদান করলেন আপন সত্তার বিনম্র প্রণামে। গান্ধীজীও গভীরভাবে মুগ্ধ—অতুলপ্রসাদকে শুধু অভিনন্দন নয়, বুকে টেনে হৃদয় নিঃসৃত আকুলতা ব্যক্ত করলেন।

আবার পুরীর নির্দিষ্ট আবাসে চলে গেলেন অতুলপ্রসাদ। কিন্তু কোথায় যেন মনটা একটু ফিরে তাকাতে চায়, কাকে যেন অলস-আকাঙ্খায় কাছে পেতে চায়। একটা আনমনা উদাস চাউনিতে এপার ওপার খুঁজে খুঁজে অতুলপ্রসাদ আপন মনেই স্মিত হাসিতে কেদারায় বসে পড়েন—সমুদ্রে সীমাহীন তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে ভাবনাগুলি স্মৃতির বেলাভূমিতে আছড়ে পড়ছে—আবার হারিয়ে যাচ্ছে। ছেলেকে কাছে ডেকে বললেন, ...গান্ধীজীর কাছে যেতেই তোমার মা'র কথা বার বার মনে হচ্ছিল দিলীপ। গান্ধীজীর অসুস্থতায় তোমার মা দিন রাত্রি শুশ্রষা-সেবা যত্ন করেছিলেন—বলেই চুপ হয়ে গেলেন।

রাত্রিতে সামান্য আহার সেরে বিছানায় শুতে যাবেন—কিন্তু পারছেন না। একটা আর্তনাদ ভেতরে ভেতরে অস্পষ্টতার দেয়ালে বার বার ঘোরাফেরা করছে। মনটা অনেকটা অস্থির। কিরণ কাছে এসে দাদার এই ছট্‌ফট্‌ করার অবস্থা দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, দাদা, কষ্ট হচ্ছে! তুমি শুয়ে পড়।

না রে, আমি একটু বাইরে বসি। সমুদ্রের দিকে মুখ রেখে নিস্তব্ধ গাঢ় অন্ধকারের নিবিড়তাকে উপভোগ করে চমকে গেয়ে উঠলেন,

বল গো সজনী, কেমনে ভুলিব তোমায়?
যতন যাতনা বাড়ায়।
যদিও যাতনা সহি
নয়ন ফিরায়ে লহি,

প্রাণ তবু পড়ে থাকে পায়।
না জানি কী আছে মধু
তোমার পরাণে বঁধু,
প্রাণ সদা তোমা-পানে-ধায়।।

কিরণ কাছে এসে অতুলপ্রসাদের চোখ-মুখে হাত বুলিয়ে দিলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

পুরীতে প্রায় দেড় মাস কাটিয়ে অতুলপ্রসাদ সদলে কলকাতা হয়ে লখনউতে ফিরে গেলেন। যেটুকু অর্থ সঙ্গে নিয়েছিলেন তাতে এর বেশী থাকা সম্ভব ছিল না; কিন্তু পুরীতে আরো কিছুদিন থাকা দরকার ছিল।

লখনউতে 'হেমন্তনিবাসে' প্রিয়জন-বন্ধুবর্গ সবাই আসছেন, কুশল বার্তা জানাচ্ছেন। বারান্দায় পায়চারী করতে করতে হৃদয়টা কেমন যেন হোচট্ খাচ্ছে—সেই গাছ, সেই বেল-চামেলির মাখামাখি, কিন্তু কেমন যেন একটা শূন্যতা—কার পরিচর্যাহীন হতাশা সমস্ত পরিবেশকে শুষ্কতার-জীর্ণতার-নীরবতায় আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফুলগুলি ফুটতে না ফুটতে ঝরে পড়ছে, অবিন্যস্ত ঘাসগুলি ছন্দহীন, একটা অভিমান-সঞ্জাত চাউনি ঘিরে ঘিরে বেদনা-কাতর করে তুলছে স্বাভাবিক পরিচ্ছন্নতা। প্রাণময় মুগ্ধ চেতনায় তা' সহ্য করা সম্ভব নয়। কাতর অতুলপ্রসাদ আশাবরী রাগে গাইলেন,

তুমি কবে আসিবে মোর আঙিনায়?
কত বেলী, কত চামেলি যায় বৃথা যায়।
প্রেম-নীরে ভরি আশার কলসি
কত-না যতনে সেচিনু তায়।
ফুলদল আসি কহে পরিহাসি,
'কোথাও, তবু বঁধু কোথায়?'
নিজ ফুলসাজে আজি মরি লাজে;
এ ফুলদায় হতে বাঁচাও আমায়।
নিবে ফুলগুলি নিজ হাতে তুলি,
গাঁথি নি মালিকা, যদি শুকায়।।

শরীরটা পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। সেই প্রাণ উজাড় করা হাসি নেই, কথা নেই—জ্যোতিহীন চোখ দুটো বারে বারে নিজের মধ্যেই নিভৃত কোটরে যেতে চায়—কিছুই তেমন আর ভাবতে পারেন না অতুলপ্রসাদ। তবু কোর্টে যেতে

হবে—যানও। টাকা দরকার—টাকা, তাঁর সাহায্যের উপর যে অনেকের মুখে হাসি অপেক্ষা করে, নির্ভর করে বসে থাকে। তিনি বন্ধুদের বলেন, ...আমার এখন অনেকদিন বাঁচতে হবে, অনেক টাকা উপায় করতে হবে।

কিন্তু শরীরটা প্রায়দিনই অসহযোগ করছে—বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরী সভায় আর যেতে পারেন না, প্রয়োজনীয় পরামর্শ করতে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক আসেন; রাজনৈতিক পার্টি লিবার‍্যাল পার্টির সদস্যরা আসেন নানা পরিকল্পনা ও দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনায় পথ নির্ধারণ করার পরামর্শ নিতে, সেবাশ্রমের-রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামীজীও আসেন অতুলপ্রসাদের কাছে নানা জটিল পরিস্থিতির সমাধান সূত্র পাবার জন্য।

এমনি একটি সন্ধ্যায় এসেছিলেন সেই ভিখারি আখতারউদ্দিন—অতুলপ্রসাদকে, সেন সাহেবকে, ভাইসাহেবকে দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। হাতের বেহালাটি ভাইসাহেবের পায়ের কাছে রেখে স্তব্ধ হয়ে কিছুক্ষণ বসে রইলেন। অতুলপ্রসাদ বেহালা তুলে আখতারউদ্দিনের হাতে তুলে দিলেন—বললেন, আবার বসন্ত আসবে, তোমার বেহালা থামিয়ে না—অনেকটা পথ যেতে হবে—পথের ধারে যারা বসে আছে তাদের কাছে তোমার বেহালায় জানিয়ে দিয়ো—

।। সবারে বাসরে ভালো,
নইলে মনের কালো ঘুচবে না রে।।

আখতারউদ্দিন বেহালা হাতে নিলেন—সেই ভৈরবী রাগে সুর ছড়ালেন—

সবারে বাস্‌রে ভালো—

ক্লান্ত চোখ দুটো বুজে অতুলপ্রসাদ নিজেকে 'সবার রঙে রঙ মেশাতে লাগলেন'—আখতারউদ্দিন বেহালার সুরে রাজপথ ছুঁয়ে এগিয়ে গেল। অতুলপ্রসাদ অবসন্ন; খুব আস্তে আস্তে ধীর লয়ে গুন্ গুন্ করে গাইলেন,

আমায় ক্ষমা করিয়ো যদি তোমারে জাগায়ে থাকি;
দু-দিন গাহিয়া গান চলিয়া যাইবে পাখি।
তোমার নিকুঞ্জ-শাখা
বসন্ত-পবন-মাখা;
প্রাণের কোকিলে, বলো, কেমনে ভুলায়ে রাখি?
নিঠুর সংসার-বনে
শুষ্কতৃণ-আহরণে
কাটি যাবে দিবা, তাই কাতরে তোমায় ডাকি।

আমার করুণ গানে
যদি দুঃখস্মৃতি আনে,
ফুরাইয়া গেলে গান মুছিয়া ফেলিয়ো আঁখি।।

আবার বসে পড়েন অতুলপ্রসাদ।

বোন কিরণ এসে দাদার বুকে হাত দিয়ে চোখের জলে বলছে, দাদা, আমি বৌদির কাছে যাই—তুমি না বোল না... তোমার

কথাটা শেষ না হতেই অতুলপ্রসাদ কিরণের হাতটা চেপে ধরলেন, কিছু বললেন না—শুধু চোখ দুটো স্থির করে কিরণ চোখে আটকে রাখলেন।

কিরণ মুখখানা অতুলপ্রসাদের কোলে লুকিয়ে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

২৫শে আগষ্ট, ১৯৩৪।

অতুলপ্রসাদ ভোরে ভ্রমণে বেরিয়েছেন। 'হেমন্তনিবাসে'র কাছাকাছি পরিচিতদের সঙ্গে দেখা করলেন। পাশে হেমন্তকুমার ঘোষের বাড়ী, তারপর রাধাকৃষ্ণ শ্রীবাস্তবের সঙ্গে দেখা করলেন। শ্রীযুক্তা বাস্তব অতুলপ্রসাদকে গরম দুধ দিলেন।

তারপর এ. পি. সেন রোড ধরে আশে পাশে সকালের ছুটে চলা কর্মস্থলের পরিচিত-অপরিচিতদের শুভ-কামনা ও শুভ-কুশল বিনিময় করে বাড়ী ফিরলেন। একটু বৃষ্টি পড়ছিল, বাড়ী এসেই অতুলপ্রসাদ হাতে কাঁচি নিয়ে ছাতা মাথায় বাগানের তদারক করছেন—প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন বাগানের মালিকে।

জুনিয়র মুরাশীর হোসেন এলেন। একটা দরকারী মামলার আলোচনার জন্য। বেশ কিছুক্ষণ মামলা সংক্রান্ত পরামর্শ দেবার পর অতুলপ্রসাদ কয়েকদিনের জমে থাকা চিঠিপত্র-গুলি একে একে বেছে বেছে পড়তে লাগলেন। উত্তর দেবার যেগুলি, তা'গুছিয়ে রাখলেন। এর মধ্যেই একজন মহিলাকে লিখলেন,

...আমি যাবার আগে কাউকে যেন কষ্ট না দিই, ও নিজে না কষ্ট পাই—এই কামনা করি।

চিঠিপত্রগুলির যথাসম্ভব উত্তর দেবার পর অতুলপ্রসাদ আবার মনোসংযোগ করলেন একটি ভাষণ লিখবার জন্য। বহু পুরাতন বন্ধু সহকর্মী মিস্টার টমাস জজপদে নির্বাচিত হয়েছেন—তাঁকে একটি ডিনার পার্টিতে সংবর্ধনা দেওয়া হবে বার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে। অতুলপ্রসাদ সেই সংবর্ধনা সভায় পৌরোহিত্য করবেন। তাই ভাষণ দিতে হবে। কিন্তু শরীর অসুস্থ বোধ করায় ভাষণটি লিখতে পারেন নি।

লেখার টেবিল থেকে বিছানার কাছে রাখা আরাম কেদারায় বসে অতুলপ্রসাদ চোখ বুঁজে বুঁজে হঠাৎ সামনের দেয়ালে মা ও বাবার ছবি দেখতে পেয়ে বিহ্বল হলেন। বেশ কিছুক্ষণ আনমনা হলেন। মনে পড়ে গেল হেমকুসুমের কথা—মনে পড়ল সেই অতীতের নানা ঘটনা (হেমকুসুমের ও তার) বিবাহের বিধ্বস্ত পরিমন্ডল। মাথাটা নুয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার মায়ের ছবিটির দিকে তাকালেন—মনে মনে স্বগতভাবে বললেন, মা তুমি কষ্ট পেয়েছ—একাকী জীবন—তোমার অতুল থাকা সত্ত্বেও মা গো তুমি কষ্ট পেয়েছ—তারপর একটু চিন্তান্বিত হয়ে ঠোঁটের কোণে স্মিতহাসিতে বললেন, হেম—হেম তুমি আমার কাছে থেকেও তুমি আমার কাছে নেই—একাকী নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করছ—কষ্ট হয় না হেম! সুখে সংসার করবে কত আশায় প্রাণ মন তৈরী করেছিলে—কিন্তু সে সব কোথায়! কেন এমন হলো হেম!

হঠাৎ পুত্র দিলীপ এলেন—বাবাকে একটু আনমনা দেখে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, তোমার শরীর ভাল তো!

অতুলপ্রসাদ চুপ করে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দিলীপকুমারকে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে নিতে বললেন। তারপর পিতা-পুত্র কিছু জরুরী সাংসারিক আলোচনা করলেন। কিছু জরুরী কাগজ-পত্তর কোথায় কিভাবে আছে তার হদিস জানাবার পর দু'জনে টেবিলে দুপুরের খাবার খেতে বসলেন।

খেতে খেতে অতুলপ্রসাদের হাত থেকে হঠাৎ খাবার চামচটি মাটিতে পড়ে গেল এবং শরীরটা চেয়ারের উপর অসাড় হয়ে লুটিয়ে পড়ল। দিলীপকুমার দ্রুত অতুলপ্রসাদকে ধরে রাখলেন, বাবুর্চি ছুটে এলেন—সেসময় হেমন্তকুমারও 'হেমন্তনিবাসে' কি একটা কাজে এসেছিলেন—তিনি অতুলপ্রসাদের অবস্থা দেখে দ্রুত ছুটে এসে ধরাধরি করে নিকটের তাঁর শয্যায় শুয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়ী থেকে ডাঃ সেন এলেন—পারিবারিক ডাঃ ভিয়াস এলেন। বোনেরা তখন কেউ লখনউতে নেই। সেবার জন্য, নজর রাখার জন্য নার্স রাখা হ'ল।

দুপুরের কয়েক ঘন্টার মধ্যে লখনউ শহরে 'সেন সাহেব অসুস্থ' খবর ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎগতিতে। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত সকলস্তরের মানুষজন ভীড় করছেন 'হেমন্তনিবাসে' ভাই সাহেবকে দেখার জন্য। কিন্তু ডাক্তারের কড়া নির্দেশ 'ভিজিটার্স নট অ্যালাউড'। এলেন সহমর্মী দুর্দিনের বন্ধুরা, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুরা—বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় মানুষজন। সকলের মুখ-চোখ উৎকণ্ঠিত অপ্রত্যাশিত বেদনারভারে আক্রান্ত। এলেন সেরা ডাক্তার হান্টার। অতুলপ্রসাদ অচেতন। সন্ধ্যায় ডাঃ ভিয়াস পুত্র দিলীপকুমারকে এবং হেমন্তকুমারকে কাছে

ডেকে জানালেন, অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক। দিলীপকুমার মাকে খবর পাঠাতে বললেন।

অতুলপ্রসাদের অসুস্থতার খবর হেমকুসুম পেয়েছেন—কিন্তু তিনি তেমন গুরুত্ব দেননি—এমন অসুস্থতা প্রায়ই হয় আবার সুস্থ হয়ে যান—। তাই দেখতে যাবার উদ্যোগ তখন মনে এল না। তা'ছাড়া হেমকুসুম নিজেও অসুস্থ। চলাফেরা বারণ—কোন উত্তেজনায় থাকা বারণ, কিন্তু এ বারণ যে চিরকালের জন্য ছিন্ন হবার আয়োজন! একথা বুঝতে পারেন নি। তাই হেমকুসুম নিরুদ্বিগ্ন। সারাদিনের নানাকাজে ক্লান্ত, স্বাভাবিকভাবেই রাত্রিতে শুয়ে পড়লেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

অবশেষে রাত্রির গভীরে সকলের সজাগ নজর এড়িয়ে একটি মহৎ প্রাণ, একটি উদার প্রাণ, একটি কোমল প্রাণ-এর অবসান হল—অতুলপ্রসাদ সকল বন্ধন ছিন্ন করে সুরলোকে চলে গেলেন।

তখন রাত্রি একটা পঁয়তাল্লিশ, ২৬শে আগস্ট-এর শুরু।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

ওদিকে শয্যায় শুয়ে হেমকুসুমের অস্থিরতা—দোর খোল, দোর খোল, আর কত ঘুমোবে। আচম্‌কা হেমকুসুম জেগে উঠলেন—একটা অশুভ আল্‌তো ভাব তাকে ঘিরে রয়েছে—দ্রুত ছুটে এলেন 'হেমন্তনিবাসে'—রাত্রির গভীর-নিস্তব্ধতার মধ্যে মানুষে মানুষে ভরা পথ-গলি—সবার চোখ যেন 'কার লাগি সজল'। হেমন্তকুমারও ছুটে এসেছেন পাশের লাগোয়া নিজ বাড়ী থেকে—ততক্ষণে সব শেষ—সব আলো-হাসি স্তব্ধ হয়ে গেছে, 'বাগান ফাঁকা।' হেমন্তকুমার হেমকুসুমকে আসতে দেখে দ্রুত তাঁর কাছে এসে বললেন, গিয়ে কী হবে? সবই তো শেষ হয়ে গেছে। আপনি অসুস্থ—আজ চলে যান কাল সকালে আসবেন।

হেমকুসুম জড়বৎ, যেন কোন চেতনা নেই, নেই কোন আর্তনাদ—শুধু চোখের কোণ ভেসে গেল নীরব কান্না।

রইল কথা তোমারি, নাথ ...... তুমিই জয়ী হলে
ঘুরে ফিরে এলাম আবার তোমার চরণ-তলে।

হেমন্তকুমারের কথাতে হেমকুসুম ধীরে ধীরে আবার গাড়ীতে উঠেই নিদারুণ শোকরাত্রি ভেদ করে চলেছেন—সব আলো নিভে গেছে, সব কথা হারিয়ে গেছে—কেউ কোথাও নেই—নেই, কিছুই নেই, নেই হাওয়া, নেই প্রাণ-শুধু

শূন্যতা, শুধু নিঃসঙ্গতা—নিজস্ব একাকীত্বের মধ্যে শুধু একা, একা। মুহূর্তের মধ্যে হেমকুসুম নিঃস্ব হয়ে গেলেন—এমন একা, একজনকে হারিয়ে এমন শূন্যতা, আর কখনো আসেনি।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

প্রভাতী পত্রিকায় বড় বড় হরফে প্রথম পাতায় ছবি সহ 'সেন সাহেব' ইহজগতে নেই—এ-সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র—লখনউ থেকে সমগ্র উত্তরপ্রদেশে-বাংলাদেশে তথা সারা ভারতে। সেদিন কোর্ট-কাছারি, বিশ্ববিদ্যালয়-স্কুল-কলেজ-হাট-বাজার শোকস্তব্ধ—বন্ধ রেখে 'হেমন্তনিবাসে' ছুটে চলল বাঁধভাঙ্গা নীরব জনস্রোত; শেষ দেখা, শেষ প্রণাম জানাবার জন্য প্রিয় ভাই সাহেব, সেন সাহেব অতুলপ্রসাদ সেনকে। কেউ কাঁদছেন, কেউ আর্তনাদে চিৎকার করছেন—কেউ বা মুখ বুঁজে নিবেদন করছেন কৃতজ্ঞতার শেষ অঞ্জলি।

হেমকুসুমও এলেন। ধীরে, অতি ধীরে নম্র পদচারণে ঘরে প্রবেশ করে অপলক চোখে পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে অতুলপ্রসাদের অম্লান অবিকৃত স্বাভাবিক সৌম্য মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ-নিশ্চল, ভেতরে ভেতরে অন্তর ফাটা আর্তনাদ, তাতে কিন্তু শব্দ নেই, নেই কোলাহল—পাছে প্রিয়র ঘুম নষ্ট না হয়—নিজের হৃৎপিণ্ডটা ভেতরে ভেতরে উলট-পালট হয়ে অস্থির, নিথর দেহে সকল আকুতিতে নীরবে শেষ প্রণতি জানালেন—কিন্তু বন্যার বেগকে কে আট্‌কাবে। এ যে কোন বাধা মানছে না—আনত নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে পড়তে লাগল অতুলপ্রসাদের চরণ ধৌত করতে।

তারপর সকলের অলক্ষে একান্ত নিজস্ব ইচ্ছায় হেমকুসুম চলে গেলেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

তারপর অনিবার্যতার সকল বন্ধন ছিন্ন করে ভালবাসার একান্ত সুজনদের উদ্যোগে অতুলপ্রসাদের মরদেহ লখনউ নগরীর কেন্দ্রস্থল হয়ে জনতার স্রোত ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে গোমতীর পারে। মরদের বহন করছেন—সর্বধর্মের মানুষেরা অতুলপ্রসাদের আপনজন—ভালবাসার জন—সেই মহম্মদ নাসীম, জগৎনারায়ণ মোল্লা, মিস্টার টমাস ও বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তব।

জনতার স্রোতে-বাহিত পালঙ্কে মহানিদ্রায় শায়িত অতুলপ্রসাদ—কাঁধে কাঁধে যেন মহা-অভিষেকে চলেছেন—সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন—লখনউ-এর বিচারপতিরা, ম্যাজিস্ট্রেটরা-উকিল-ব্যারিস্টাররা—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ধনী রাজপুরুষ, কি

দরিদ্র ভিখারী-বস্তীবাসী হরিজনরা—সন্ন্যাসীরা-যুবকেরা নগ্ন পায়ে অনুগমন করছেন।

মহাসমাধির-যজ্ঞভূমি, সেই মহাশশ্মানে অতুলপ্রসাদকে শেষ প্রণাম জানিয়ে জনতার প্রবাহ শোকে আর্তকণ্ঠে নিজ নিজ ধর্মের দেবতার কাছে প্রার্থনা-দোয়া ভিক্ষা করছেন—পুত্র দিলীপকুমার মুখাগ্নির কাজ শুরু করতেই বেহালায় ছড়ি টেনে সেই আখতারউদ্দিন জানিয়ে দিলেন—

সবারে বাস্‌রে ভালো

নইলে মনের কালো ঘুচবে নারে!

যথাবিহিত দিনে ব্রাহ্ম পদ্ধতি অনুসারে লখনউতেই শ্রাদ্ধ-বাসর অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন সে অনুষ্ঠানে আচার্যের পদে থেকে সকল মঙ্গল কাজ সমাধা করেন।

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

হেমকুসুমও শেষ খেয়ায়। শরীর খুবই খারাপ—তবে পুত্র দিলীপকুমারের জন্যই তাঁর ভাবনা। ভাড়া বাড়ী ছেড়ে দিলেন। স্যার. কে. জি'র দেওয়া টাকায় ওয়াজির হাসান রোডে একটি ছোট বাড়ী তৈরী করে সেখানেই বসবাস করছেন। প্রিয়জন বন্ধু-বান্ধব—অতুলপ্রসাদের অনুরাগী লোকেরা মাঝে মধ্যে এসে হেমকুসুমের খোঁজ খবর নেন। বিশেষ করে জুবিলী কলেজের অধ্যাপকেরা—বেগম মমতাজ হোসেন, অরুণপ্রকাশ, বেগম মুবাশীর হোসেন মাঝে মাঝে এসে নানা বিষয়ের আলোচনায় হেমকুসুমের নিঃসঙ্গতাকে দূর করতেন।

তিন বছর দ্রুত কেটে গেল। হেমকুসুম যখন একা থাকেন অতুলপ্রসাদের গান গেয়ে গেয়ে নিজেকে ভাব-সম্মিলনে আনন্দিত হতেন। এমনি এক সন্ধ্যায় হেমকুসুম চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে মাথা কেটে যায় এবং চিকিৎসার অবহেলায় তা' বিষাক্ত গ্যাংগ্রিনে পরিণত হয়। অপারেশন করা হ'ল। কিন্তু তেমন কোন সুফল পাওয়া গেল না। ধীরে ধীরে জীবনের সব নিস্তেজ হয়ে যেতে লাগল—এমনিভাবেই ১৯৩৭ সালের দোসরা জুন সকল যন্ত্রণা ও উৎকণ্ঠার অবসান ঘটল—হেমকুসুমও চলে গেলেন।

পরিশিষ্ট

অতুলপ্রসাদকে লেখা রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পত্র

ওঁ

১

সুহৃদবরেষু,

সসম্মানসম্ভাষণমেতৎ,

বাড়িতে রোগ তাপ লইযা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি; সেই কারণে আজ বাত্রে আপনার ওখানে খাইতে যাওয়া সম্ভব হইবে না আমাকে মার্জনা কবিবেন। আমার ভগিনীপতি সতীশের অবস্থা অত্যন্ত সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিযাছে। আপনার সহিত সাক্ষাতের পরদিন হইতেই আমার শিশুপুত্রটিও এমন পীড়িত হইয়াছে যে আমি সবলার সহিত সাক্ষাতের অবসর পাই নাই। কাল সন্ধ্যার সময় তাহার সহিত দেখা হইয়াছিল। সবলা বলে যে, গানে যোগ দিবাব উপযুক্ত মেয়ের অভাব। আপনাদের পরিচিতবর্গের কাহাকেও সংগ্রহ করিয়া একবাব সরলাকে জানাইতে পারেন না? আপনি জানেন আজকাল আমি প্রকাশ্যে গান গাওয়া একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছি, আমার গলা গিয়াছে—বিশেযতঃ দুই তিন দিন হইতে আমি কুইনিন খাইয়া সর্দিজ্বরের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছি। তাহার পরে ঘবে রোগের প্রাদুর্ভাবে সমস্ত রাত্রি জাগরণে যাপন করিয়া অত্যন্ত ক্লান্ত অবস্থায় আছি! ইতিমধ্যে পরশু একটা নতুন গান রচনা করিয়া রাখিয়াছি—যদি পছন্দ করেন কীর্তনের সুবে বসাইযা কাহাকেও দিযা গাওয়াইয়া লইতে পারেন—সেই গানটি এই সঙ্গে পাঠাই।

ইতি—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

২ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

আমি শান্তিনিকেতনেই আছি—এইখানেই থাকব। তুমি তোমার আমের ঝুড়ি-হাতে নিশ্চয়ই এই ঠিকানায় আস্‌বে। আমের ঝুড়ি যদি নেহাৎ দুর্লভ হয় তবে বিনা-আমেই আস্‌তে হবে। তোমাকে অনেকদিন দেখিনি; তোমার গান অনেকদিন শুনিনি, তোমাকে অনেকদিন গান শোনাইনি—আমার মত ব্রাহ্মণের মনের এই সমস্ত খেদ যদি না মেটাও, তবে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করে' আমার দ্বারে তোমাকে অনেক হাঁটাহাঁটি করতে হবে। এছাড়া, কাজের কথা বিস্তর আছে—তোমার সঙ্গে মোকাবিলার পরামর্শ করতে পারলে আমার অনেকটা মন খোলসা হবে। পুনর্বার উপসংহারকালে জানাচ্ছি, তোমাকে আমাব নিতান্তই চাই। ইতি ৭ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯

তোমাদের—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৩ শান্তিনিকেতন

কল্যাণীয়েষু

বোধকরি পূর্ব্বজন্মে ইন্‌কম্‌ট্যাক্সের দারোগা ছিলুম। সেই পাপে এই জন্মে দেশে দেশে, জেলায় জেলায়, দ্বারে দ্বারে টাকা সংগ্রহ চেষ্টায় ঘুরছি। এম্‌নি কপাল, যৎসামান্য সোনা যা পাই, তার থেকে বাণী ঢের বেশি মেলে, পেটও ভরে না, জাতও যায়। দুঃখ এই যে, শিশুকাল থেকে লেখনী চালনাই অভ্যাস করেছি, সিঁধকাঠি চালাতে শিখিনি, সেই বিষম ভুলের ফলে এ পর্য্যন্ত কেবল শব্দই জম্‌চে, অর্থ জমল না। রঘুবংশের গোড়াতেই কালিদাস লিখেছেন, বাক্য এবং অর্থ পরস্পর-সংলগ্ন, এখনকার কবিদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে এ-কথা মেলে না। স্পষ্টই বোঝা যায় বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের বাক্যের সঙ্গে অর্থকে সঙ্গত করবার জন্যে কবিদের ব্যারিস্টার হবার দরকার ছিল না, তাঁদের তরফে শব্দকোষ যেমন খোলা ছিল, রাজার তরফে অর্থকোষেও তেমনি অকৃপণ ছিল। যাই হোক অনুশোচনা করে' কোনও লাভ নেই, চাঁদার খাতা হাতে করে' নিয়ে বেরুতে হবে'। এখান থেকে বিদায় গ্রহণ কালে তুমি আমাদের কিছু ফলের আশা দিয়ে গিয়েছিলে; দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ চলে' গেল, অবশেষে যখন গীতার উপদেশই আমার একমাত্র সম্বল হ'ল, যে 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন,' অর্থাৎ 'তোমার অধিকার হচ্ছে একমাত্র খেটে মরা কিন্তু ফলের বেলা ফজলীও, দশেরিও না' এমন সময় তোমার চিঠি পাওয়া গেল। তার থেকে অন্ততঃ এটুকু বোঝা গেল যে আগামী বৎসরে আশার ফল হয়ত ফলবে।—চেষ্টা করা যাচ্ছে এবার কলকাতার শারদোৎসব অভিনয় করবার। রিহার্শাল চলেচে, হয়ত মন্দ হবে না। যদি তুমি এসে একবার দেখে যেতে পার তা'হলে সেই উপলক্ষে তোমারও দর্শন আমরা পেতে পারি। সময়টা হচ্ছে, ১৬ই এবং আঠারই সেপ্টেম্বর। ইতি ১৯ ভাদ্র, ১৩২৯।

তোমাদের—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৪

কল্যাণীয়েষু,

লখনৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিতে সম্মতি দিয়েছি দক্ষিণার লোভে। আমাদের সমস্ত জমিদারিক সম্পত্তি বন্যায় ভেসে গিয়ে পথে দাঁড়িয়েছি। কিন্তু পথে দাঁড়ানো সহজ, পাথেয় জোটানো সহজ নয়। তাই চক্রবর্তী মহাশয়ের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছি। কিন্তু তার বেশি আর কিছু সইবে না—বক্তৃতা জীবনে অনেক করেছি; এখন ছুটি নেবার সময় হয়েছে। যা হোক তোমার ওখানে গিয়ে যা হোক্ স্থির করব। আমার খাতিরে লখনৌতে শীতকালে আম ফলবে না, সেজন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় না। নিষ্ফল হওয়া এতই

স'য়ে গেছে যে, ফলের লোভ এখন আর মনে রাখিনে। কিন্তু, উপযুক্ত ঋতু উপস্থিত হ'লে যে মনের পরিবর্তন হবে না একথা বলাও শক্ত। ইতি— ২৭ মাঘ, ১৩২৯।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

Mount Petit
Peddar Street
Bombay

৫

কবিবন্ধু,

শনিগ্রহ এখানো রবিকে চালনা করে নিয়ে বেড়াচ্ছে—বোধ হয় অস্তকাল পর্যন্ত এই রকমই চলবে। এখানে আধমরা হয়ে পৌঁছেচি—দু'দিন অর্ধশয্যাশায়ী হয়ে কাটিয়েছি। আজ সকালে উঠে মামুদাবাদের রাজাসাহেবকে একটি চিঠি লিখেছি—নিম্নে উদ্ধৃত করে দিলুম ঃ

I must let you know how deeply I was touched by warm expression of sympathy with which you accepted my appeal for the Visvabharati. It has specially delighted me because of the rarity of any real understanding of its ideals which I find among my countrymen who almost rudely refuse to realise the true perspective of their country's problems in the larger background of humanity. Please accept my hearty thanks not only for the ready welcome you accorded to the ideals I beg to represent in my life's work but also because you had difficult respect for my personality not to hurt my cause with an inpatient gesture of an indifferent charity made all the more conspicuous by the high position which you and your peers in Oudh hold in India.

মামুদাবাদকে মাঝে মাঝে তাঁর প্রতিশ্রুতি যদি স্মরণ করিয়ে দিতে পার তাহলে উপকার হয়। মনে আছে তিনি বেনারসের রাজা মাধোলালকে সংস্কৃত অধ্যাপনার পাকা ব্যবস্থার জন্য লিখবেন বলেছিলেন। আর তিনি মার্চের শেষে দিল্লীতে গিয়ে চেষ্টা করবেন এমন কথাও হয়ে গেছে। সম্প্রতি বিনা বিলম্বে দু'টি জিনিস আমাদের চাই—সংস্কৃত বিদ্যার সিংহাসনে ব্রজেন্দ্রবাবুকে, আরেকটি ধর্মশালা যেখানে ভারতীয় অভ্যাগতেরা এসে স্বয়ং ব্যবস্থা করে কিছুকাল যাপন করে যেতে পারেন। বিস্তর লোক আসতে চান জায়গা দিতে পারিনে তাতে অত্যন্ত ব্যথা পাই।

সেদিন তোমার দরবারে শেষ গান গেয়ে এলুম। শেষের পরের গানের কথা সেদিন আমাকে বলেছিলে। গাড়ীতে চলতে চলতে সেই পরের গানটি বানিয়েছি— তার আরম্ভ দুই লাইন হচ্ছে ঃ

"তোমার শেষের গানের রেশ নিয়ে কানে চলে এসেছি,
কেউ কি তা জানে।"

একথা নিশ্চয়ই মনে জেনো, কর্তা Wheeler-এর চক্রধ্বনির রেশ কানে আনিনি—তোমার সমাদরের মধুর সুর হৃদয়ে আছে, আর আশা আছে মধুর ফলের আকাঙ্ক্ষা যথাসময়ে মিটবে। কথাটা বিশেষ করে মনে পড়ল যেহেতু এখানে এসে পৌঁছে অবধি আমার ভাগ্যে আম পেকে উঠেছে—বন্ধুমহলে আমার লোভের কথা রাষ্ট্র হয়ে গেছে। আমিও কবুল জবাব দিয়ে বসে আছি—প্রতিবাদ করিনে। চলে এসেছি বলেই মক্কেলদের কাছে তোমার হৃদয় মন সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিও না—এই ঘূর্ণাবায়ুগ্রস্ত হতভাগ্যের কথা স্মরণ করে অবকাশ মত দু'একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলো। সেই দীর্ঘ নিশ্বাস হয়ত বিধাতার কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে। ইতি ১২-৩-২৩।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৬

কল্যাণীয়েষু,

কিছুদিন থেকে ডাকে যত চিঠি আসছিল আমি দেখছিলুম তার খামেব উপর লখনৌয়ের ছাপ আছে কিনা। ভূগোল খণ্ডের নানা মহাদেশ, দেশ ও প্রদেশের মুদ্রাচক্র দেখলুম, কেবল লক্ষ্মণাবতীর কোনো চিহ্ন দেখতে পাওয়া গেল না। মনে সন্দেহ হ'ল যে, তোমাদের সহরের সকলেই বুঝি রাজার কাছে দীক্ষা নিয়েছ, অতএব ফলের আশাই পাওয়া যাবে কিন্তু সফলতা পাওয়া যাবে না। এমন সময় তোমার পত্র এবং ফল সমেত পাত্র এসে পৌঁছল। ১১৯টা পাওয়া গেছে, সে জন্যে প্রধানতঃ তোমাকে ধন্যবাদ দেব, না, রেলপথের সর্দারদের, তা বলতে পারি নে।

আগামীকাল কলকাতায় যাচ্ছি। আগামী ২৮/২৯/৩০ শে জুলাই বিসর্জনের অভিনয় আমি তাতে আবদ্ধ আছি। তুমি দেখ্‌তে আসতে পারবে ত? এই সমস্ত উপদ্রব নিয়ে কলকাতায় দীর্ঘ কাল কাটাতে হবে। যদি আসতে পার ত বিশেষ খুশি হব। আমাকে শীঘ্রই কিছুকালের জন্যে দূর দেশে যেতে হবে, এই কারণে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে চাই। ইতি তারিখ জানিনে।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৭

কলাণীয়েষু,

আজকাল হাঙ্গার স্ট্রাইক চলছে কিন্তু মৌনব্রত এখনো রাষ্ট্রনৈতিকরা স্বীকার করেননি— ব্যারিস্টারদের তো কথাই নেই। তাই তোমার স্তব্ধতা দেখে মনে হচ্ছে

ছুটিতে আছ বলেই ঐ বাকসংযম— অন্ততঃ এখন তোমার বাক্যের সঙ্গে যথেষ্ট অর্থের সংযোগ নেই। মনে সংকল্প ছিল বিজয়া দশমীতে তোমাকে কবির আশীর্বাদ পাঠাব— ঠিকানার অপেক্ষায় ছিলুম। তারিখ একাদশীতে এসে ঠেকলো আর দেরী করবো না। বিশেষ কিছু নয়, আমার স্বরচিত গুটিকতক বই— সম্পাদকেব সমালোচনার জন্য নয়, সমজদারের সম্ভোগের জন্যে। শেষ বেলাকার ফসল, সুতরাং আশা করি পাক ধরেছে, কিন্তু স্বাদ হয়েচে কিরকম তার বিচার তোমাদের পরেই রইলো। অভিমত দাবী করে বিপদে ফেলতে চাইনে— আমাদের শাস্ত্রমতে আহার কালে কথা কইতে নেই— কাব্য আস্বাদনকালেও সেই নিয়ম প্রচলিত থাকলে অশান্তির কাবণ ঘটে না। ইতি— ২৯শে আশ্বিন ১৩৩৬।

তোমাদের
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

৮

কল্যাণীয়েষু,

একটা কাজের কথা আছে। আমাদের বিদ্যালয়ে হিন্দুস্থানী গান শেখাবার ব্যবস্থা করতে চাই অথচ পেরে উঠচিনে। অর্থের অভাবের চেয়ে লোকের অভাবই সবচেয়ে বেশি। ভাটখণ্ডের কোনো ছাত্রকে কি এই কাজে পাবার কোনো আশা আছে? মাসে একশো টাকার বেশি বেতন দেবার সাধ্য নেই—কিন্তু যোগ্য লোক তার চেয়ে বেশি দাবী করেন তবে তা' পূরণ করবার জন্যে কোনো একটা উৎকট চেষ্টা করা যাবে। ভিক্ষাবৃত্তির দ্বারা শূন্য ঝুলি ভরাতে পারিনি তাই স্থির করেছি আবার একবার নটবর বেশে যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি। ভেবেছিলুম শীতকালটা কর্ম্মক্ষেত্রের বাইরে কাটাব কিন্তু পেটের দায়ে এখানকারই মাটি আঁকড়ে থাকতে হোলো। বরোদা যাবার পথে তোমার দুয়ার ঠেলা দিয়ে যাবার সংকল্প মনে রইলো। যে পর্যন্ত না তুমি মুখ ভার করো তোমার ঘর জুড়ে দিন যাপন করবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু একদিকে বরোদায় বক্তৃতার আসর অন্যদিকে ভবানীপুর বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনীতে সভাপতির পালা এই দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়টি সঙ্কীর্ণ, অতএব আগমনী এবং বিজয়ার মধ্যে দীর্ঘ আয়োজন তোমাকে করতে হবে না। যাই হোক নিতান্তই একজন গায়ক চাই। ইতি ১৪ই নভেম্বর ১৯২৯।

স্নেহানুরক্ত
শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ওঁ

৯ উত্তরায়ণ

কল্যাণীয়েষু,

উত্তরায় রবীন্দ্রনাথ নামক এক ব্যক্তির সম্বন্ধে যে কয়টি কথা লিখেছ তা পড়ে উক্ত নামধারী খুশি হয়েছেন। বোধ হয় অযথা হয়েছে— সেই সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের

অভিমুখে কৃষ্ণপক্ষের কালিমা উদঘাটন করেচেন তাঁকে আমাদের মজলিসে পাবার সৌভাগ্য হয়নি তুমি যে ব্যাপারের বর্ণনা করেছ সেটা প্রাক্-খামখেয়ালী যুগের। তখন আমি আমার স্বজন বন্ধুমহলে দ্বিজেন্দ্রলালের খ্যাতির ভূমিকা রচনা করে বেড়াচ্ছিলুম। বস্তুত আমি ছিলুম তাঁর প্রথম ও প্রধান নকীব। তুমি সেদিনকার ইতিহাসের দুই অধ্যায়কে এক অধ্যায়ে মিলিয়েছ। রামগড়ের সেই নির্জন আনন্দের স্মৃতি তোমার এই রচনা যোগে অন্তরের মধ্যে উদ্বোধিত হোলো।—পলাতকা দিনগুলোকে ফিরে পেতে ইচ্ছে করে, সেদিনকার অমৃতের ভাণ্ডটা সুদ্ধ নিয়ে তারা দৌড় দিয়েছে। আমি পড়ে গেছি ভীড়ের মধ্যে—শান্তির স্নিগ্ধ রসের পাত্রটা উজাড় করে দিয়ে তার মধ্যে খ্যাতির ঝাঁঝালো মদ ভরে দিয়েছে। ইতি ২৮/৩/৩২।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ওঁ

১০ শান্তিনিকেতন

প্রিয়বরেষু,

তোমার আম্রাতক পাওয়া গেল। ভোগ সুরু হোলো। লাগচে লখ্‌নৌয়ের টপ্পার মতো—নবাবী স্বাদ অল্পটুকুর মধ্যে গন্ধ ও রস আঁট হয়ে আছে।

এই উপলক্ষে সাঙ্গীতিক ভাষা কেন ব্যবহার করলুম তা' ধূর্জটিকে দেখালে অধ্যাপক হয় তো বুঝতে পারবে। একটা কারণ, তোমার কাছ থেকে যা' কিছু মাধুর্য আসে তার সঙ্গে সিন্ধু-খাম্বাজের মিল পাওয়া যায়, দ্বিতীয় কারণটার আলোচনা আশাজনক বলে বোধ হচ্ছে না। তবু একটা কথা বলে রাখি— প্রাংশুলভ্য ফলের কামনা ত্যাগ করেছি। উদ্বাহু বামনের দাবী যতদূর পৌঁছতে পারে সেখানেও মিঠুয়া গোছের কোনো ফল যদি পতনোন্মুখ হয়ে থাকে তাতেই কাজ চলবে। মাঝারি জাতীয় মানুষ যদি বাঙালী হয় তবে তাকে পেরে উঠ্‌বো না, অন্য প্রদেশীয় হলে বোধ হয় নরম হবে। আর কিছু নয়, এখানে কতকগুলি ভালো গলা আছে—তারজন্যে কতকগুলি মিষ্টি গান যদি জোগান দেওয়া যায় তাহলেই আপাততঃ সন্তুষ্ট থাকব। গ্রহ যখন সুপ্রসন্ন হবে তখন প্রণালী পদ্ধতির কথা চিন্তা করে দেখব। কাৎলা রুই তোমাদের ঘরেই থাক আপাততঃ ট্যাংরা হলেই আমাদের লজ্জা নিবারণ হবে। ইতি ২২শে জুলাই ১৯৩২।

তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর